মানবমস্তিষ্ক

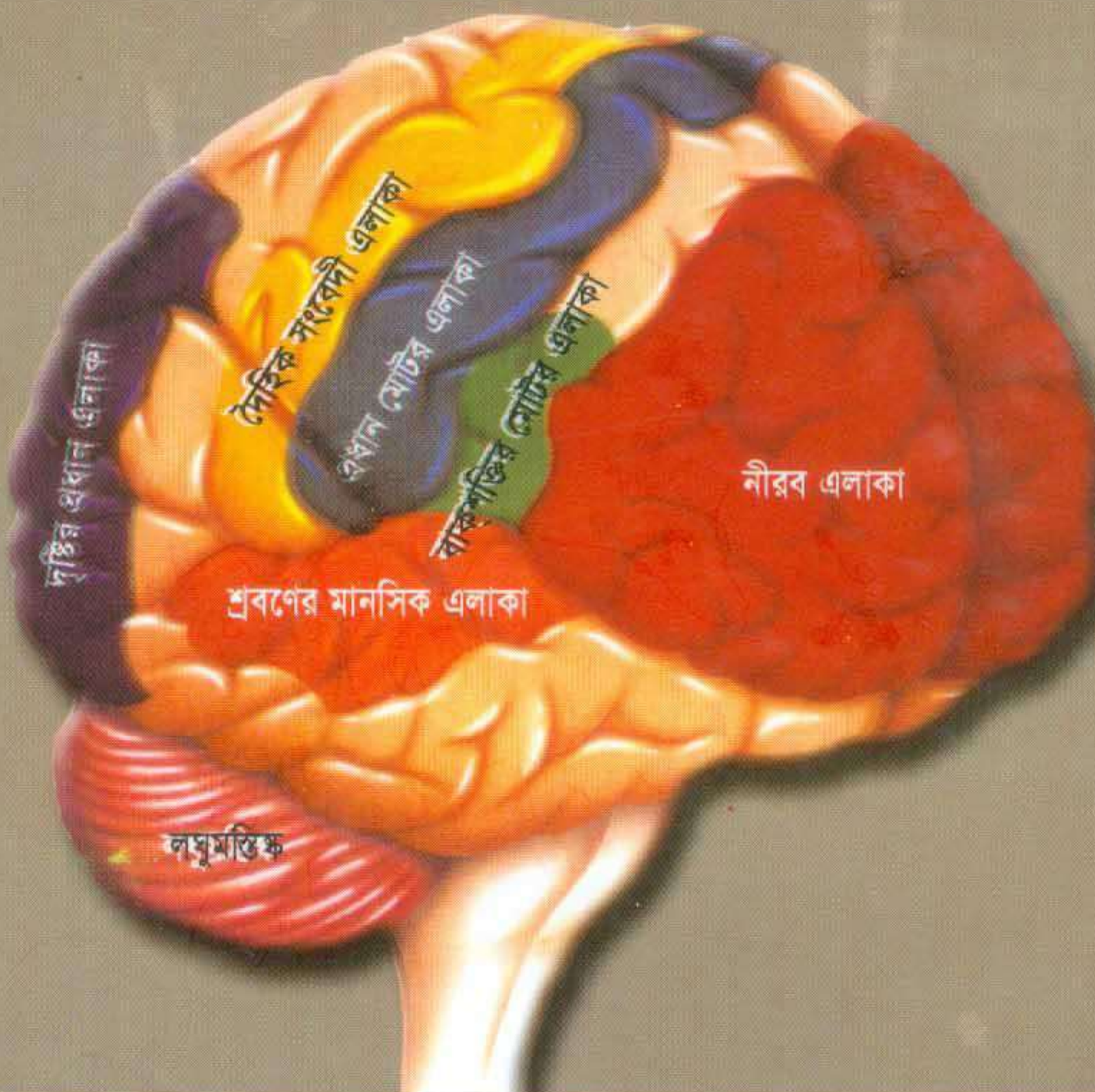

হুমায়ূন কে. এম. এ. হাই

প্রসঙ্গ-কথা

বৈদিক যুগের ঋষিরা "আত্মানং বিদ্ধি" অর্থাৎ নিজেকে জানার কথা বলেছিলেন। নিজেকে কিভাবে জানতে হবে সে পদ্ধতির কথা তাঁরা বলেছিলেন কিনা আমরা জানিনা। আমরা বেদজ্ঞ নই। মানুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে নিজেকে জানতে চেয়েছেন, দেহ ব্যবচ্ছেদ করে নিজেকে জানতে চেয়েছেন। ধ্যানমগ্ন হওয়া একটি আত্মমুখ পদ্ধতি (subjective), অপর দিকে ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি একটি বিষয়মুখ পদ্ধতি (objective)। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণরূপে খুঁজে পায় নি। মানুষ তার উৎস সন্ধান করার জন্য প্রাগৈতিহাসিক গুহায় গুহামানবের মস্তিষ্কের খুলি অনুসন্ধান করে পৃথিবীতে তার সচেতন অস্তিত্বের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে সিদ্ধা ও তান্ত্রিকেরা কায়াসাধনার মাধ্যমে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার পথে ষটচক্র অতিক্রম করে মহাসুখচক্রের অনুমান করেছেন। মানুষ তার দেহের অন্ধিসন্ধি জেনে চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে এবং দেহ ও মনের চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তারপরও বিশ শতকে এসে মানুষ বুঝতে পারে তার নিজেকে জানা রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ।

দেহের ও মনের কার্যাবলী অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ তার দেহ ও মন নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র হিসেবে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ছয়ের দশকের পর থেকে ভাষাবিজ্ঞানীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ক্রমে স্নায়ুবিশেষজ্ঞরা মানবমস্তিষ্কের সংগঠন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা দুটো পদ্ধতি অনুযায়ী মস্তিষ্কের কার্যধারা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এক, উন্মুক্ত আর খণ্ড বিশ্লেষণ পদ্ধতি, দুই, সার্বিক আর আচরণিক পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে মস্তিষ্ককে উন্মোচিত করে তাকে খণ্ড খণ্ডভাবে বিভাজন করে জানার ধারা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে মস্তিষ্ককে অবিভাজ্য ধরে নিয়ে তার আচরণের পারম্পর্য বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃত রূপ উপলব্ধির চেষ্টা।

এই দু'পদ্ধতির মধ্যে যেসব সীমাবদ্ধতা আছে সেগুলো অতিক্রম করার জন্য বিজ্ঞানীরা গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতি গাণিতিক প্রণালীতে সম্পন্ন হয় এবং গাণিতিক ভাষার উপর নির্ভরশীল।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক মানবদেহে প্রধানত সংজ্ঞাপন ও নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত। গাণিতিক ভাষা প্রয়োগ করে যেভাবে অজৈব সংজ্ঞাপন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা যায় সেভাবে মৌলিক আচরণের বিশ্লেষণ করাও কতকটা সম্ভবপর। কারণ গণিতের সংজ্ঞা ও সূত্র মোটামুটি নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়।

মস্তিষ্ক গবেষণার এ পর্যায়ে আচরণবাদী দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আচরণবাদীদের মধ্যে যাঁরা মানুষের ভাষিক আচরণ সম্বন্ধে উৎসাহিত তারা উদ্দীপন ও সাড়া $S \rightarrow R$ পদ্ধতির মাধ্যমে মস্তিষ্কের খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

মানবাচরণের বৃহদংশ জান্তব ঐতিহ্যের ক্রমপ্রসার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মানুষ জন্তু হলেও জন্তু হিসেবে তার অনন্য একটি পরিচয় আছে। সে পরিচয় আচরণবাদীরা আবিষ্কার করতে পারেন না। দর্শনের মানসবাদী ধারা আচরণবাদীদের কর্মধারা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারে নি। তারা মানুষের মনের নিশ্চিত আচরণের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে সজীব, প্রাণবান ও সক্রিয় মস্তিষ্ক তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের সহায়তায় ইনপুট-আউটপুট ব্যাখ্যা করে কালো বাক্সের হদিশ নেওয়ার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার প্রয়োগযোগ্যতা মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। স্নায়ুবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানী এক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করে স্নায়ু-ভাষাবিজ্ঞানের সৃষ্টি করে যার দ্বারা মানবমস্তিষ্কের স্বরূপ জানার একটি নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ভাষাবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞান আজ হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাচ্ছে যার ফলে মানুষের ভাষিক আচরণের অনেক সূত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া সহজ হবে আশা করা যায়।

মানবমস্তিষ্ক বইটি ১২ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী থেকে। এর মধ্যে মস্তিষ্ক গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হলোগ্রাম আবিষ্কারের ফলে গবেষণার দুরূহতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে। মনোভাষাবিজ্ঞানী ও স্নায়ু-ভাষাবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত প্রদান করতে শুরু করেছেন। বাংলা একাডেমী মস্তিষ্ক গবেষণায় সর্বাধুনিক তথ্যাবলীসহ বইটি পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনাব হুমায়ূন কে. এম. এ. হাই এক্ষেত্রে পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। দেশে স্নায়ুবিজ্ঞানীর সংখ্যা খুব বেশী নেই। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বইটি লিখে তিনি জটিল চিকিৎসা শাস্ত্রের বইও যে বাংলায় বোধগম্য রীতিতে লেখা যায় তা প্রমাণ করেছেন।

এই বই প্রকাশের ব্যাপারে জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পুনর্মুদ্রণের পরিচালক ও উপপরিচালক বিশেষ ব্যবস্থায় বইটি প্রকাশ করে একাডেমীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২৩/০৯/২০০৩

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক

মুখবন্ধ

অনেকদিন আগে বইটি লিখতে শুরু করি প্রধানত দুটি কারণে—একটি আমার স্ত্রীর (তিনি এখন পরলোকে) অনুপ্রেরণা, অপরটি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু লিখতে অভ্যাস করা। অবশেষে পান্ডুলিপিটি কিছু সংশোধন ও সংযোজন করে, এটি গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিবেচনার জন্য বাংলা একাডেমীর কাছে অর্পণ করা হয়—কিছুটা সংকোচের সাথে। বাংলা একাডেমী বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন।

এই বইটিতে একাধিক অত্যন্ত জটিল বিষয়কে আমি যথাসম্ভব সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি। যেসব তত্ত্ব ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে, তার কোনোটিই আমার মস্তিষ্ক-উদ্ভূত নয়—বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে সেগুলো ধার করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সূত্র নির্দেশ করা সম্ভব হয় নি; এরূপ সাধারণ জ্ঞানের পুস্তকে সেটা হয়তো উপযুক্তও হতো না। যাহোক, বইটির শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করা হয়েছে, যদিও সেটি কোনোমতেই সম্পূর্ণ নয়।

মস্তিষ্ক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানার জন্য বইটি মোটেই যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, জ্ঞান বিতরণ বইটির মূল উদ্দেশ্যও নয়। উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠক-পাঠিকাদের মনে মস্তিষ্ক ও এর ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করাই এই বইটির মূল উদ্দেশ্য। যাদের মনে তেমন ঔৎসুক্য সৃষ্টি হবে, তাদের অবশ্যই পরে বিদেশী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির সাহায্য নিতে হবে। কারণ, দুঃখজনক হলেও, একথা সত্য যে, অন্যান্য দিকে সমৃদ্ধ হলেও, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাটি বিজ্ঞান বিষয়ে এখনো বড় দুর্বল।

বইটি ভাষাগত দিক থেকে যথাসম্ভব দোষমুক্ত করার ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের উপপরিচালক জনাব তপনকুমার চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সহায়তার জন্য, তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

ঢাকা
নভেম্বর, ১৯৯০

হুমায়ূন কে. এম. এ. হাই

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ			১ - ৫৪
প্রথম অধ্যায়	:	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	মস্তিষ্ক ও চেতনা	৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	মস্তিষ্কের বিবর্তন	১১
চতুর্থ অধ্যায়	:	স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক উপাদান	১৯
পঞ্চম অধ্যায়	:	মেরুরজ্জু ও স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্র	৩২
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন	৩৯
দ্বিতীয় ভাগ			৫৫ - ৯৩
সপ্তম অধ্যায়	:	স্নায়বিক উত্তেজনা	৫৫
অষ্টম অধ্যায়	:	সিনাপ্‌স্ স্থানে উত্তেজনা সঞ্চালন	৬২
নবম অধ্যায়	:	মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভব	৬৯
দশম অধ্যায়	:	নিয়ন্ত্রণের মূলকথা	৭১
একাদশ অধ্যায়	:	যোগাযোগ ব্যবস্থা	৭৫
দ্বাদশ অধ্যায়	:	মস্তিষ্কের বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতা	৮৬
তৃতীয় ভাগ			৯৪ - ১৩১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেষণা	৯৪
চতুর্দশ অধ্যায়	:	সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া	১০০
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	উপলব্ধি	১০৪
ষোড়শ অধ্যায়	:	শিক্ষা ও স্মৃতি	১১১
সপ্তদশ অধ্যায়	:	প্রতীক নির্মাণ ও যুক্তি	১১৬
অষ্টাদশ অধ্যায়	:	বৃহত্তর যোগাযোগ	১১৯
ঊনবিংশতি অধ্যায়	:	মানব অস্তিত্ব ও মানবচেতনা	১২২
বিংশতি অধ্যায়	:	মস্তিষ্ক গবেষণায় সাম্প্রতিক ধারা	১২৭
গ্রন্থপঞ্জী			১৩২
পরিভাষা			১৩৪
নির্ঘণ্ট			১৩৫

প্রথম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

বিজ্ঞানের ভিত্তি, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের ক্ষমতা, সাফল্য ও এর সীমাবদ্ধতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারাই নিরূপিত হয়। যে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়, তা বিজ্ঞানের সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করায় ও সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। বিজ্ঞানের উন্নতি ও সাফল্যের দরুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিককালে মানবচেতনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কতকগুলি সহজ কার্যপ্রণালি ও সহজ যুক্তির উপরে নির্ভরশীল। এই পদ্ধতির আবর্তিত পদক্ষেপগুলিই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সীমানা নির্ধারণ করে। বিজ্ঞান কোনো মতবাদের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করে না। প্রকৃতির ঘটনাবলি সম্পর্কে যথাসম্ভব বিশ্বস্ত, বিমূর্ত ও প্রয়োগসাপেক্ষ মতবাদ প্রণয়নই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনো মতবাদ বা অনুকল্প বাস্তবে কতখানি প্রযোজ্য, সেটাই মতবাদটির বিশ্বস্ততার একমাত্র মাপকাঠি। সুতরাং মতবাদের 'বিশ্বস্ততা' বা 'সত্যতা' বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিরূপিত হয়ে থাকে। যাঁরা বিজ্ঞানের ফলাফল ভোগ করেন ও ব্যবহার করেন তাঁরা ইচ্ছামাফিক বিজ্ঞানের মূল্যপ্রদান করতে পারেন। নৈতিক বা মানবিক মূল্যপ্রদান বিজ্ঞানের সীমানার অন্তর্ভুক্ত নয়। এরূপ মূল্যপ্রদানের প্রশ্নে বিজ্ঞান নীরব ও নিরপেক্ষ।

তবে বৈজ্ঞানিক চেতনা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং জীবনক্ষেত্রে কর্মপথ নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে। যুগ যুগ ধরে মানুষ তার সীমাবদ্ধ যুক্তি ও চেতনার সাহায্যে জগতের 'চরম সত্য', 'জীবনের চরম উদ্দেশ্য' ইত্যাদির সন্ধান করেছে, কিন্তু ওসব বরাবর অজ্ঞেয় ও অনির্ণেয় থেকে গেছে। এরূপ চোরাবালির উপরে জ্ঞান-সাধনার ভিত্তি স্থাপন করা অর্থহীন। প্রকৃতির রহস্যাবলি যতটুকুই আমরা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি তার প্রায় সবটুকুই মানবচেতনার শক্তিশালী অস্ত্র, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করেই সম্ভবপর হয়েছে। 'সত্যতা', 'মূল্য' বা 'উদ্দেশ্য' নির্ণয় না করেও বিজ্ঞান মানবজীবনে কল্যাণ ও মঙ্গলদায়ক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সামগ্রিকভাবে মানবচেতনারও উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটেছে।

মূলত বিজ্ঞান একটি সার্বজনীন মানবিক ভাষা। ধর্ম, চারুকলা, ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদির মতো বিজ্ঞানও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। অন্যান্য ভাষার মতো বিজ্ঞানেরও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাকরণ বা নিয়মকানুন রয়েছে। বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতিই বিজ্ঞানের ব্যাকরণ এবং বিজ্ঞানের ভাষাই সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাষা।

বিজ্ঞানের ভাষায় যত সহজ ও স্পষ্টভাবে মানসিক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, অন্য কোনো ভাষাতেই তা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আনুষঙ্গিক পদক্ষেপগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ। যা বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নয় তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। তবে পর্যবেক্ষণ বা নিরীক্ষণ প্রত্যক্ষই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এটমের কেন্দ্রস্থল, বৈদ্যুতিক-চৌম্বক শক্তি, এক্স-রে ইত্যাদি অনেককিছুই প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না। এসবের অস্তিত্ব ও প্রভাব নানা যন্ত্রের ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ধরা যায়। একইভাবে চেতনশক্তিও হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা যায় না, কিন্তু এর গুণাগুণ ও প্রভাব নানাভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর।

কেবল এক ব্যক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ হলে চলবে না। সমরূপ ঘটনা বা একই ঘটনা পুনঃপুনঃ অনেক ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করতে হবে ; তাহলে ঘটনা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মাত্র একবার সংঘটিত কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

সঠিক নিরীক্ষণ একটি কঠিন কাজ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনোকিছু নিরীক্ষণ করা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা বা নিরীক্ষিত প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে বা হয়ে থাকে। ঐতিহ্য ও অন্ধবিশ্বাস চেতনাকে মেঘাচ্ছন্ন ও পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারে। অতিরিক্ত বিশ্বাসভারাক্রান্ত নয় বলেই বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভবপর। যা দেখার জন্য পূর্ব থেকেই মনস্থির হয়ে থাকে, আমরা সহজেই তা দেখে থাকি; এমনকি অনেক বিজ্ঞানীও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। তাই কোনো একজন বৈজ্ঞানিকের (তিনি যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোন না কেন) নিরীক্ষণকে কেবলমাত্র তাঁর মুখের কথায় অন্য বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন না। সকল অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে সুষ্ঠু নিরীক্ষণ সম্ভব, তার উপরেই বৈজ্ঞানিক কার্যটির তাৎপর্য ও ফলাফল নির্ভর করে। সঠিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা যে-কোনো বিজ্ঞানী পূর্ববর্তী যে-কোনো বৈজ্ঞানিক মতবাদকে পূর্ণ বা আংশিকরূপে খন্ডন করতে পারেন।

সমস্যা নির্ধারণ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের পরে কোনো একটি সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। অন্য কথায় বলা যায়, বিজ্ঞানী তাঁর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কোনো একটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সাধারণ মানুষ এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন না। এখানেই বিজ্ঞানী স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। অনেকেই নিরীক্ষণ করেন কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন করেন না। প্রশ্ন উত্থাপন করার আগ্রহ বা কৌতূহল বৈজ্ঞানিকগণের বৈশিষ্ট্য। কোনো একটি ঘটনার নিরীক্ষণের সাথে কী কী প্রশ্ন ও সমস্যা জড়িত তা অনেকে লক্ষ্যই করেন না। বহু বছর ধরে চেতনাসম্পন্ন মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, কোনো বস্তু উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হলে তা পরক্ষণে ভূমিতে এসে পড়ে, কিন্তু কারো মনে প্রশ্ন জাগে নি। অথচ গ্যালিলিও বস্তুর পতন ক্রিয়াটি সঠিকরূপে পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করেন এবং আরও পরে নিউটন এই পতন ক্রিয়াটির

সাথে সম্বন্ধযুক্ত সূত্রাবলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তখন সবাই বুঝতে পারলো বস্তুর পতনের প্রশ্নটি কত মূল্যবান ছিলো। পুনঃপুনঃ প্রশ্ন উত্থাপন না করতে পারলে বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভবপর নয় ; 'বিজ্ঞান' বিজ্ঞানও থাকে না। মানবসমাজে বিজ্ঞানের প্রবল অস্তিত্ব ও অগ্রগতি কাম্য হলে বিজ্ঞানীগণের সকল প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকারকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, সমস্যা উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু কথা হলো, প্রশ্নটি কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রশ্নটি তখনই মূল্যবান, যখন তা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয় ও পরীক্ষাসাপেক্ষ প্রমাণিত হয়। কোন্ প্রশ্ন কতখানি প্রাসঙ্গিক বা তাৎপর্যপূর্ণ, তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা সহজ নয়, অনেক সময় সম্ভবপরও নয়। তা নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিকগণের সহজাত অন্তর্দৃষ্টি। বিশাল অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া অনেক প্রশ্নের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ সম্ভবপর নয়।

পরীক্ষাসাপেক্ষ কিনা তা নির্ধারণ করা সহজতর। উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য কলাকৌশল থাকলে সরাসরি প্রশ্নটি পরীক্ষা করা যায়। উপযুক্ত কলাকৌশল না থাকলে, কোনো নূতন কলাকৌশল উদ্ভাবন করে প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নূতন কলাকৌশলটি বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণ করতে হবে। যখন প্রশ্নটি এরূপ বলে প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনো প্রকারেই তা পরীক্ষা করা যায় না, তখন প্রশ্নটির সকল আনুষঙ্গিক তাৎপর্যই বিজ্ঞানীগণের কাছে নষ্ট হয়ে যায়। অনুকল্পিত ইথারের সমুদ্রে পৃথিবীর গতি এবং সেই কারণে আলোকের গতির তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়—একথা প্রমাণিত হবার পরে, ইথার সম্পর্কে সমগ্র অনুকল্পটিই অবৈজ্ঞানিক বলে পরিত্যক্ত হয়।

সাধারণত বিজ্ঞানীগণ 'কী' ও 'কী করে', এই দুইটি প্রশ্নেরই সমাধান অনুসন্ধান করেন। 'কেন' বা 'কী কারণে'—এই প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই দিতে পারে না অথবা দিতে চেষ্টা করে না। 'কেন বিশ্বব্রহ্মান্ড অস্তিত্ব ধারণ করে?' 'কেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি সকল বস্তুর উপরে প্রভাব বিস্তার করে?' 'কেন বিবর্তন সংঘটিত হয়?'—এই জাতীয় প্রশ্ন বিজ্ঞানে প্রাসঙ্গিক নয়, পরীক্ষা-সাপেক্ষও নয়। 'কেন'—এই প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে বিজ্ঞানীগণ 'কী' বা 'কী করে'—এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তদনুসারে প্রশ্নের সমাধান অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হন।

প্রারম্ভিক অনুকল্প : কোনো একটি প্রারম্ভিক অনুকল্পের উপর ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান কাজের ছক বা ডিজাইন নির্মাণ করা হয়। মৌলিক প্রশ্নটির একটি পূর্বকল্পিত সমাধান চিন্তা করে ফলাফল সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করা সম্ভবপর, কিন্তু অনুকল্পটি (hypothesis) তখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রারম্ভিক অনুকল্প উদ্ভাবন করতে অনেক ক্ষেত্রেই আরোহমূলক (inductive) যুক্তির প্রয়োজন। কিন্তু প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অনুকল্পে আরোহমূলক যুক্তি প্রায় নিষিদ্ধ। বিজ্ঞানে অবরোহমূলক (deductive) যুক্তির বহুল প্রাদুর্ভাব থাকলেও, গবেষণালয়ে বিজ্ঞানীরা আরোহমূলক যুক্তি প্রচুর প্রয়োগ করেন। প্রারম্ভিক অনুকল্প ও পরীক্ষার পরিকল্পনা নির্মাণ অত্যন্ত মূল্যবান। তাদের উপরেই

পরীক্ষাটির প্রাসঙ্গিকতা ও বিশ্বস্ততা বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রারম্ভিক অনুকল্পটি গ্রহণযোগ্য না পরিত্যাজ্য, তা পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান : এই পদক্ষেপই বিজ্ঞানের মূলকেন্দ্র। পরীক্ষা ও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি কঠিন অংশ। কোনো পূর্ব নির্ধারিত প্রচলিত মাপকাঠি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক কোনো একটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনার অংশবিশেষকে নিয়ে পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর পক্ষেও প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিক প্রভাব সম্পর্কে সজাগ থাকা অনেক সময় সম্ভবপর হয়ে উঠে না। কোনো ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে গ্রহণ করলেও তা প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন নয়। পরীক্ষার বিষয়বস্তুটিতে পরিবর্তনশীল ও অনির্দিষ্ট মান যত কম হবে, পরীক্ষাটিও ততই নিখুঁত হবে। যেক্ষেত্রে বহু পরিবর্তনশীল ও অনির্দিষ্ট মান থাকে অথবা যেক্ষেত্রে বহু পরিবর্তনকারী প্রভাব বর্তমান থাকে, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীগণকে সাবধানতা ও বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

একটি সাধারণ পন্থা, ভিন্ন ভিন্ন সমান্তরাল পরীক্ষার মধ্যে তুলনা করা। কোনো একটিকে মাপকাঠিরূপে গণ্য করে অন্যান্য সমান্তরাল পরীক্ষায় এক বা একাধিক উপাদান বা মান এর তারতম্য করা যায়। পরে মাপকাঠির ফলাফলের সাথে অন্যান্য পরীক্ষাগুলির ফলাফল তুলনা করা যায়। মাপকাঠির ফলাফলের সাথে কোনো পরীক্ষার ফলাফলে ব্যবধান হলে, সেটা তারতম্যগুলির প্রভাব বলে গণ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে যে সব উপাদান বা মানের কোনো তারতম্য করা হয়নি, ফলাফলের উপরে তাদের সামগ্রিক প্রভাব প্রতিটি পরীক্ষায় সমান ছিল বলে ধরা হয়।

যে সকল ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তনকারী শক্তির প্রভাব সংযুক্ত, সেখানে কোনো একটি শক্তির প্রভাব অনেক সময় সহজ গাণিতিক সূত্রে ধরা পড়ে না। সেরূপ ক্ষেত্রে বহু সমান্তরাল পরীক্ষার উপরে ভিত্তি করে মাপকাঠির নির্দিষ্টতা ও পরীক্ষাগুলির ফলাফল নির্ণয় করতে হয়। এরূপ ফলাফল সাধারণত পরিসংখ্যানের উপরেই নির্ভর করে। জীববিজ্ঞানে অধিকাংশ পরীক্ষার পরিকল্পনা ও ফলাফলই পরিসংখ্যানভিত্তিক। বৃহৎ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জন্য পরিসংখ্যানভিত্তিক ফলাফলই সম্ভাবনার প্রকৃত নির্দেশ। প্রকৃতপক্ষে বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীগণ নির্দিষ্ট ফলাফল অপেক্ষা ফলাফলের সম্ভাবনা অন্বেষণ করতেই অধিকতর চেষ্টারত।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের ফলাফলই একমাত্র বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য। মৌলিক প্রশ্নটির যে প্রারম্ভিক অনুকল্প চিন্তা করা হয়েছিল, পরীক্ষার ফলাফল তা সমর্থন করতে পারে অথবা তা ভুল বলেও সাক্ষ্য দিতে পারে। সুতরাং উভয় অবস্থারই ফলাফল মূল্যবান। যদি অনুকল্পটি ভুল বলে ধরা পড়ে তবে অন্য একটি প্রারম্ভিক অনুকল্প উদ্ভাবন করা যেতে পারে এবং তদনুসারে নূতন পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরূপ একটির পর একটি প্রারম্ভিক অনুকল্প পরীক্ষা করে কালক্রমে সঠিক অনুকল্প ও প্রশ্নের সমাধানটি আবিষ্কার করা যায় এবং এর সমর্থনে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য ও পরীক্ষার ফলাফল হস্তগত হয়।

বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য বিশেষ ক্ষেত্রে যেরূপ অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, অন্যক্ষেত্রে তা অত্যন্ত দুর্বল বা কেবল ইঙ্গিতপূর্ণ থেকে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষা কোনোকিছুই চূড়ান্তরূপে 'প্রমাণিত' করে না। কোনো একটি প্রশ্ন সম্পর্কে অনুকল্প বা সমাধান উদ্ঘাটিত সাক্ষ্য ও এর শক্তির উপরে নির্ভর করে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠে। তবে সবসময় অধিকতর শক্তিশালী বা অধিকতর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের সম্ভাবনা থেকেই যায়। সুতরাং 'চরম সত্য' বা 'একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সত্য' বলে বিজ্ঞানে কিছুই নেই।

অনুকল্প ও মতবাদ : এটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শেষ ধাপ। পরীক্ষিত সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করে অনুকল্প প্রণীত হয়। যখন কোনে অনুকল্পের সপক্ষে নানা দিক থেকে বহু শক্তিশালী সাক্ষ্য সংগৃহীত হয়, তখন অনুকল্পটি মোটামুটি 'বৈজ্ঞানিক সত্য' রূপে প্রচলিত হয়। কোনো একটি বিস্তৃতক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষিত অনুকল্পের উপরে ভিত্তি করে 'বিশ্বজনীন' বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রস্তাবিত হয়। তা কেবল এদিক থেকেই সার্বজনীন যে, বিশেষ ক্ষেত্রটিতে মতবাদটি সর্বত্রই এবং সর্বদাই প্রাসঙ্গিক বা প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক এবং তা প্রযোজ্য নয় বলে কোনো পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য নেই। পরিবর্তনশীল জগতে অতি অল্পসংখ্যক মতবাদই সার্বজনীন বলে গ্রহণযোগ্য। সার্বজনীন বা প্রায় সর্বত্র প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি প্রাকৃতিক নিয়মরূপেও পরিগণিত হয়।

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক অনুকল্প ও মতবাদের একটি ভবিষ্যদর্শী রূপ আছে। সঠিক বৈজ্ঞানিক অনুকল্প অনেক সময় অজ্ঞাত অস্তিত্ব বা অজ্ঞাত ফলাফল সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রেই এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী হয়েছে। সৌরজগতের সীমান্তবর্তী গ্রহগুলি, গ্রহানুপুঞ্জ ও জার্মেনিয়াম ধাতুর আবিষ্কার সঠিক বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেছিলো। সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী অনেকক্ষেত্রে নূতন অনুকল্প বা মতবাদের সপক্ষে শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রদান করে।

কোনো বৈজ্ঞানিক অনুকল্প বা মতবাদই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয় বা চিরস্থায়ীও নয়। অন্তত বিজ্ঞানীগণ সেরূপ মনে করেন না। বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করে সম্ভাবনার পরিমাণ বা কোনো পরিবর্তনের সূত্র নির্ণয় করতে পারলেই বিজ্ঞানীগণ সন্তুষ্ট। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, বহু বৈজ্ঞানিক অনুকল্প ও মতবাদের আয়ুষ্কালই সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। কোনো প্রচলিত মতবাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য সংগ্রহ করতে পারলে তা অত্যন্ত মূল্যবান বলেই বিবেচিত হয়, কারণ তা এক নূতনতর সম্ভাবনা ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সূচনা করে। নূতন প্রচেষ্টায় পুনরায় চক্রাকারে পর্যবেক্ষণ, প্রারম্ভিক অনুকল্প প্রণয়ন ও পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান কাজ চলতে থাকে। কালক্রমে প্রচলিত অনুকল্প বা মতবাদ পরিত্যক্ত হয়ে এর স্থলে অধিকতর বিশ্বস্থ নূতন অনুকল্প বা মতবাদ প্রবর্তিত হয়। এভাবে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ ঘটে।

মস্তিষ্ক-গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা : যে-কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান একাধিক পন্থায় অনুসন্ধান করা সম্ভবপর। বিভিন্ন পন্থায় অনুসন্ধানের ফলাফল এক না হলেও, পন্থাগুলো মিলিতভাবে প্রশ্নটির নানাদিকে আলোকপাত করতে পারে। মানবমস্তিষ্ক ও মানবচেতনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা একাধিক ধারা গ্রহণ করেছে। মস্তিষ্ক-গবেষণার পন্থাগুলিকে মোটামুটি দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উন্মুক্ত ও খণ্ড-বিশ্লেষণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কে কোথায় কি রয়েছে এবং সামগ্রিক বা বিচ্ছিন্নভাবে কোথায় কি স্নায়বিক ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা হয়। স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের বস্তুগত সংগঠন ও কোষবিন্যাস এই অনুসন্ধানকার্যের একটি সনাতন ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তু। জটিল বস্তুকে ও জটিল প্রক্রিয়াকে খণ্ড খণ্ড করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে বহু তথ্য সংকলিত হয়েছে ও হচ্ছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কের গঠন ও কোষবিন্যাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কাজে অগ্রদূত ছিলেন কাজ্যাল (Cajal)। প্রথমত স্থূল গঠন, কোষবিন্যাস ও বিভিন্ন কেন্দ্রের তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়। আধুনিককালে ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বহু সূক্ষ্ম গঠনপ্রণালি ও কোষস্থাপত্য পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে।

মৌলিক গঠন ও কোষবিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। স্নায়বিক প্রক্রিয়াগুলি জীবিতাবস্থায় (সম্পূর্ণ অথবা বিখণ্ড অবস্থায়) পরীক্ষা করার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রধানত প্রাণীদেহেই অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে জীবদেহে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্নমুখী বিভক্তি ও অগ্রগামী বিবর্তন সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

কোষস্তরের সাংগঠনিক বিভক্তি ও কার্যপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী অবারিত করেই বিজ্ঞানীগণ সন্তুষ্ট নন। কোষস্তরের পশ্চাতে যে অবর কোষস্থাপত্য ও জৈব-রাসায়নিক স্তর রয়েছে সেসবই প্রক্রিয়াগুলির প্রধান উৎস। মস্তিষ্ক গবেষণার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য প্রাণরাসায়নিক ও আণবিক (মলিকিউলার) স্তরে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা বর্তমানকালে খুবই লক্ষণীয়। বহু জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে জটিল স্নায়বিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রক্রিয়াগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে অথবা অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে প্রভাবমুক্ত করে পরীক্ষা ও খণ্ড-বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। তবে বিচ্ছিন্নরূপে পরীক্ষা করেও প্রক্রিয়াগুলির অনেক মৌলিক প্রকৃতি ধরা পড়ে। উন্মুক্ত ও খণ্ড-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক উপাদানগুলি ও মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

(২) সার্বিক ও আচরণিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে সার্বিক প্রাণীটিকে একটি অবিভাজ্য জটিল একক ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা হয়। প্রাণীদেহেটি যেন একটি আবদ্ধ 'কালো বাক্স', তবে এতে অনেক আগমন পথ ও নির্গমন পথ রয়েছে। আগমনী শক্তিগুলির প্রভাবে নির্গমনের মানমাত্রা বহুলাংশে নির্ধারিত হয় এবং তা প্রাণীটির সামগ্রিক আচরণরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। আগমনী শক্তিগুলি ও প্রাণীটির আচরণ (behaviour) বিশ্লেষণ করলে, 'কালো বাক্স'টির অভ্যন্তরে কী কী প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে এবং কি প্রকার প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে অনেককিছুই ধারণা করা যায়। এরূপে পারিপার্শ্বিক শক্তিগুলির সাথে প্রাণীর আচরণের কার্য-কারণ সম্পর্কও ধরা পড়ে। এই পদ্ধতিতে প্রাণী ও মানবের আচরণ বিশ্লেষণ করে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আচরণিক পদ্ধতিতে পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও ফলাফলের পুনরাবৃত্তি অনেক সময় কষ্টসাধ্য ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অপরিহার্য।

উপরিলিখিত পদ্ধতি দুইটি একে অন্যের বিপরীত নয়, বরং এরা একে অন্যের সম্পূরক। আচরণিক পদ্ধতিতে এরূপ অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, যা পূর্বে বা পরে উন্মুক্ত ও খণ্ড বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। অনুরূপ খণ্ড-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে উদ্ঘাটিত তথ্যাবলি আচরণিক ক্ষেত্রে বহু নূতন নূতন বিষয়ে আলোকপাত করেছে। মহাবিজ্ঞানী পাভলভ ও তাঁর শিষ্যরা এই দুই পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনে বহুলাংশে সক্ষম হন। বর্তমানে নানা ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানুষের আচরণের উপরে সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এসব ওষুধ বিজ্ঞানীগণের হাতে আসার ফলে আচরণিক পদ্ধতিতে মস্তিষ্ক গবেষণার সম্ভাবনা বহুরূপে বিস্তার লাভ করেছে।

সনাতন পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালি ও নিরীক্ষিত আচরণের বিশ্লেষণ করতে গেলে নানা অবাঞ্ছিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। কেবল সংজ্ঞার পরে সংজ্ঞা উত্থাপন করে আচরণের বিভিন্ন অঙ্গগুলিকে সম্পর্কবদ্ধ করা যায় না। আচরণের বিভিন্ন দিকের ব্যাখ্যা সংজ্ঞা দ্বারা করা হলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র ধরা পড়ে না। বর্তমানকালে মস্তিষ্ক-গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এই নূতন পদ্ধতি গাণিতিক প্রণালি ও গাণিতিক ভাষার উপরে নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক দেহে প্রধানত যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ কাজে নিয়োজিত। গাণিতিক ভাষা প্রয়োগ করে যেভাবে অজৈব যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করা যায়, সেভাবে প্রাণীর মৌলিক আচরণের বিশ্লেষণ করাও কতকটা সম্ভবপর। গাণিতিক ভাষায় সংজ্ঞা ও সূত্রাবলির অর্থ মোটামুটি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

প্রাণীদেহের জটিল গতিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আচরণের পরিবর্তন, প্রতিক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়তা, যোগাযোগ ব্যবস্থার স্থানাঙ্ক, ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট গাণিতিক সংজ্ঞা ও সূত্রাবলী প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে এরূপ গাণিতিক ভাষা ও যুক্তি সকলের পক্ষে অনুসরণ করা সহজসাধ্য নয়। এই নতুন গাণিতিক বা সাইবারনেটিক্স (cybernetics) পদ্ধতি মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালি ও প্রাণীর সামগ্রিক ব্যবহার সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ ও আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বহুগুণে উন্নতি লাভ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মস্তিষ্ক ও চেতনা

বিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগৎ ও মানুষের বর্তমান অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য বহু নূতন গুণাগুণের সাথে প্রাণবান বস্তু চেতনারূপ গুণও অর্জন করেছে। চেতনা প্রাণীর সামগ্রিক অস্তিত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা প্রতিটি মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অধিকার। এটি প্রতিপাদ্য বা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নয়। তবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অভিযোজনমূলক (adaptive) আচরণের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা যায়। প্রাণীর আচরণের পেছনে যে বস্তুগত সংগঠন ও জৈবিক প্রক্রিয়া রয়েছে তাও পরীক্ষার যোগ্য। কোনো অস্তিত্ব যে সব গুণাগুণ ধারণ করে বা প্রকাশ করে, তাদের সাথে অস্তিত্বটির ও তার পরিবেশের সম্পূর্ণ বস্তুগত কার্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে — এই নীতিই এই পুস্তকের মূলনীতি। এই নীতি থেকে এটাও প্রতিপাদ্য যে, বস্তুর অস্তিত্ব ঘটনাসাপেক্ষ এবং তা স্থান ও কালের সীমায় আবদ্ধ। মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনশক্তিও তার ঘটনাসাপেক্ষ অস্তিত্বের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কবদ্ধ।

মস্তিষ্কের স্থান : পৃথকীকরণের (differentiation) ফলে উন্নত প্রাণীর দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ ভিন্ন ভিন্ন। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা থাকা দরকার। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয়, মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। মস্তিষ্কসহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এই নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। প্রাণীর অভিযোজনমূলক ও শিক্ষালব্ধ আচরণগুলির নিয়ন্ত্রণ প্রধানত মস্তিষ্কের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। মস্তিষ্ক দেহের স্নায়বিক ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলির এক মহাকেন্দ্র।

বাহুল্য বলা যে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের জন্য মস্তিষ্ক একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্রও বটে। প্রাণীর সমগ্র জীবনকালে মস্তিষ্কই এর যাবতীয় আচরণের নিয়ন্ত্রক ও পরিবর্তক হিসাবে কাজ করে। স্নায়বিক ও মানসিক ক্রিয়াগুলির বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া প্রয়োজন তা সম্পাদনে মস্তিষ্ক কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে তার বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধাপসমূহের একপ্রান্ত সংবেদী ইন্দ্রিয়াদি ও গ্রাহীযন্ত্রের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশ ও বহির্জগতের সাথে যুক্ত। অন্যপ্রান্ত অন্যপথে বিভিন্ন দেহযন্ত্র ও গতিসঞ্চালক পেশী পর্যন্ত বিস্তৃত।

বহু জটিল প্রাণরাসায়নিক ও তাড়িত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্নায়বিক ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। মানবমস্তিষ্কটি একটি বৃহৎ ও অত্যন্ত জটিল স্বয়ংক্রিয় তাড়িত-রাসায়নিক কারখানার নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সমতুল্য। এটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং এর

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাঠামো ও নকশা রয়েছে। জনন-সংক্রান্ত সংকেত প্রণালি এর মূল কাঠামোটি নির্ধারণ করে, কিন্তু সব কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করে না। জন্মকালে মস্তিষ্কের বহু প্রচ্ছন্ন শক্তি সুপ্ত ও সম্ভাবনাপূর্ণ থাকে। প্রাণীটির জীবনকালে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিভিন্ন মাত্রায় পরিপূর্ণতা অর্জন করে। যে স্থানে জন্মগত সক্রিয় যোগাযোগ বা কার্যক্ষমতা ছিল না, সে স্থানে সক্রিয় যোগাযোগ ও কার্যক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। মস্তিষ্কের অসংখ্য পরিবর্তনশীল ও গঠনশীল সম্ভাবনাই মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে।

প্রায় এক সহস্রকোটি একক স্নায়ুকোষ বা নিউরন নিয়ে গঠিত এই মহাকেন্দ্রে অসংখ্য যোগাযোগ পথ, অসংখ্য বিশ্লেষণ কেন্দ্র ও একটি বিরাটাকার স্মৃতিভাণ্ডার রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে যে অসংখ্য স্নায়বিক বার্তা মস্তিষ্কে আসে ও মস্তিষ্ক থেকে যে অসংখ্য বার্তা দেহের বিভিন্ন অংশে যায়, এরা মূলত বৈদ্যুতিক সংকেত। অন্তর্মুখী সংবেদী (sensory) সংকেতগুলি নানা গতিতে, নানা মাত্রায় ও নানা সংযোগে বিভিন্ন স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে আসে। স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে বহু সংযোগস্থল রয়েছে। সংযোগস্থলে বার্তাসমূহ সংকলিত ও সংশোধিত হয় এবং এদের মধ্যে সহযোগ (association) সাধিত হয়। মস্তিষ্কই এরূপ স্নায়বিক সংযোগ ও সহযোগের অন্তিমস্তর। নিদ্রায় ও জাগরণে, চেতন ও অচেতন অবস্থায়—প্রতিটি মুহূর্তে অসংখ্য স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলির মধ্যে এক উত্তেজনার নকশা সৃষ্টি করে। পুনরায় বহির্মুখী সংকেতচিহ্ন মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে নির্গত হয় ও মোটর (motor) স্নায়ুপথ বেয়ে দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি, দেহযন্ত্র ও পেশীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল বহির্মুখী সংকেতই মস্তিষ্কের শাসন ও নিয়ন্ত্রণের বার্তা দেহের সব জায়গায় নিয়ে যায়।

মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষগুলির অবস্থান, ওদের পারস্পরিক সংযোগ, উত্তেজনার মাত্রা ও সামগ্রিক কার্যকলাপ একটি মানুষের জীবনধারণ, আচরণ, অনুভূতি ও চিন্তাধারা—এককথায় তার সামগ্রিক অস্তিত্বের মূল কাঠামো নির্ধারণ করে। প্রতি মুহূর্তে মস্তিষ্কের অসংখ্য স্নায়ুকোষের মধ্যে বিভিন্নমুখী সংকেতমালার বিনিময় ও সহযোগের ফলে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়বিক উত্তেজনার নকশা বাস্তবায়িত হয়, তাই সেই মুহূর্তে ব্যক্তিটির উপলব্ধি, অনুভূতি ও ভাবাবেগ নির্ধারণ করে। অনুভূতি ও ভাবাবেগ প্রকাশ বা দমন করার জন্য মস্তিষ্কেই পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে মূল্যবান নকশার গতিময় অস্তিত্বটিকে বিশেষরূপে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করার জন্য মস্তিষ্কেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক স্মৃতি-ভাণ্ডার রয়েছে। কোনো একটি পর্যায়ে, কোনো না কোনো পন্থায় স্নায়বিক অস্তিত্বটি মানসিক অস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়। এখানে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের অবকাশ থাকে—সেই পর্যায়টি কি এবং সেই পন্থাটিই বা কি?

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে এই প্রশ্নের আজো সমাধান হয়নি। মানসিক অস্তিত্বের স্বরূপটি প্রতিটি মানুষের নিকট বোধগম্য হলেও সেটির কোনো সাধারণ বৈজ্ঞানিক সূত্র বা সংজ্ঞা নেই। একটি মানুষের মানসিক উপলব্ধি অপর কোনো মানুষের কাছে সরাসরি হস্তান্তরেরও কোনো পথ নেই। এসব কারণে মানসিক অস্তিত্বটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পরিমাপ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের জন্য বর্তমানে বিজ্ঞানের যেসব নীতিমালা রয়েছে, মানসিক অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য সেগুলি যথেষ্ট কিনা, সেটাও প্রশ্নবোধক।

প্রতিমুহূর্তে একটি মানুষের মস্তিষ্কে উত্তেজনার যে নকশা নির্মিত হয়, ওসবের অধিকাংশই সাধারণ বা অতি পরিচিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ প্রয়াসের ফলে কখনও বা অসাধারণ, কখনও বা সম্পূর্ণ নূতন নকশা বাস্তবায়িত হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সেই নূতন নকশা সার্থক মানবিক সৃষ্টির রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সৃষ্টিমুখী এই চেতনশক্তি আমাদের পরিচিত জগতে কেবল মানবমস্তিষ্কেরই আয়ত্তে।

অসাধারণ মানসিক শক্তি মানুষের স্বভাব ও আচরণের যে বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছে, তার ফলে মানুষ অন্যান্য সকল পার্থিব প্রাণী থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে মানুষ অসাধারণ ও নিঃসঙ্গ। সে সবকিছু চেতনার সাহায্যে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট। মানুষ সুদূর অনুকল্প নির্মাণ করে ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমে তার জ্ঞান উন্নত করতে সচেষ্ট হয়। মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খল অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ-পূর্বক সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলা আনয়নে প্রয়াসী হয়। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে সে প্রকৃতির রহস্যাবলী ক্রমাগত উদ্ঘাটিত করায় সক্ষম হয়েছে। নিজেকে ও জগৎকে জানার জন্য তার অন্তহীন প্রয়াস অব্যাহত।

মস্তিষ্ক ও চেতনার গুণাগুণ, কার্যপ্রণালি ও কার্য-কারণ সম্বন্ধে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা একটি দুরূহ কাজ। মস্তিষ্ক ও চেতনার আনুষঙ্গিক অনেক প্রক্রিয়া এখনও অজ্ঞাত। এমনকি চেতনা বাস্তবায়িত হবার মৌলিক প্রক্রিয়াটিই এখনও সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। বিজ্ঞানের ও মানুষের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এটাই হয়তো সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন। যা আমাদের নিকটতম, তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। যা অন্য সকল রহস্য উদ্ঘাটন করে বা করতে সচেষ্ট, তাই সর্বাপেক্ষা রহস্যাবৃত। তবে নিরাশ হবার মতো কিছু নয়। অন্য সব জটিল প্রাকৃতিক রহস্যের মতো মস্তিষ্ক ও চেতনার রহস্যাবলীও ক্রমাগত উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এইক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের প্রচেষ্টার শেষ নেই।

বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও চেতনার সীমানা প্রসারিত করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দৃঢ় শৃঙ্খলার মাধ্যমে আমরা যতই অনুসন্ধান করি, প্রকৃতির রহস্যাবলী ততই আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে বস্তুজগতের বিভিন্ন নিয়মাবলী, গুণাগুণ ও কার্য-কারণ জানা গেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করে, কেবল সহজযুক্তি বা কল্পনার ফানুস উড়িয়ে কেউ মানবঅস্তিত্ব ও মানবচেতনার গূঢ় রহস্যাবলী উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবে না। কালক্রমে বিজ্ঞানই মস্তিষ্ক ও চেতনার অজ্ঞাত রহস্যগুলি উন্মুক্ত করতে সক্ষম হবে। চেতনার কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কটির গঠন ও কার্যপ্রণালি সম্পর্কে যখন আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পারবো, কেবল তখনই চেতনা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হয়তো কিছুটা প্রাসঙ্গিক ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

মস্তিষ্কের বিবর্তন

অতি জটিল মানবমস্তিষ্কটি আকস্মিকভাবে গড়ে উঠে নি। লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্ক ও চেতনশক্তির বাস্তবায়ন ও উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। জীবনীশক্তি ভিন্ন ভিন্ন বহুস্তরে, বহুবিধ সম্ভাবনার পরীক্ষিত ফলাফলের উপরে নির্ভর করে অবশেষে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। জীবনীশক্তি বংশগতির ধারাকে বংশানুক্রমে সঞ্চালনে সক্ষমতা অর্জন করেছে। প্রজনন সংক্রান্ত ধারা-নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক সংকেত নিত্য নূতন ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করছে।

লক্ষ লক্ষ্য বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরীক্ষিত ফলাফল ক্রমাগত সংশোধিত ও সংকলিত হয়ে যে কালজয়ী বংশপরম্পরা, যোগাযোগের সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রতিটি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে ধারণ করে। প্রাণীজগতের বিভিন্ন স্তরে মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালি লক্ষ্য করলে মানবমস্তিষ্কের বিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়।

এককোষবিশিষ্ট প্রাণীজগতেও সংবেদনশীলতা অথবা পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের প্রতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রোটোপ্লাজমের (protoplasm) একটি সহজাত গুণ। পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজনের জন্য এরূপ প্রতিক্রিয়া কার্যকরী। প্রতিক্রিয়া প্রদান ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে গতিময় সাম্যাবস্থা রক্ষার জন্য পৃথক স্নায়বিক যোগাযোগ পথ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবল মেটাজোয়া (metazoa) বা বহুকোষধারী প্রাণীর স্তরেই পরিলক্ষিত হয়। সর্বাপেক্ষা সহজ স্নায়ুতন্ত্র হাইড্রা (Hydra) ও জেলীফিস্ (Jellyfish) জাতীয় নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে দেখা যায়।

হাইড্রার স্নায়ুতন্ত্র : হাইড্রার সহজ স্নায়ুতন্ত্রে কার্যগত দিক থেকে তিনটি স্পষ্ট বিভাগ রয়েছে। প্রথম বিভাগে সংবেদী দেহকোষ বহির্জগতের পরিবর্তনের বার্তা গ্রহণ করে। এই গ্রাহীকোষগুলিই সরলতম ইন্দ্রিয়স্থান। দ্বিতীয় বিভাগের দেহকোষগুলি স্নায়বিক বার্তা দেহের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালন করে। এদের একপ্রান্ত সংবেদী বিভাগের ও অন্যপ্রান্ত মোটর জাতীয় দেহকোষগুলির সাথে যুক্ত। যোগাযোগের দিক থেকে এরা মধ্যবর্তী বা সহযোগী অংশ। তৃতীয় বিভাগের দেহকোষগুলি গতিসঞ্চালক ও মোটরজাতীয়। স্নায়বিক উত্তেজনার স্পর্শে এরা সংকুচিত বা আন্দোলিত হয়ে গতি সৃষ্টি করতে পারে। হাইড্রার দেহে স্নায়বিক কাজে নিযুক্ত দেহকোষগুলি অন্যান্য দেহকোষ থেকে খুব আলাদা ধরনের নয়; তবে এদের তন্তুর মতো শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

সংবেদী কোষগুলি মধ্যবর্তী কোষের মাধ্যমে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি, গতিসঞ্চালক কোষে উত্তেজনার বার্তা প্রেরণ করে। সংবেদী অংশের সাথে, গতিসঞ্চালক অংশের সরাসরি যোগাযোগ হলে, সহজতম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাজে নমনীয়তা থাকে না এবং বিভিন্নমুখী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের কোনো অবকাশ থাকে না। যখন সংবেদী ও গতিসঞ্চালক অংশগুলি একটি সাধারণ মধ্যবর্তী প্রণালিতে সংযুক্ত হয়, তখন বিভিন্নমুখী সহযোগ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়। সাধারণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে ও স্নায়বিক তন্ত্রে, মধ্যবর্তী অংশেই নিয়ন্ত্রণের কাজ কেন্দ্রীভূত হয়। মধ্যবর্তী প্রণালিগুলি বহু মেরুবিশিষ্ট হলে বিভিন্ন গতিসঞ্চালক অংশগুলিকে একস্থান থেকেই উত্তেজিত করা যায়। তখন সামগ্রিক কাজ নানা দিক থেকে নমনীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠে। মধ্যবর্তী অংশের অবস্থান ও বহুমুখী সংযোগ যোগাযোগের সম্ভাবনা যেরূপ বৃদ্ধি করে, এর জটিলতা ও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করে।

জেলীফিশের দেহে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও কেন্দ্রীভূত। এদের দেহের গোলাকৃতি, কেন্দ্রীভূত যোগাযোগের সহায়ক। জেলীফিশের দেহের মধ্যভাগে দুটি চক্রাকৃতির স্নায়ুপ্রণালি আছে। উপরের বড় চক্রটি সংবেদী ইন্দ্রিয়স্থান ও গতিসঞ্চালক পেশীগুলির সাথে যুক্ত। চক্র দুটি একে অন্যের সাথে স্নায়বিক জালির মাধ্যমে বহুযোগে যুক্ত। নিম্নের চক্রটি প্রধানত সহযোগের কাজে নিযুক্ত। চক্রগুলি থেকে বহুমুখী স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে প্রসারিত হতে পারে। অবশ্য এ সকল নিম্নস্তরের প্রাণীর সকল গতি ও প্রতিক্রিয়াই অত্যন্ত সহজ ও নির্দিষ্ট।

দ্বিখণ্ড পরিকল্পনা : দেহের দ্বিখণ্ড পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার পরে বহু প্রাণীর গঠনই লম্বালম্বি ধরনের হয়ে উঠে। ফলে দেহের বাম-ডান ও সম্মুখ-পশ্চাৎ ভাগের সৃষ্টি হয়। এই নূতন পরিকল্পনায় স্নায়ুতন্ত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আসে। দ্বিখণ্ড পরিকল্পনায় কার্যগত কেন্দ্রীকরণ সহজসাধ্য। প্রাণীদেহের পৃথকীকরণ (differentiation) ও বিভিন্নমুখী উন্নতির ফলে একটি বিশ্বস্ত কেন্দ্রীয় শাসন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। যা প্রথমে কেবল সংবেদী ও প্রাথমিক মোটর প্রতিক্রিয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল, সেই স্নায়ুতন্ত্রের উপরে দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্রীয় দায়িত্বও ন্যস্ত হয়। দেহযন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকলে জটিল দেহের সামগ্রিক আচরণে ও সাম্যাবস্থা রক্ষার কাজে একতা ও নিয়মানুবর্তিতা থাকে না ; কেবল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণই শৃঙ্খলা আনতে পারে। স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

বিবর্তনের প্রথমদিকে স্নায়ুকেন্দ্রগুলি দেহের বিভিন্ন অংশে জড়ো হতে আরম্ভ করে। প্রাথমিক ইন্দ্রিয়স্থানগুলি পুনঃপুনঃ বিভক্তি ক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল ও উন্নত ইন্দ্রিয়যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কয়েকটি বিশেষ ইন্দ্রিয়যন্ত্র দেহের সম্মুখভাবেই সন্নিবিষ্ট হয়। কালক্রমে পতঙ্গাদির তীক্ষ্ণ ঘ্রাণযন্ত্র, মাছির জটিল যৌগিক দৃষ্টিযন্ত্র এবং এরূপ বহু সার্থক ও সুন্দর কার্যকরী যন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্রীয় গ্যাংলিয়া (ganglion) : প্রধানত বিশেষ ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির অবস্থানের জন্যই, দেহের সম্মুখভাগের স্নায়ুকেন্দ্র বা গ্যাংলিয়াগুলি অধিক থেকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

সম্মুখভাগের গ্যাংলিয়াগুলির প্রভাবে দেহের অন্য অংশের স্নায়ুকেন্দ্রগুলি হয় পরাভূত না হয় লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথমত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পড়ে গ্রাসনালীর উপরস্থিত সুপ্রা-ইসোফেজিয়াল (Supra-esophageal) বা সেরিব্রেল (Cerebral) গ্যাংলিয়ার উপরে। সেরিব্রেল গ্যাংলিয়া ছিল সংবেদী কাজে নিযুক্ত কতগুলি অন্তর্বাহী স্নায়ুপথের যোগাযোগ কেন্দ্র। একটি কেঁচোর দেহ থেকে সেরিব্রেল গ্যাংলিয়া অপসারণ করা হলেও কেঁচোটি বেঁচে থাকে ও স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যগ্রহণ করে। প্রথমত সেরিব্রেল গ্যাংলিয়া অতিরিক্ত কাজ হিসাবে প্রয়োজনবোধে দেহের অন্যান্য গ্যাংলিয়াগুলির উত্তেজনার মাত্রা হ্রাস করতো। পরবর্তী স্তরে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলো যে সেরিব্রেল গ্যাংলিয়া যেরূপ কেন্দ্রীয়ভাবে অন্যান্য গ্যাংলিয়ার উত্তেজনায় বাধা সৃষ্টি করে, এর নিকটবর্তী গ্রাসনালীর নিম্নস্থিত গ্যাংলিয়াটি (সাব-ইসোফেজিয়েল গ্যাংলিয়া) সেরূপ দেহের অন্যান্য গ্যাংলিয়ার মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। পলিকীটা (Polychaeta) অথবা শামুকের (Snail) দেহ থেকে কেন্দ্রীয় গ্যাংলিয়া দুটি অপসারণ করা হলে এরা খাদ্যগ্রহণ করতে পারে না এবং এদের দেহ নিশ্চল হয়ে যায়।

অক্টোপাসের মস্তিষ্ক : প্রাণীর সামগ্রিক আচরণের পরিবর্তন স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক কাঠামো ও কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনে। বহু প্রাচীন প্রাণী সম্পূর্ণ লুপ্ত হলেও কোন কোন বর্তমান প্রাণী প্রাচীন ঐতিহ্য এখনও ধারণ করে। অক্টোপাস (Octopus) তুলনামূলকভাবে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রাণী। অক্টোপাসের দেহে কেন্দ্রীয় গ্যাংলিয়া দুটি পরস্পরের সাথে নানা সংযোগে যুক্ত হয়ে একটি আদি মস্তিষ্কের সৃষ্টি করেছে। স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই উন্নতি একটি বিরাট ধাপ। অক্টোপাস ও স্কুইড্ (Squid) জাতীয় অন্যান্য প্রাণী ওদের পূর্ববর্তী সকল প্রাণী থেকে বহুগুণে অধিকতর জটিল ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ প্রকাশ করতে সক্ষম। অক্টোপাস নানা প্রকার দেহভঙ্গিমা, ভীতিভাব, সহজাত প্রবৃত্তি ও জটিল যৌন আচরণ প্রকাশ করতে পারে। ওদের আঞ্চলিক প্রবৃত্তি (territorial instinct), হিংসাত্মক আচরণ, গৃহমুখী আকর্ষণ প্রবণতা (homing instinct) ও প্রখর দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। অক্টোপাসের ব্যবহারের মধ্যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী (conditioned reflex) ক্রিয়ার প্রভাব আরোপ করা যায়। সহজ ধাঁধার সম্মুখীন হলে অক্টোপাস তা সমাধান করতে পারে এবং জটিল ধাঁধা সমাধান করার শিক্ষাও একে প্রদান করা যায়।

অক্টোপাসের মস্তিষ্কে সাংগঠনিক ও কার্যগত বিভক্তি ক্রিয়া বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এর মস্তিষ্কে সর্বমোট ১৪টি অংশ আছে এবং এরা ভিন্নভিন্ন কাজে নিযুক্ত। সাংগঠনিক দিক থেকে (এবং কার্যগত দিক থেকেও) উর্ধ্বতন পাঁচটি বিভাগ কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণ, জটিল আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত। এদের মধ্যে একটি (ভার্টিকেলস্) স্তন্যপায়ী প্রাণীর গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রামের সমতুল্য।

মেরুদণ্ডী প্রাণী : ঘনিষ্ঠ ও বহুমুখী সংযোগ স্থাপনের জন্য দেহের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের নিকট অবস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্তরে এক নূতন পরিকল্পনা কার্যকর হয়ে উঠে। স্নায়ুকেন্দ্রগুলি দেহের কেন্দ্রাভিমুখে স্থানান্তরিত হতে আরম্ভ করে অবশেষে একটি

কেন্দ্রীয় মেরুরজ্জু ও দেহের সম্মুখভাগে একটি কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে অতিমূল্যবান এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি মেরুদণ্ড ও করোটির অস্থিগুলোর অন্তরালে, দেহের কেন্দ্রীয় ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন স্তরে ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর স্নায়বিক ক্রিয়া কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং এরা মস্তিষ্কে অথবা মেরুরজ্জুতে স্থান লাভ করে। নূতন প্রক্রিয়াগুলি এবং ওদের আনুষঙ্গিক বস্তুগত বৃদ্ধি প্রধানত মস্তিষ্কেই স্থান লাভ করে। ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি ও পৃথকীকরণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং এতে নূতন নূতন অংশ সংযোজিত হতে থাকে। মস্তিষ্ক বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান এই প্রক্রিয়া বা এন্‌কেফালাইজেশন মানুষের ক্ষেত্রে দেহের তুলনায় একটি বৃহদাকার মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রামের স্নায়ুকোষবাহী উপরের স্তরকে সেরিব্রেল কর্টেক্স বলে। উন্নত প্রাণীর সেরিব্রেল কর্টেক্স মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের তুলনায় আয়তনে বড়। সেরিব্রেল কর্টেক্সই মস্তিষ্কের বিবর্তনের সর্বশেষ ও নূতনতম অংশ। মানবমস্তিষ্কে এই কর্টেক্স মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান জুড়ে থাকে।

মানবমস্তিষ্ক : মানবমস্তিষ্কের ওজন ১২০০ থেকে ১৫০০ গ্রাম। এর সাথে মানুষের সমগ্রদেহের ওজনের অনুপাত মোটামুটি ১:৩৫। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্র বানর ব্যতীত সমগ্র জীবজগতে অন্য কোনো প্রাণীতে এই অনুপাত মানুষ অপেক্ষা বেশি নয়। হাতি বা তিমি মাছের মস্তিষ্ক মানবমস্তিষ্ক অপেক্ষা অনেক বড় ও ভারী হলেও, দেহের ওজনের তুলনায় ওদের মস্তিষ্কের ওজন অনেক কম (যথা—হাতির অনুপাত ১:৫৬০)। মানুষের নিকটতম বনমানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা মানব-মস্তিষ্কের পূর্ণ ওজন ও আনুপাতিক ওজন উভয়ই অনেক বেশি। আনুপাতিক ওজনে মানবমস্তিষ্ক গরিলার মস্তিষ্ক অপেক্ষা ১০ গুণ, শিম্পাঞ্জীর অপেক্ষা ৪ গুণ, ওরাংওটাং এর অপেক্ষা ৬ গুণ এবং গিবনের অপেক্ষা ২ গুণ অধিক ভারী (চিত্র ৩.১ দ্রঃ)। মস্তিষ্কের আনুপাতিক ওজনের দিক থেকে সমগ্র প্রাণীজগতে মানুষের পরেই যে প্রাণীর অবস্থান, সেটি হলো ডলফিন।

স্বতন্ত্র বংশ-বৈশিষ্ট্যধারী মানব প্রজাতি বা হোমো সেপিয়েনস্ (*Homo sapiens*) প্রায় দুই লাখ বছর আগে প্রথমে আফ্রিকা মহাদেশে উৎপত্তি লাভ করে। হোমো সেপিয়েনস্‌দের সাক্ষাৎ পূর্ব পুরুষেরা ছিল হোমো ইরেকটাস্ (*Homo erectus*), যাদের দেহাবশেষ আফ্রিকা, জাভা ও চীনে পাওয়া গেছে। হোমো ইরেকটাস্‌দের দেহ ছিল মোটামুটি মানুষের মতো, তবে মাথার খুলি ও চোয়ালের আকৃতির মধ্যে তারতম্য দেখা যায়।

মাথার খুলির আকৃতি ও ধারণ ক্ষমতা থেকে মস্তিষ্কের আয়তন ও আকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। হোমো সেফিয়েনস্‌দের মস্তিষ্কের আনুপাতিক ওজন যেখানে ১:৩৫, হোমো ইরেকটাস্‌দের গড়ে সেই অনুপাত ১:৬৫। হোমো ইরেকটাস্ ও হোমো সেফিয়েনস্‌দের মাঝামাঝি নিয়েন্ডারথেল (Neanderthal) ও ক্রো-মেগনন্ (Cro-magnon) জাতীয় যে দুই প্রকার মানুষের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, তাদের মাথার ধারণ ক্ষমতা মোটামুটি ১৫০০ ঘন সে.মি. যা আধুনিক মানুষের তুলনায় কিছুটা বেশি। তবে আধুনিক মানব মস্তিষ্কে পুরোখণ্ড

ও পার্শ্বস্থ খণ্ড যতো বড় (পৃ. ৪৬ দ্রষ্টব্য), নিয়েন্ডারথেলদের তেমনটা ছিলনা। তাদের ক্ষেত্রে বরং মধ্যপশ্চাৎ খণ্ড ও পশ্চাৎখণ্ড—এই দুটি তুলনামূলকভাবে বড় ছিল।

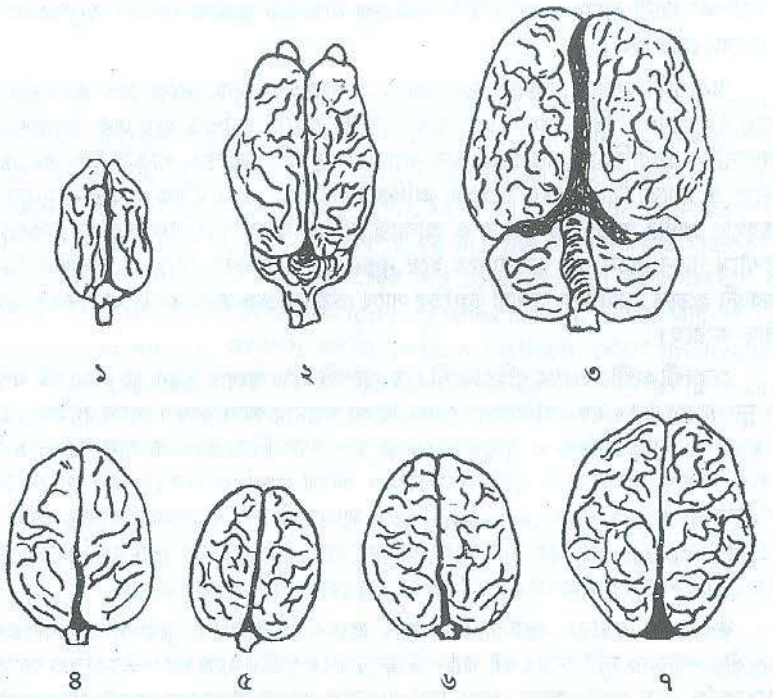

চিত্র ৩.১ : মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক (তুলনামূলক চিত্র) : ১. কুকুর, ২. ঘোড়া, ৩. হাতি, ৪. গিবন, ৫. শিম্পাঞ্জী, ৬. গরিলা ও ৭. মানুষ।

এসব তারতম্য থেকে ধারণা করা হয় নিয়েন্ডারথেল মানুষেরা হয়তো আধুনিক মানুষের সাক্ষাৎ পূর্ব পুরুষ নয়, বরং তাদের নিকটস্থ অন্য একটি প্রজাতি, যেটি কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের সাক্ষাৎ পূর্ব পুরুষদের মস্তিষ্কের ক্রমবর্ধমান আকৃতি ও আনুপাতিক ওজন বৃদ্ধি তাদের জীবনধারা ও মানসিক কার্যকলাপের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।

প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষদের সাথে তুলনামূলক বিচারে হোমো সোপিয়েনস প্রজাতির যে সংজ্ঞা, তার প্রধান ও প্রাথমিক শর্তটিই হলো তার মস্তিষ্কের বর্ধিত আকৃতি ও আনুপাতিক ওজন। প্রথমে হাতযন্ত্র এবং পরে ভাষার ব্যবহারের সাথে সাথে চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ হয়। ফলে মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ এলাকা প্রাধান্য লাভ করে।

আধুনিক মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষদের মস্তিষ্ক নারীদের মস্তিষ্ক অপেক্ষা গড়ে ১৫০ ঘন সে. মি. বড়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে নরনারীর মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। পুরুষদের

তুলনায় নারীদের দেহের উচ্চতা ও ওজন সচরাচর কম বলেই হয়তো তাদের মস্তিষ্ক তুলনামূলকভাবে ওজনে কিছুটা কম এবং আকারে সামান্য ছোট। পুরুষদের ক্ষেত্রেও মস্তিষ্ক কিছুটা ছোট বা বড় হবার সাথে বুদ্ধিমত্তার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি এলবার্ট আইনস্টাইনের মস্তিষ্কটি অনেক সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা ছোট ছিল।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্কে সাংগঠনিক ও কার্যগত দিক থেকে বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। কার্যগত দিক থেকে এরা একের উপর অন্যটি স্থাপিত হয়ে এক বহুতলবিশিষ্ট প্রশাসনিক পিরামিডের মতো অবস্থান করে। উপর্যুপরি অবস্থিত প্রতিটি উর্ধ্বতন স্তরের কাজ ও ক্ষমতা নীচের স্তর অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও সামগ্রিক। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্তরগুলি প্রাণীর আচরণিক ক্ষেত্রে ও অস্তিত্বে বিভিন্ন স্তররূপে প্রতিফলিত হয়। বিবর্তনের মাধ্যমে নূতন নূতন স্তর বাস্তবায়িত হয়ে নূতন নূতন স্নায়বিক ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়ার প্রবর্তন হয়েছে। মানসিক ক্রিয়ার উন্নতির সাথে চেতনশক্তিও ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করেছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের বহিরাবরণী (যে অংশটি হতে ত্বকের উদ্ভব হয়) থেকেই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উদ্ভব হয়। পরিবেশের সাথে দেহের সংযোগ স্থলে ত্বকের যেমন ভূমিকা, তারই উন্নততর পর্যায়ে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র তাদের স্থান করে নিয়েছে। বলা যায়, জন্মগত দিক থেকে মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও ত্বক সমপর্যায়ের। ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় এর পিঠের দিকে বহিরাবরণী বা একটোডার্ম (ectoderm) স্তরে মাঝামাঝি দিকটা লম্বালম্বিভাবে ফুলে উঠে নটোকর্ড (notochord) এর সৃষ্টি করে ; এটিরই অন্য নাম স্নায়বিক প্লেট বা নিউরেল প্লেট। এই প্লেটের সম্মুখভাগ প্রথম থেকেই পশ্চাৎভাগ থেকে বেশী প্রশস্ত থাকে।

কালক্রমে নিউরেল প্লেটটি ভাঁজ হয়ে ভ্রূণের ভিতরদিকে ঢুকে পড়ে এবং একটা অগভীর ফাটলের সৃষ্টি করে। এই ফাটলটি ক্রমে ক্রমে গভীর হতে থাকে এবং দুপাশের ভাঁজ কাছাকাছি এসে পরে জোড়া লেগে যায়। এভাবে ভ্রূণের অভ্যন্তরে একটা আবদ্ধ ফাঁপা নালিকা বা নিউরেল টিউব এর সৃষ্টি হয়। এই নালিকার প্রশস্ত সম্মুখভাগ পরবর্তীতে মস্তিষ্কে এবং সরু পশ্চাৎভাগ মেরুরজ্জুতে রূপান্তরিত হয়। নিউরোব্লাস্ট (neuroblast) নামক অবিন্যস্ত কতগুলি জীবকোষ পুনঃপুনঃ বিভাজনের মাধ্যমে কালক্রমে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়ুকোষের সৃষ্টি করে। জন্মের পরে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে স্নায়ুকোষের বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে কোনো কেন্দ্রীয় স্নায়ুকোষ কোনো কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, সেটির আর পুনর্জন্ম হয় না এবং সেটি পুনরুদ্ধার করা আর সম্ভবপর হয় না।

ভ্রূণাবস্থায় মানবমস্তিষ্ক ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও জটিলতর আকার ধারণ করে। ভ্রূণাবস্থায় মস্তিষ্কের ক্রমবৃদ্ধি একটি মূল্যবান গবেষণার বিষয়। এটা মস্তিষ্কের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কেও অনেক আলোকপাত করে। মানবমস্তিষ্কের সঠিক প্রতিকৃতি বা নকশা নিরূপণ করতে হলে ভ্রূণাবস্থায় এর ক্রমবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি আরোও উদঘাটন করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান জ্ঞান মৌলিক ও তা কেবল বাইরের পরিবর্তন ও কোষস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাবে এক্ষেত্রে জ্ঞান আণবিক বা প্রাণরাসায়নিক স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয় নি।

পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজন ও এর সাথে দেহের সাম্যাবস্থা রক্ষা করার কাজে মস্তিষ্কের দায়িত্ব সর্বাধিক। পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অথবা একে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনক্ষেত্রে অধিক থেকে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রাণীর যে প্রচেষ্টা, এতে মস্তিষ্ক প্রধান ভূমিকা পালন করেছে ও করছে।

চেতনশক্তি : চেতনশক্তি আপাতদৃষ্টিতে অবিচ্ছিন্ন বা একক বলে মনে হলেও এর মধ্যে অন্তর্নিহিত স্তরভেদ রয়েছে। মানসিক শক্তির যে স্তরসমূহ বিবর্তনের মাধ্যমে ধাপেধাপে বাস্তবায়িত হয়েছে, তারা বিশেষ বিশেষ অবস্থানে চেতনাবৃদ্ধির কতিপয় অগ্রবর্তী বা অধিক সম্ভাবনার স্তর। মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর্যুপরি স্তরবিন্যাস বা মাত্রাভেদ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ গাণিতিক সূত্রে এখনও আবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নি। তবে স্তরবিন্যাস ও মাত্রাভেদ যে রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আচরণিক দিক থেকে যে সকল সহজ স্তরভাগ করা হয়েছে [যথা—প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া (primary reflex action), সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (conditioned reflex), সহজাত প্রবৃত্তি (inborn instinct), প্রেষণা (motivation), উপলব্ধি (perception), অবচেতন স্তর (subconscious level), চেতন স্তর (conscious level) ইত্যাদি], তা কোনো সাধারণ সূত্রের নির্দেশ দেয় না। অপরপক্ষে এটাও বলা যায় যে, চেতনশক্তি পরিমাপ করার মতো উপযুক্ত কোনো মাপকাঠি এখনও বিজ্ঞানের হস্তগত হয় নি।

যে বিশেষ প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সংযোগে আমাদের নিজস্ব বাসস্থান এই পৃথিবীগ্রহে জীবন ও কালক্রমে চেতনশীল মানব অস্তিত্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে, বিশ্বব্রহ্মান্ডে এরূপ অন্য বহুস্থানে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়। বরং এটিই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সম্ভবপর যে বিশ্বব্রহ্মান্ডে অন্য বহুস্থানেই চেতনশীল ও প্রাণবান জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। ইন্দ্রিয়াদির সংবেদনশীলতার তারতম্যের জন্য তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধি মানুষ অপেক্ষা কিছুটা অন্যপ্রকার হলেও, তাদের বিমূর্ত (abstract) যুক্তি ও চেতনশক্তি মানুষ অপেক্ষা সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার না হবারই কথা। মানুষের সমতুল্য বা তার অপেক্ষা অধিক চেতনশীল যে জৈবিক অস্তিত্বই থাকুক না কেন, মানবমস্তিষ্কের সমতুল্য গুণাগুণবিশিষ্ট একটি জটিল মস্তিষ্কের অধিকারী তাকে হতেই হবে। বিগত দশ হাজার বছরের সংক্ষিপ্ত মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বহির্জগতের কোনো চেতনশীল প্রজাতির সাথে মানুষের সাক্ষাৎ যোগাযোগ সম্ভবপর হয় নি বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এরূপ যোগাযোগ যে হতে পারে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উন্নত চেতনা ও মানসিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ। মানুষের নিকটবর্তী অন্যান্য প্রাণীর চেতনা ও ব্যক্তি-অনির্ভরশীল যোগাযোগের ক্ষমতা এত অনুন্নত যে ওদের কারও সাথে ব্যাপক পারস্পরিক যোগসাধন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। পৃথিবীতে অন্য কোনো প্রজাতি ব্যাপক শব্দভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে না, অথচ তা ব্যতীত অন্য কোনো প্রগাঢ় মানসিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও আমাদের অজ্ঞাত। পোষা জীবজন্তুর সাথে যে সামান্য ভাব আদান-প্রদান সম্ভব, যোগাযোগের দিক থেকে তা সুষ্ঠু নয় এবং তা অনেকটা নগণ্য।

এতে আর একটি বাস্তব সত্য প্রতিফলিত হয় যে, মানবিক স্তরে চেতনা কেবল বর্ধিত আকারই ধারণ করে নি, বরং তা নূতনতর শৃঙ্খলা ও গুণাগুণ অর্জন করে একটি নূতন অস্তিত্বরূপ গ্রহণ করেছে। পরিমাণগত পরিবর্তনই ধাপেধাপে ও কালক্রমে মৌলিক বা গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করেছে। বস্তুঅস্তিত্বে পরিবর্তনের এই বিশ্বজনীন রীতি মানবচেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানব-অস্তিত্বে চেতনা এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, তা আপন অস্তিত্বেরও নিয়ন্ত্রিত বা সুপরিকল্পিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম। অসংখ্য সংঘাত ও বিপর্যয়গ্রস্থ ছিন্নমূল মানবজাতি হয়তো কোনোদিন আরও পরিপূর্ণ, উন্নত ও অধিকতর সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সন্ধান পাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক উপাদান

স্নায়ুকোষ বা নিউরন : স্নায়ুকোষ বা নিউরন (neuron) কাঠামোগত দিক থেকে উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক একক। অন্যান্য দেহকোষের মতো স্নায়ুকোষেরও সাইটোপ্লাজম ও একটি নিউক্লিয়াস রয়েছে, কিন্তু স্নায়বিক সাইটোপ্লাজম স্নায়ুকোষের মধ্যে বিচিত্ররূপে বিস্তৃত। স্নায়ুকোষের একপ্রান্ত থেকে একটি সূক্ষ্ম তন্তু বের হয়ে অল্প বা বেশ কিছু দূর বিস্তৃত হয়। এই লম্বা তন্তুটি এক্সন (axon) বা স্নায়ুতন্তু। স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়বিক উত্তেজনার প্রবাহ এক্সনটি দ্বারা অন্যত্র সঞ্চালিত হয়। এক্সনটি সূক্ষ্ম আবরণবিশিষ্ট একটি সরু নলের মতো। এক্সনের গাত্রাবরণীটি নিষ্ক্রিয় আবরণ নয়। স্নায়বিক উত্তেজনা সঞ্চালিত হবার কাজে গাত্রাবরণীটি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে (চিত্র ৪.১ 'ক' দ্র:)।

অধিকাংশ স্নায়ুতন্তুই মায়েলীন (myelin) নামক এক প্রকার চর্বিজাতীয় পদার্থের আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে। নলাকার মায়েলীন আচ্ছাদনে কিছু পর পর কতকগুলি বিরতি বা ছেদস্থান আছে। ছেদস্থান এক মিলিমিটারের মতো এবং একে র‍্যানভীয়ারের নোড (Node of Ranvier) বলা হয়। একটি স্নায়ুতন্তু বেশ কয়েক ফিট লম্বা হতে পারে। সংবেদী স্নায়ুর এক্সন পায়ের নখাগ্র থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারে।

মায়েলীনবিহীন স্নায়ুতন্তুগুলি সাধারণত ক্ষুদ্র। এদের মধ্যে উত্তেজনা প্রবাহের বেগ কম। চর্বিজাতীয় মায়েলীন স্নায়ুতন্তুগুলির জন্য অনেকটা ইন্সুলেটার বা বিদ্যুৎ অপরিবাহী পর্দার (যথা—বিদ্যুতিক তারের রবার বা প্লাস্টিক জাতীয় আচ্ছাদন) মতো কাজ করে। তন্তুর মধ্যে উত্তেজনাশক্তি রক্ষা করে এর তেজমাত্রা সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের কাজে মায়েলীন সাহায্য করে।

এক্সনের বিপরীত দিকে স্নায়ুকোষের মূলদেহ থেকে আরোও অনেকগুলি সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা নির্গত হয়ে নিকটবর্তী স্থানে বিস্তৃত হয়। এদেরকে ডেনড্রাইট (dendrite) বলা হয়। ডেনড্রাইটের কোনো মায়েলীন আচ্ছাদন নেই। এদের মাধ্যমে নিকটবর্তী অন্যান্য স্নায়ুকোষ থেকে উত্তেজনা স্নায়ুকোষটিতে সঞ্চালিত হয়। বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ডেনড্রাইটের মাধ্যমে একটি স্নায়ুকোষ অপর অনেকগুলি স্নায়ুকোষের মূলদেহ বা এক্সনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। এক্সন ও ডেনড্রাইটগুলির বৈচিত্র্যময় গঠন, নানা প্রকার ও নানা শ্রেণীর স্নায়ুকোষ গঠন করে। গঠনের এই বিভিন্নতা বিভিন্ন স্নায়ুকোষের কার্যপ্রণালি কতকাংশে প্রতিফলন করে (চিত্র ৪.১ 'খ' দ্র:)।

একক স্নায়ুকোষগুলি একের পর এক সংস্থাপিত হয়ে দীর্ঘ স্নায়ুপথ গঠন করতে পারে। কিন্তু একটি স্নায়ুকোষের সাথে অন্য একটি স্নায়ুকোষের মুখোমুখি অবস্থান একটি কার্যগত

সংযোগ মাত্র। সংযোগস্থলে এরা একীভূত হয় না ; একটি স্নায়ুকোষের একসন অন্য স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইট বা মূলদেহের নিকটবর্তী স্থানে এসে অপর পক্ষের সাথে স্বতন্ত্র ও বিভিন্নভাবে যুক্ত হয় মাত্র। দুটি স্নায়ুকোষের সংযোগস্থলে যে সূক্ষ্ম বিরতিস্থান রয়েছে তাকে সিনাপ্‌স্ (synapse) বলে। স্নায়বিক উত্তেজনার সংকেতপ্রবাহ বিশেষ উপায়ে সিনাপ্‌স্ অতিক্রম করতে পারে।

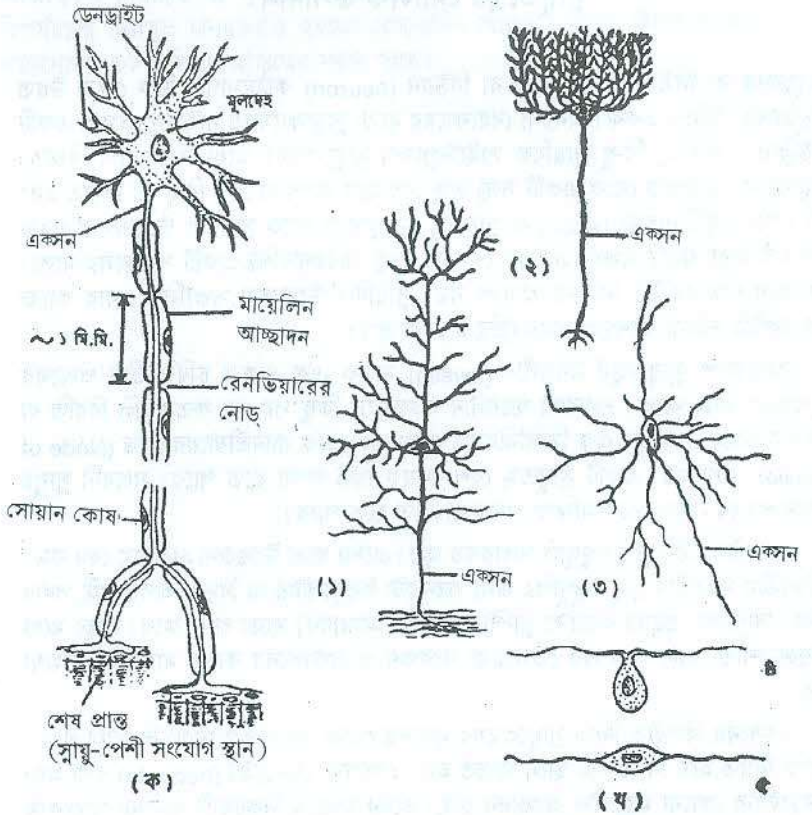

চিত্র ৪.১ : স্নায়ুকোষ বা নিউরনের মৌলিক গঠন : (ক) একটি অন্তিম মোটর নিউরন, (খ) মস্তিষ্কে ও স্নায়ুতন্ত্রে অবস্থিত বিভিন্ন আকৃতির নিউরন (১–৫)।

দেহের অধিকাংশ স্নায়ুকোষই মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্কের নিরাপদ আশ্রয়ে স্থান লাভ করেছে। ওদের দীর্ঘ স্নায়ুতন্তুগুলি সম্মিলিতভাবে স্নায়ুরজ্জু গঠন করে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে যায়। সেই কারণে কোনো ব্যক্তির দুটি হাত ও দুটি পা সম্পূর্ণ কাটা পড়লেও তার স্নায়ুকোষগুলির মূলদেহের তেমন কোনো অপচয় হয় না; যা কাটা পড়ে, তা স্নায়ুতন্তুগুলির প্রান্তভাগ মাত্র।

দেহের স্নায়ুগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। যে সকল স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে ইন্দ্রিয়যন্ত্র ও দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্থান থেকে সংবেদী-বার্তা মেরুরজ্জু বা মস্তিষ্কের দিকে যায়, সে সবকে অন্তর্বাহী (afferent) স্নায়ু বলা হয়। যে সকল স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে মেরুরজ্জু বা মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় নির্দেশবাহী বার্তা দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি, দেহযন্ত্র বা পেশীর নিকটে প্রেরিত হয়, সে সবকে বহির্বাহী (efferent) স্নায়ু বলা হয়। মস্তিষ্কে ও মেরুরজ্জুতে এমন অসংখ্য স্নায়ুকোষ রয়েছে, যাদের স্নায়ুতন্তু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সীমানা (অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর সীমানা) অতিক্রম করে না। এসব স্নায়ুকোষ মধ্যবর্তী শ্রেণীর।

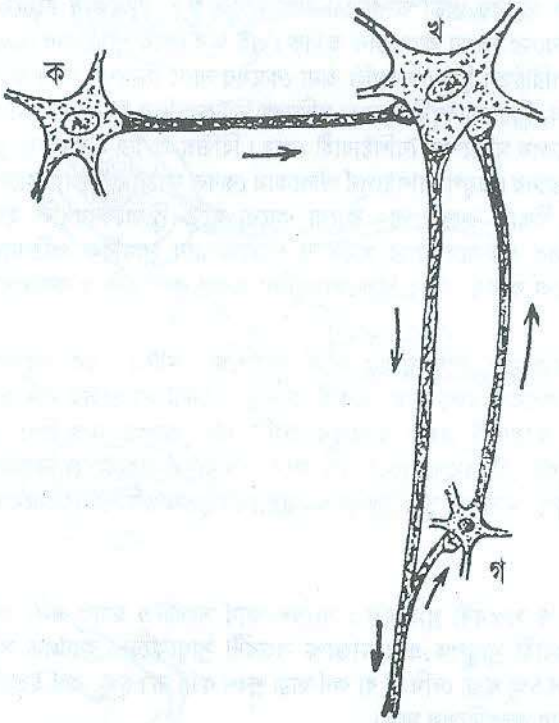

চিত্র ৪.২ : স্বনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুকোষের সংস্থাপন ব্যবস্থা।

স্নায়ুকোষসমূহ একে অন্যের উত্তেজনা বৃদ্ধি বা উত্তেজনা অপনোদন করতে পারে। কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে একটি স্নায়ুকোষ নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম। চিত্র ৪.২-এ তেমন একটি স্বনিয়ন্ত্রিত স্নায়ুকোষের সংস্থাপন ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে। উদাহরণটিতে 'ক' স্নায়ুকোষটি 'খ' স্নায়ুকে সচরাচর উত্তেজিত করে। স্নায়ুকোষ 'খ'-এর দীর্ঘ একসন একটি শাখা বিস্তার করে অন্য একটি স্নায়ুকোষ 'গ'-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। 'গ'-এর একসন আবার 'খ'-এর মূলদেহের সাথে সংযোগ স্থাপন করে একটি চক্রাকৃতি যোগপথ সৃষ্টি করেছে। 'গ' স্নায়ুকোষটি উত্তেজনা অপনোদনকারী স্নায়ুকোষ। সমস্ত পরিকল্পনাটি এরূপভাবে সক্রিয়

যে 'খ'–এর একসনে সঞ্চালিত উত্তেজনার মাত্রা কম হলে 'গ' স্নায়ুকোষে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু 'খ'–এর একসনে অতিমাত্রায় উত্তেজনা সঞ্চালিত হলে এর প্রভাবে 'গ' উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন 'গ' এর অপনোদনকারী প্রভাব 'খ'–এর মূলদেহের উত্তেজনার ক্ষেত্রে ব্রেকের মতো কাজ করে। 'গ'–এর উত্তেজনার ফলে তখন 'খ'–এর উত্তেজনার মাত্রা হ্রাস পায়। মোটামুটি ফল এই দাঁড়ায় যে 'খ' নিজের উত্তেজনার মাত্রা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। মেরুরজ্জুতে অবস্থিত রেন্‌শ (Renshaw) স্নায়ুকোষসমূহ উপরিলিখিত উদাহরণে 'গ' স্নায়ুকোষের সমতুল্য।

মস্তিষ্কে নিউরন ছাড়া আর এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষ রয়েছে, যাদের সংখ্যা মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। এই ক্ষুদ্র কোষ গ্লিয়াকোষ (neuroglia বা glia cell) নামে পরিচিত। গ্লিয়াকোষগুলি অন্য কোষের সাথে সিনাপ্‌স্ গঠন করে না। পূর্বে মনে করা হতো যে, গ্লিয়াকোষগুলি হয়তো মস্তিষ্কে নিউরনগুলির কাঠামো রক্ষার কাজেই নিযুক্ত থাকে। গ্লিয়াকোষ মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যবাহী কোষ। বিভিন্ন প্রাণীর মস্তিষ্কের গ্লিয়াকোষ দেখতে প্রায় একই ধরনের। এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবকোষ কেবল কাঠামো রক্ষার কাজে নিযুক্ত, একথা এখন কেউ বিশ্বাস করেন না। কারো কারো মতে গ্লিয়াকোষগুলি হয়তো মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলির রক্ষণাবেক্ষণের সাথে ও পরোক্ষভাবে স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সাথে কোনো বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ। তবে গ্লিয়াকোষগুলির প্রকৃত কার্যাবলি ও কার্যপ্রণালি এখনও প্রায় অজ্ঞাত।

মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষসমূহের গঠন সর্বাপেক্ষা জটিল। এরা বহুদিকে ও বহুস্তরে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করে। একটি ঘনবস্তুর তিনটি সমতলেই যদি জালির পর জালি থাকে এবং কয়েকটি এরূপ ঘনবস্তুর জালি যদি পরপর সংস্থাপিত হয়, তবে এক বহুস্থানাঙ্কবিশিষ্ট যোগাযোগ পথের সৃষ্টি করে। সেরিব্রেল করটেক্স নিউরনগুলির সংস্থাপন অনেকটা এরূপ। মস্তিষ্কে স্নায়বিক যোগাযোগ যে বহুস্থানাঙ্কবিশিষ্ট যোগাযোগ, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রিয় স্থান ও সংবেদী গ্রাহীযন্ত্র : সংবেদনকার্য সংঘটিত হবার জন্য সংবেদী গ্রাহীস্থান, সংবেদী অন্তর্বাহী স্নায়ুপথ এবং মস্তিষ্কে সংবেদী স্নায়ুকেন্দ্রের কার্যগত সমন্বয় প্রয়োজন। আমরা কেবল চক্ষু দ্বারা দেখি না বা কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি না। চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি সংবেদী সংস্থার অংশবিশেষ মাত্র।

দৃষ্টি, শ্রবণ, স্বাদ, ঘ্রাণ ও স্পর্শবোধ—এই পাঁচটি পরিচিত সংবেদনকার্য ব্যতীতও মানবদেহে অন্যান্য বহু সংবেদনকার্য সংঘটিত হয়। অপেক্ষাকৃত অপরিচিতি ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে রয়েছে ব্যথা, বেদনা, চাপ, উত্তাপ, ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতি, দেহের ও হস্তপদাদির স্থানিক অবস্থানজ্ঞান, সময়জ্ঞান, ইত্যাদি আরও কত কি। তবে এদের সবার জন্যে ভিন্নভিন্ন ইন্দ্রিয়যন্ত্র নেই। সব মিলে দেহে দশ/বার প্রকার বিশেষ বিশেষ সংবেদী গ্রাহীযন্ত্র রয়েছে। অনেক সংবেদনকার্য নির্জ্ঞানভাবেই সংঘটিত হয় অথবা সচরাচর তাতে চেতনা নির্লিপ্ত থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র সংবেদনকার্যটি চেতনার স্তরেই সংঘটিত হয় (যথা—সময়ের উপলব্ধি)।

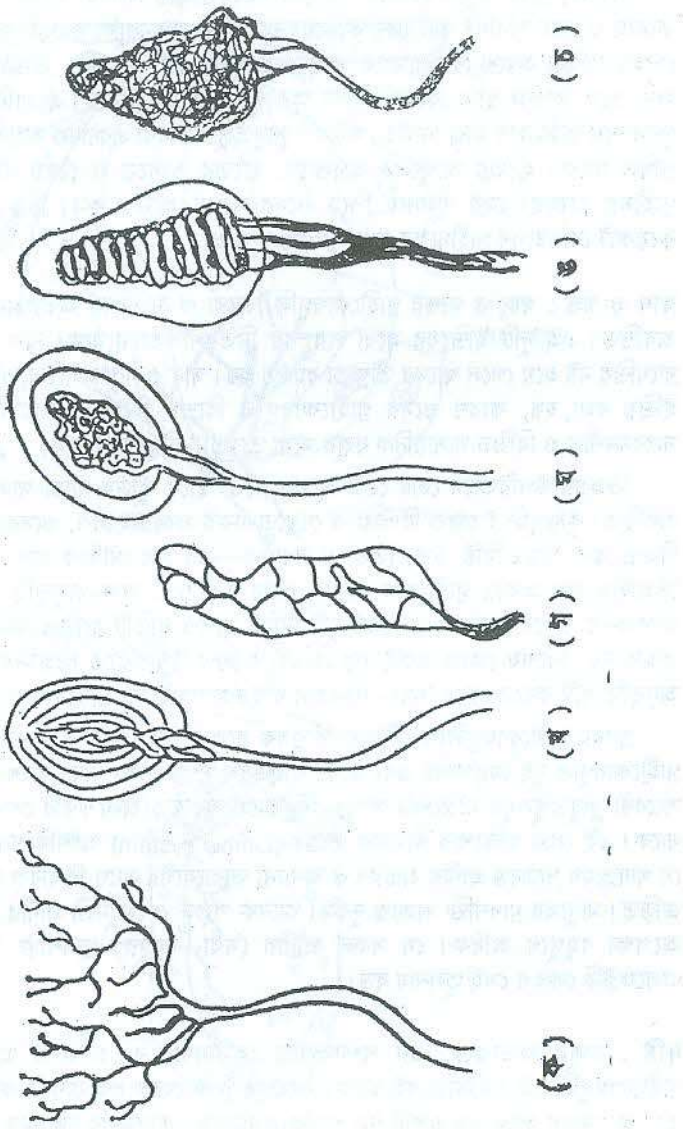

চিত্র ৪.৩ : ত্বকের সংবেদী গ্রাহীযন্ত্রের কয়েকটি নমুনা : (ক) মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত (বেদনা); (খ) প্যাসীনিয়ান কণিকা (চাপ); (গ) চুলের স্নায়ুপ্রান্ত (স্পর্শ); (ঘ) ক্রুজের কণিকা (শীত); (ঙ) মেইস্‌নারস কণিকা (স্পর্শ); (চ) রাফিনিক গ্রাহীযন্ত্র (তাপ)।

সংবেদী গ্রাহীযন্ত্রগুলি কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধ হয়ে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সৃষ্টি করেছে ও দেহে সুনির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে কতকগুলি সংবেদী গ্রাহীযন্ত্র ত্বকের ও দেহের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নভাবে সংস্থাপিত হয়েছে। স্পর্শ, চাপ, উত্তাপবোধ ও ব্যথার জন্য ত্বকে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাহীযন্ত্র রয়েছে। এ গ্রাহীযন্ত্রগুলি বিশেষ গুণসম্পন্ন গ্রাহীকোষ দ্বারা নির্মিত। সংবেদী স্নায়ুতন্তুর এক বা একাধিক অগ্রভাগ ওদের মধ্যে গ্রথিত থাকে। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে, হাতের তালুতে ও ঠোঁটে বহু স্পর্শসংক্রান্ত গ্রাহীযন্ত্র রয়েছে। সেই তুলনায় পিঠে ওদের সংখ্যা অনেক কম। চিত্র ৪.৩–এ ত্বকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রাহীযন্ত্রের নমুনা দেওয়া হয়েছে।

স্বাদ ও গন্ধ : স্বাদ ও গন্ধের গ্রাহীকোষগুলি জিহ্বা ও নাসিকার অভ্যন্তরে (উপরিভাগে) অবস্থিত। এই দুটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা রয়েছে। নাক বন্ধ করলে বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে গেলে স্বাদের তীক্ষ্ণতা ব্যাহত হয়। স্বাদ ও গন্ধের ইন্দ্রিয় দুটিকে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলা হয়, কারণ ওদের গ্রাহীকোষগুলি বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল ও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে তারতম্য নিরূপণে সক্ষম।

জিহ্বার উপরিভাগে ছোট ছোট কূপের মতো স্থানে কুঁড়ির মতো স্বাদগ্রাহী কোষগুলি অবস্থিত। কুঁড়িগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও দেখতে একই প্রকার হলেও, ওদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মিষ্টি, টক, তিক্ত ও লবণাক্ত—এই চার মৌলিক স্বাদ অনুভূতির জন্য ভিন্নভিন্ন চার প্রকার গ্রাহীকোষ রয়েছে (চিত্র ৪.৪ দ্র:); স্বাদ–অনুভূতি ওদের সমন্বিত উত্তেজনার উপরে নির্ভর করে। মোটামুটি নির্দিষ্ট হলেও প্রতিটি ব্যক্তির স্বাদ–অনুভূতি এক প্রকার নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির উপলব্ধিতে ভিন্নভিন্ন প্রকার স্বাদের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে (যথা—ফিনাইল থাইওকার্বামাইডের স্বাদ)।

ঘ্রাণের গ্রাহীকোষগুলিকে মৌলিক বিশ্লেষক রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় নি। ঘ্রাণের গ্রাহীকোষগুলি দুই মেরুবিশিষ্ট এবং এদের বহির্ভাগে সূক্ষ্ম চুলের মতো অংশ রয়েছে। ঘ্রাণের সংবেদী স্নায়ুতন্তুসমূহ মস্তিষ্কের সম্মুখ–নিম্নভাগে অবস্থিত অলফেক্টরি লোব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই লোব মস্তিষ্কের লিম্‌বিক্ তন্ত্রের (Limbic system) অংশবিশেষ। এটি লক্ষণীয় যে খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত প্রাণীর আচরণ ও অন্যান্য ভাবাবেগের সাথে লিম্‌বিক্ তন্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মানুষের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। অনেক পতঙ্গ ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। যে সকল প্রাণীর (যথা—কুকুর) ঘ্রাণশক্তি অধিক, ওদের অলফেক্টরি লোবও সেই তুলনায় বড়।

দৃষ্টি : চক্ষুর অভ্যন্তরে, এর পশ্চাৎগাত্রে রেটিনাস্তর বা অক্ষিপট অবস্থিত। দৃষ্টির গ্রাহীকোষগুলি এই রেটিনাস্তরেই থাকে। কার্যগত দিক থেকে চক্ষু একটি ক্যামেরার মতো, তবে ক্যামেরার সাথে এর একটি বড় পার্থক্যও রয়েছে। ক্যামেরায় ফিল্মের উপর আলোক সম্পাতের ব্যবস্থা আছে, তদুপরি লেন্সটিকে সামনে বা পেছনে আনা যেতে পারে। চক্ষুতে লেন্সটিকে সামনে বা পেছনে আনা যায় না। তবে লেন্সটির অন্তর্নিহিত বক্রতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে অক্ষিপটে আলোকরশ্মি ফোকাস্ করা যায়। ক্যামেরার মতো চক্ষুতেও আলোক–সম্পাত–সীমানা বাড়ানো বা কমানোও যেতে পারে।

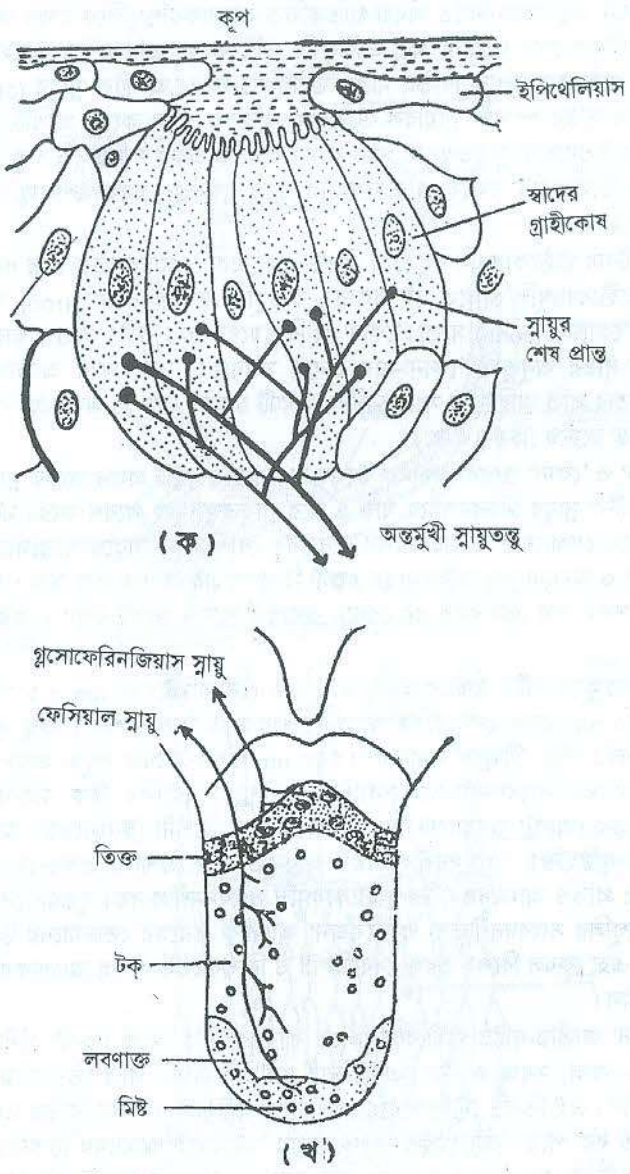

চিত্র ৪.৪ : (ক) স্বাদকুঁড়ির গঠন ও স্নায়বিক সংযোগ; (খ) জিহ্বার গায়ে স্বাদকুঁড়ির ও তাদের পেপিলীর অবস্থান।

কোনো বস্তু থেকে নির্গত অথবা প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলিকে চক্ষুর লেন্স ফোকাস্ করে রেটিনার পটে বস্তুটির ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে। প্রতিকৃতির আলোকরশ্মিগুলি রেটিনার গ্রাহীকোষগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজিত করে। অপটিক স্নায়ুর (optic nerve) তন্তু বেয়ে দৃষ্টির সংবেদী স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিষ্কে গমন করে। প্রতিটি চক্ষু থেকেই মস্তিষ্কের উভয়দিকে স্নায়ুতন্তুগুলি গমন করে। মস্তিষ্কে একই সময়ে দুটি চক্ষু থেকে আগত স্নায়বিক উত্তেজনার সমন্বয় ও সহযোগের ফলে দৃষ্টবস্তুর ঘনত্ব উপলব্ধি বা ঘনবীক্ষণ সম্ভবপর হয়।

রেটিনার গ্রাহীকোষগুলি বহু স্তরে বিভক্ত এবং এরা দেখতেও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। প্রথম স্তরের গ্রাহীকোষগুলি দেখতে দুই প্রকার ; কতগুলি দেখতে 'রডে'র (rod) মতো আবার কতগুলি 'কোনে'র (cone) মতো। 'কোন' রং বিশ্লেষণের জন্য দায়ী। উজ্জ্বল আলোকে রঙিন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অনুভূতি 'কোন'-এর জন্যই সম্ভবপর। 'রড' ক্ষীণ আলোক ও বস্তুর গতিশীলতার প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল। একটি চক্ষুতে প্রায় ৭০ লক্ষ 'কোন' ও প্রায় ১৩ কোটি 'রড' রয়েছে (চিত্র ৪.৫ দ্র:)।

'রড' ও 'কোন' স্তরের প্রাথমিক উত্তেজনা আরোও দুইটি প্রধান স্তরের স্নায়ুকোষ পার হয়ে অপটিক স্নায়ুর নিউরনসমূহে যায় ও পরে স্নায়ুতন্তুসমূহে প্রবেশ করে। মধ্যবর্তী স্তরে স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ ও সহযোগের জন্য বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়ুকোষ রয়েছে। রেটিনার গ্রাহীকোষ ও অন্যান্য স্নায়ুকোষসমূহের একটি বিশেষত্ব এই যে এরা প্রায় স্বচ্ছ। আলোকরশ্মি রেটিনার সকল স্তর ভেদ করে এর পেছনে অবস্থিত অসচ্ছ স্তরেই বস্তুর প্রতিকৃতি নিক্ষেপ করে।

মানবচক্ষুতে দৃষ্টির গ্রাহীকোষগুলি ৪০০ nm (নেনোমিটার বা nm = ১০$^{-৬}$ মি. মি.) থেকে ৭৬০ nm তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মির প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু দৃষ্টিগ্রাহ্য এই বর্ণালির সর্বত্র দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সমান নয়। ৫৫০ nm তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সবুজ-হলদে আলোকের প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা সর্বাধিক। দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণালির ঠিক বাইরে একদিকে বেগনিপাড়ের (আল্ট্রা ভায়োলেট) ও অন্যদিকে লাল উজানী (ইনফ্রারেড) আলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিইন্দ্রিয় সংবেদনশীল নয়। অধিকতরো শক্তিশালী এক্স-রে ও অন্যান্য বিকিরণের প্রতিও আমাদের দৃষ্টির গ্রাহীকোষগুলি সংবেদনশীল নয়। সুতরাং দেখা যায় যে, গ্রাহীকোষগুলির সংবেদনশীলতা ও উত্তেজনা আলোক তরঙ্গের তেজমানের উপরে নির্ভর করে না ; এরা কেবল বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও বিশেষ তেজসম্পন্ন আলোকরশ্মির প্রতিই সংবেদনশীল।

'কোন' জাতীয় দৃষ্টির গ্রাহীকোষগুলিকে কার্যগত দিক থেকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—লাল, সবুজ ও নীল। এই তিনটি মৌলিক রঙের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহীকোষ সংবেদনশীল। এই তিনটি মৌলিক রঙের সংমিশ্রণে দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণালির বিভিন্ন রঙ আমাদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। আলোকের স্পন্দনমাত্রার তারতম্যই আমাদের চেতনায় বস্তুর রঙ রূপে প্রতিফলিত হয়। রঙের অনুভূতি আমাদের মানসক্রিয়ার ফলেই সৃষ্ট হয়, তবে এর সাথে আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও রঙিন বস্তুর নিজস্ব কিছু গুণাগুণ (যথা : বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোকরশ্মি প্রতিফলন অথবা শোষণ করার ক্ষমতা) সম্পৃক্ত। মানুষের রঙের অনুভূতি আলোকের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্পন্দনমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

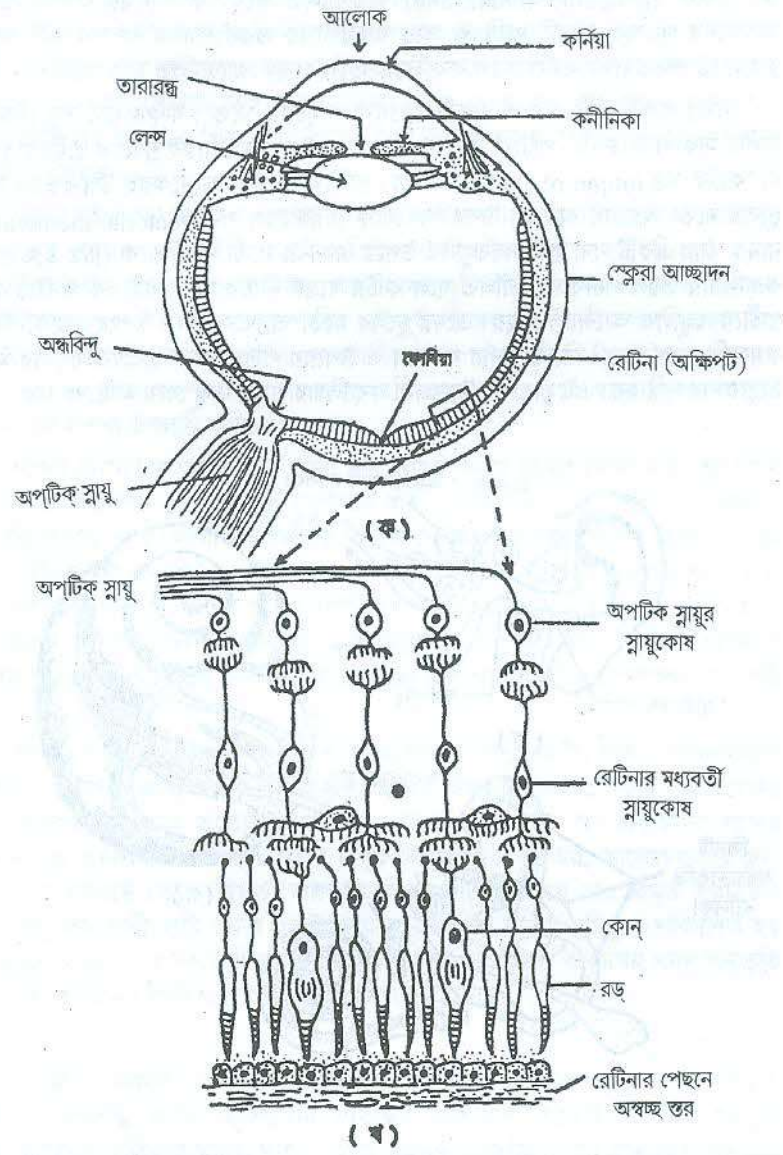

চিত্র ৪.৫ : চক্ষুর গঠন : (ক) চক্ষুর আভ্যন্তরিক গঠন; (খ) রেটিনা বা অক্ষিপটের কোষবিন্যাস।

শ্রবণ : শ্রবণের গ্রাহীকোষগুলি কর্ণের অভ্যন্তরে কক্‌লিয়া অংশে অবস্থিত। শব্দের তরঙ্গ কর্ণপটহকে (tympanic membrane) আন্দোলিত করে। কর্ণপটহের কম্পন প্রথমে মধ্যকর্ণের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তিনটি অস্থি ও পরে অন্তঃকর্ণের তরল পদার্থে কম্পন সৃষ্টি করে। বহিরাগত শব্দতরঙ্গের তালে তালে কক্‌লিয়ার তরল পদার্থ আন্দোলিত হতে থাকে।

সমগ্র কক্‌লিয়াটি দেখতে একটি পেঁচানো শামুকের মতো। কক্‌লিয়ার সরু পেঁচানো নালীর মাঝামাঝি একটি পেচাঁনো দৃঢ় পর্দা রয়েছে। এই পর্দার উপরেই শ্রবণের গ্রাহীকোষগুলি বা 'কর্টির' যন্ত্র (organ of Corti) অবস্থিত। গ্রাহীকোষগুলির অনেকেরই উপরিভাগে সূক্ষ্ম চুলের মতো অগ্রভাগ রয়েছে। উপরদিক থেকে টেক্টরিয়েল পর্দা (tectorial membrane) নামক আর একটি পর্দা গ্রাহীকোষগুলির উপরে ঢাকনির মতো পড়ে থাকে (চিত্র ৪.৬ দ্র:)। কক্‌লিয়ার তরল পদার্থ আন্দোলিত হলে কর্টির যন্ত্রের নীচের দৃঢ় পর্দাটি কেঁপে উঠে এবং গ্রাহীকোষগুলিও আন্দোলিত হয়। এদের চুলের মতো অগ্রভাগ তখন উপরের ঢাকনিটিকে কমবেশি স্পর্শ করে। নিচের পর্দার কম্পনে ও উপরের পর্দার স্পর্শে গ্রাহীকোষগুলির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই স্নায়বিক উত্তেজনা কক্‌লিয়ার স্নায়ুর তন্তু বেয়ে মস্তিষ্কে যায়।

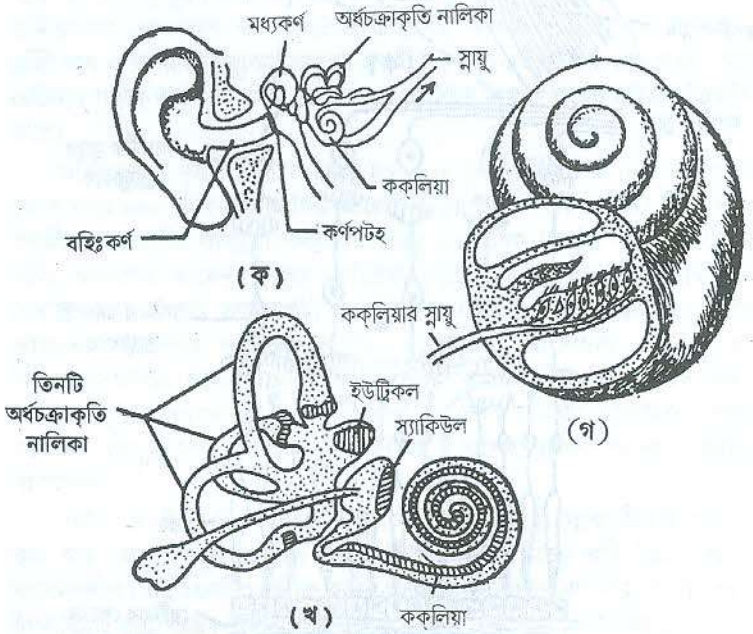

চিত্র ৪.৬ : কর্ণের গঠন : (ক) কর্ণের বিভিন্ন অংশ ও সেসবের অবস্থান; (খ) অন্তঃকর্ণ; (গ) কক্‌লিয়ার ভেতরে সারিবদ্ধ শব্দের গ্রাহীযন্ত্র।

কক্‌লিয়ার প্রশস্ত গোড়ার দিকে অনুচ্চ গ্রাহীকোষগুলি অল্প স্পন্দনমাত্রার শব্দের প্রতি সংবেদনশীল। মাঝামাঝি দিকে নাতিদীর্ঘ গ্রাহীকোষগুলি অধিকতর স্পন্দনমাত্রার শব্দের প্রতি সংবেদনশীল। কক্‌লিয়ার চূড়ার দিকে গ্রাহীকোষগুলির উচ্চতা সর্বাধিক। পিয়ানোর বামদিক থেকে ডানদিকে তারগুলি ক্রমশ যেরূপ ছোট হয়ে যায়, শব্দের গ্রাহীকোষগুলিও বিপরীতভাবে সেরূপ কক্‌লিয়ার গোড়ার দিক থেকে চূড়ার দিকে ক্রমশ বড় হয়ে যায়। কক্‌লিয়ার গ্রাহীকোষগুলির উচ্চতা ও পিয়ানোতে তারের দৈর্ঘ্য উভয়ই শব্দের স্পন্দনমাত্রার তারতম্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

শব্দের দুই প্রকার মানমাত্রা রয়েছে। একটি এর স্পন্দনমাত্রা, অন্যটি চাপমান। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের এই দুইটি গুণের প্রতিই সংবেদনশীল, তবে দৃষ্টিইন্দ্রিয়ের মতো শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা মোটামুটি প্রতি সেকেন্ড ২০ থেকে ২০,০০০ স্পন্দনমাত্রার শব্দ অনুভব করতে পারি। এই দুই সীমানার মধ্যবর্তী স্পন্দনমাত্রার শব্দ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দবর্ণালি। বয়োবৃদ্ধির সাথে শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা অনেক কমে যায়। ৪০/৫০ বছর বয়স্ক ব্যক্তি সাধারণত প্রতি সেকেন্ডে ১০/১২ হাজার স্পন্দনমাত্রার উর্ধ্বে কোনো শব্দ উপলব্ধি করিতে পারে না।

শব্দের চাপমানের তারতম্যের জন্যে শব্দ আস্তে অথবা জোরে শোনা যায়। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সাধারণত 0.0002 μb (মাইক্রো বার) থেকে ৬৩০ μb পর্যন্ত শব্দ স্বচ্ছন্দে উপলব্ধি করতে পারে। সংগীত ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত চাপমানের ডেসিবল (db) মাপে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দকে ১৩০ ভাগে ভাগ করা হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বনিম্ন চাপবিশিষ্ট শব্দ 0 db এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বাপেক্ষা অধিক চাপবিশিষ্ট শব্দ ১৩০ db মানের। ৬৩০ μb বা ১৩০ db মাপের অধিক চাপবিশিষ্ট শব্দ কর্ণে বেদনাদায়ক চাপের সৃষ্টি করে। জেট বা প্রপেলার চালিত শক্তিশালী এরোপ্লেন চলার সময়ে ১৩০ db-এর আরও অধিক চাপসম্পন্ন শব্দ সৃষ্টি করে।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির তুলনায় শ্রবণশক্তি অধিকতর বিশ্লেষণমুখী। শব্দের স্পন্দনমাত্রার তারতম্য যতো প্রকটরূপে ও বিভিন্নরূপে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আলোকের স্পন্দনমাত্রার তারতম্য ততোটা প্রকটরূপে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। প্রবাহমান শব্দের স্পন্দনমাত্রা ও চাপমানের সমন্বয়ে যেরূপ বিমূর্ত সিম্‌ফোনীর সৃষ্টি হয়, আলোকচিত্রের বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে সেরূপ বিমূর্ত 'আলোক-সিম্‌ফোনী' সৃষ্টি হয় না। বিমূর্ত প্রবাহমান 'আলোক-সিম্‌ফোনী' সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সার্থক সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয় নি। এটাও লক্ষণীয় যে সার্থক চিত্রকলা অপেক্ষা সার্থক সুরসঙ্গীত, আমাদের সমগ্র অনুভূতি ও চেতনাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করতে সক্ষম।

অবস্থান জ্ঞান : কক্‌লিয়ার নিকটেই অবস্থিত ইউট্রিকল্ ও স্যাকিউল অংশে দেহের স্থিতি বা অবস্থান উপলব্ধি করার ইন্দ্রিয়স্থান রয়েছে। নিকটবর্তী তিনটি পরস্পর সংযুক্ত অর্ধচক্রাকৃতির নালিকার মধ্যে দেহের গতীয় অবস্থান উপলব্ধি করার ইন্দ্রিয়যন্ত্র বিদ্যমান (চিত্র ৪.৬ 'খ' দ্র:)। ইউট্রিকল্ ও স্যাকিউলের বিভিন্ন অংশে ও অর্ধচক্রাকৃতির নালিকাগুলির গোড়ার দিকে অবস্থান-সংক্রান্ত গ্রাহীকোষ রয়েছে। এদের অনেকেরই অগ্রভাগে চুলের মতো

অংশ রয়েছে। মাথা বা দেহ কোনো দিকে কাত হলে অথবা ঝুঁকে পড়লে ইউট্রিকল্ ও স্যাকিউলের গ্রাহীকোষগুলিতে বিশেষপ্রকার চাপজনিত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ওদের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিরও প্রভাব বিস্তৃত হয়। অস্বাভাবিক অবস্থানে উত্তেজিত হলে এরা মস্তিষ্কে স্নায়বিক বার্তা প্রেরণ করে। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (reflex action) মাধ্যমে মস্তিষ্ক তখন দেহের পেশীগুলিকে সক্রিয় করে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে বা দেহকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

অর্ধচক্রাকৃতি নালিকাগুলির গ্রাহীকোষগুলি দেহের গতির হঠাৎ মাত্রা বা দিক পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। দেহের চক্রাকার গতিও এদেরকে বিশেষরূপে উত্তেজিত করে। অর্ধচক্রাকৃতির নালিকা তিনটির বিশেষত্ব এই যে, এরা একে অন্যের সাথে সমকোণে, তিনটি বিভিন্ন সমতলে অবস্থিত। দেহ কোনো দিকে চলতে থাকলে বা চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হলে নালিকাগুলির অন্তস্থ তরল পদার্থে সেই গতি সঞ্চারিত হয়। হঠাৎ গতির মাত্রা বা দিক পরিবর্তন হলে, নালিকার অন্তস্থ তরল পদার্থে জরতাজনিত (inertial) টান পড়ে। এই টানের ফলেই নালিকাগুলির গোড়ার দিকে অবস্থিত গ্রাহীকোষগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠে। বিভিন্ন সমতলে গতি, বিভিন্ন অর্ধচক্রাকার নালিকার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে এবং এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন সমতল সম্বন্ধে মস্তিষ্ক সচেতন হতে পারে। হঠাৎ উপর থেকে নীচে যা নীচ থেকে উপরে স্থানান্তরিত হলে অথবা দেহ চক্রাকারে ঘুরলে পরক্ষণে মাথা ঘোরার যে অস্বস্তিকর অনুভূতি সৃষ্টি হয়, ওর প্রাথমিক উৎস অর্ধচক্রাকৃতির নালিকা তিনটির গ্রাহীকোষগুলি।

ইন্দ্রিয়গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য : ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি সংবেদী স্নায়ুতন্তুর প্রান্তদেশে অবস্থিত। এরা পারিপার্শ্বিকতার সাথে দেহের সংযোগ রক্ষার কাজে নিযুক্ত। পারিপার্শ্বিকতার কোনো একটি শক্তি ইন্দ্রিয়যন্ত্রে স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির সাধারণ গুণ এই যে, এরা শক্তি হস্তান্তর করায় সক্ষম। এরা বহির্জগতের বিভিন্ন প্রকার শক্তিকে (যথা : আলোক, শব্দ, তাপ, যান্ত্রিকচাপ, রাসায়নিক গুণ, ইত্যাদি) তাড়িত-রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই তাড়িত-রাসায়নিক শক্তি স্নায়বিক সংকেতরূপে স্নায়ুতন্তুর মধ্যে সঞ্চালিত হয়। ইন্দ্রিয়যন্ত্রের গ্রাহীকোষগুলিকে কার্যগত দিক থেকে শক্তি হস্তান্তরকারী যন্ত্র বা ট্রেন্সডিউসার বলা যায়। ফটোসেল, মাইক্রোফোন, গ্রামোফোনের ফিজো-ইলিট্রিক বা চৌম্বক পিক্-আপ্, pH ইলেকট্রোড, ইত্যাদি ট্রেন্সডিউসার যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে এরা এক জাতীয় শক্তিকে অন্য জাতীয় শক্তিতে রূপান্তর বা হস্তান্তর করায় সক্ষম। এরূপ ক্ষেত্রে বহিরাগত শক্তিটির সম্পূর্ণ অংশ সচরাচর রূপান্তরিত বা হস্তান্তরিত হয় না। বরং বহিরাগত শক্তিটির প্রভাবে ট্রেন্সডিউসারের মধ্যে এরূপ কোনো পরিবর্তন বা তারতম্যের সৃষ্টি হয় যা হস্তান্তরিত বা প্রতিফলিত শক্তিরূপে ট্রেন্সডিউসার থেকে নির্গত হয়।

দেহের সংবেদী ট্রেন্সডিউসারগুলির সক্ষমতা আমাদের চেতনাশক্তির ক্ষমতাকে বহুলাংশে নির্ধারণ করে। ট্রেন্সডিউসারগুলির স্বাভাবিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে আমাদের স্বাভাবিক বোধশক্তিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমনকি অনেক নিম্নস্তরের প্রাণীর কোনো কোনো ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের চেয়ে অধিক। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি, ঈগল পাখি ও বিড়ালের

দৃষ্টিশক্তি, বাদুরের শ্রবণশক্তি, আমাদের সমতুল্য ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে এবং যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির পরোক্ষ ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণতা বহুগুণে বেড়ে, প্রকৃতপক্ষে অন্য সকল পরিচিত প্রাণীর বোধের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির জন্মগত ও মৌলিক ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, স্পেক্ট্রোফটোমিটার, pH মিটার, পোলারিমিটার, ইত্যাদি বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, প্রকৃতপক্ষে আমাদের মৌলিক ইন্দ্রিয়গুলির প্রসারণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। যে সকল বস্তুগুণ বা শক্তির প্রতি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জন্মগতভাবে সংবেদনশীল নয় (যথা—চুম্বক শক্তি, দূরগামী রেডিও বা তাড়িত-চৌম্বিক শক্তি, এক্স-রে, ইত্যাদি) তাদের প্রতিও আমরা যন্ত্রের সাহায্যে পরোক্ষ সংবেদনশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ইন্দ্রিয়শক্তি প্রসারণকারী যন্ত্রগুলির সাহায্যে বস্তুজগৎ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় সম্ভবপর হয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই পরিচয়ের কাজ এখনও শেষ হয় নি, কোনোদিন শেষ হবেও না। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমাগত ক্ষমতাবৃদ্ধি, আমাদের সামগ্রিক চেতনশক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধির সহায়তা করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

মেরুরজ্জু ও স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্র

মেরুরজ্জু : মেরুরজ্জু বা স্পাইনেল কর্ড কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সর্বনিম্ন বিভাগ। দেহের বহু প্রক্রিয়া মেরুরজ্জু দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মেরুরজ্জুর কাজ নির্জ্ঞানরূপে সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে মেরুরজ্জুর সকল কাজেই মস্তিষ্ক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সর্বাধিনায়ক মস্তিষ্কের অধীনে মেরুরজ্জু একটি নির্জ্ঞান কার্যনির্বাহী সংস্থা।

মেরুরজ্জুর মধ্যবর্তীস্থানে যে ধূসরাংশ রয়েছে, সেখানে বহু স্নায়ুকোষের মূলদেহ অবস্থিত। আড়াআড়িভাবে মেরুরজ্জুটি কাটলে ওর মধ্যে ধূসরাংশটি দেখতে একটি প্রজাপতির মতো দেখায়। ওর দুটি পুরোশাখা ও দুটি পশ্চাৎশাখা রয়েছে। ধূসরাংশটিকে বেষ্টন করে চতুর্দিকে মেরুরজ্জুর শুভ্রাংশ রয়েছে। শুভ্রাংশে কেবল স্নায়ুতন্তুই অবস্থিত। স্নায়ুতন্তুগুলি স্থানে স্থানে দলবদ্ধ বা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে স্তম্ভাকৃতির রূপ লাভ করেছে। শুভ্রাংশের স্নায়ুস্তম্ভ বেয়ে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে মস্তিষ্কে অথবা মস্তিষ্ক থেকে মেরুরজ্জুতে যায়।

মেরুরজ্জুর পুরো ও পশ্চাৎ ভাগ থেকে অনেক স্নায়ু নির্গত হয়। স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ডের কশেরুকা অস্থিখণ্ডের মধ্যবর্তী নালিকাপথে বের হয় ও দেহের বিভিন্ন খণ্ডে বিস্তৃত হয়। সংবেদী স্নায়ু মেরুরজ্জুর পেছনে ও মটর স্নায়ু এর সামনে অবস্থিত। মেরুরজ্জুর বাইরে এসে এরা মিলিত হয় ও মেরুজাত স্নায়ু (spinal nerve) গঠন করে। সর্বমোট ৩১ জোড়া মেরুজাত স্নায়ু আছে। মেরুজাত স্নায়ুসমূহের নামকরণ সংখ্যাভিত্তিক।

প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া : স্নায়ুতন্ত্রের প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া (primary reflex action) মেরুরজ্জুর মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুকোষসমূহ মেরুরজ্জুতে আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান। দেহের বিভিন্ন খণ্ডের জন্য প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন একক সংস্থা মেরুরজ্জুতে উপর থেকে নিচে থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। বিভিন্ন একক সংস্থাগুলির মধ্যে পুনরায় বহু পরিমেলকারী সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী স্নায়ুকোষসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা —

(ক) সংবেদী স্নায়ুকোষ : এদের মূলদেহ ও নিউক্লিয়াস মেরুরজ্জুর কাছে, পেছনের দিকে অবস্থিত পশ্চাৎমূল (posterior root) গ্যাংলিয়ার মধ্যে অবস্থিত। কোষগুলি সাধারণত দ্বিমেরুবিশিষ্ট। এদের স্নায়ুতন্তুর একপ্রান্ত (গ্রাহীপ্রান্ত) চর্মে, পেশীতে বা অস্থিসন্ধিতে স্থিত বিভিন্ন সংবেদী গ্রাহীকোষের সাথে যুক্ত। অন্যপ্রান্ত (মেরুপ্রান্ত) পশ্চাৎমূল বেয়ে মেরুরজ্জুতে প্রবিষ্ট হয় (চিত্র ৫.১ : 'ক' ও 'খ' দ্র:)।

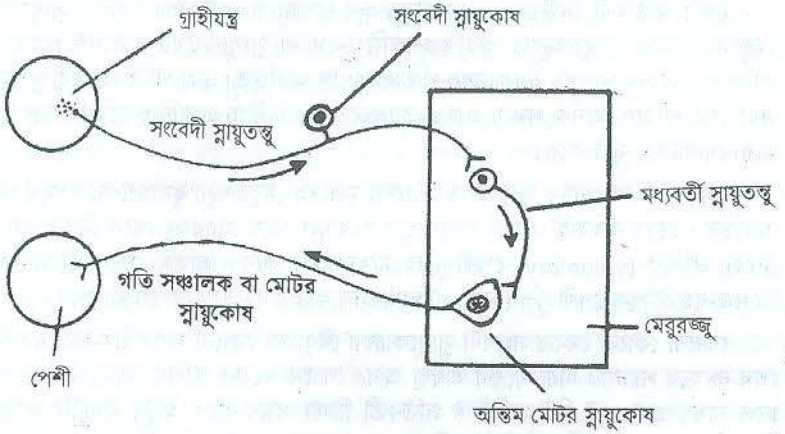

চিত্র ৫.১ : (ক) প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া।

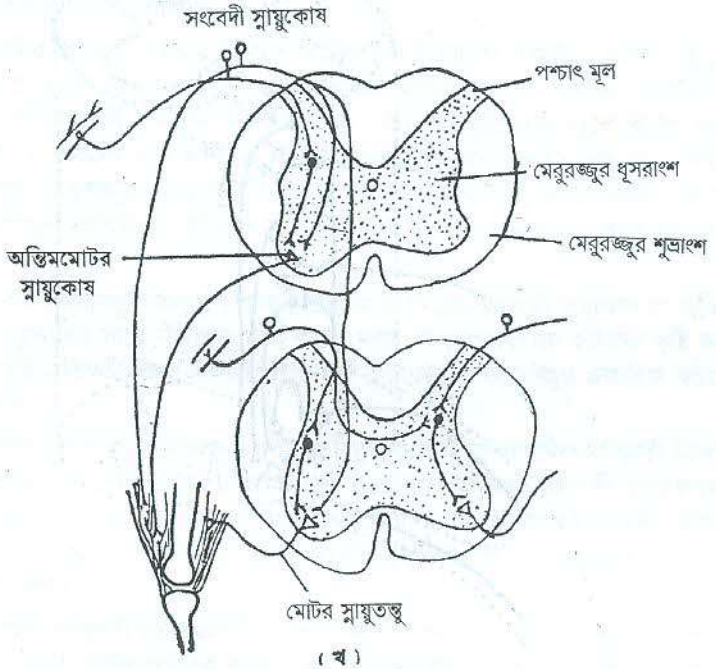

চিত্র ৫.১ (খ) দুই ও তিন নিউরনবিশিষ্ট প্রতিবর্তী ক্রিয়া।

(খ) মধ্যবর্তী নিউরন : এরা মেরুরজ্জুর ধূসরাংশে অবস্থিত। সংবেদী স্নায়ুকোষের মেরুপ্রান্ত থেকে মেরুরজ্জুতে অবস্থিত অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষের মূলদেহ পর্যন্ত এরা পরিব্যাপ্ত। এদের মূলদেহ ধূসরাংশের পশ্চাৎ শাখায় অবস্থিত। এরা পরিমেলকারী স্নায়ুকোষ এবং সেই কারণে অনেক সময়ে এরা মেরুরজ্জুতে উপর-নীচে প্রসারিত হয়ে বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করে।

(গ) অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষ : এদের মূলদেহ মেরুরজ্জুর ধূসরাংশের সম্মুখ শাখায় অবস্থিত। এদের বহির্বাহী একসন মেরুরজ্জুর পুরোমূল বেয়ে মেরুরজ্জু থেকে নির্গত হয় এবং দেহের ঐচ্ছিক (voluntary) পেশীগুলির মধ্যে গমন করে। অন্তিম মোটর নিউরনগুলির উত্তেজনাই ঐচ্ছিক পেশীগুলির মধ্যে গতিসঞ্চালন করে এবং ওসবকে চালনা করে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবেদী স্নায়ুকোষের মেরুপ্রান্ত কোনো মধ্যবর্তী নিউরনের নিকট শেষ না হয়ে সরাসরি নিজ খণ্ডের অথবা অপর কোনো খণ্ডের অন্তিম মোটর নিউরন পর্যন্ত চলে যায়। তখন দুই নিউরনবিশিষ্ট প্রতিবর্তী ক্রিয়া সম্ভব হয়। 'হাঁটুর ঝাঁকুনি' প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি এইরূপ দুই স্নায়ুকোষবিশিষ্ট (চিত্র ৫.১ : 'খ' দ্র:)।

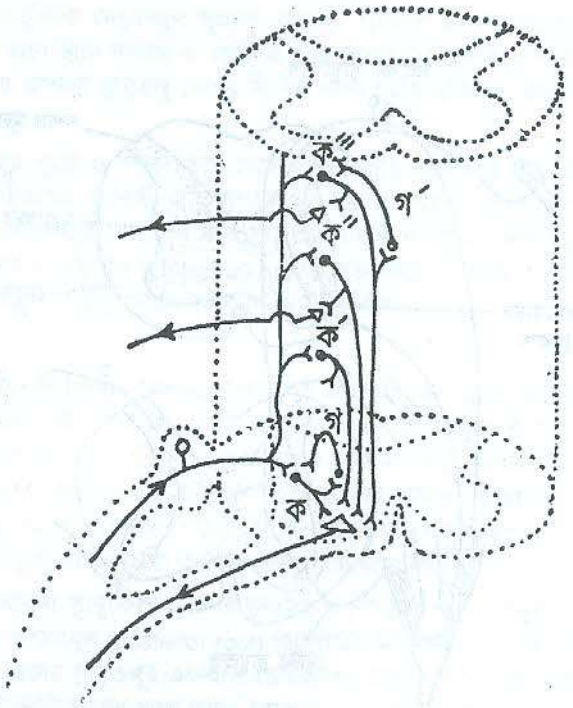

চিত্র ৫.২ : একই প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় মেরুরজ্জুর বিভিন্ন অংশ জড়িত হবার নমুনা।

সহজতম প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় দুটি কিংবা তিনটি স্নায়ুকোষ অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে বহু মধ্যবর্তী নিউরন বিভিন্ন প্রতিবর্তী কার্যে নিযুক্ত নিউরনগুলির মধ্যে এবং মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের পরিমেল সাধন করে। বহুস্তরের পরিমেলের ফলে একাধিক স্থানাঙ্কবিশিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় এবং একক প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলি নানা দিক থেকে প্রভাবান্বিত হয়। মেরুরজ্জুর বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পরিমেলের ফলেই ঐচ্ছিক পেশীগুলির সম্মিলিত ও সুশৃঙ্খলিত সংকোচন বা শৈথিল্য সম্ভবপর হয় (চিত্র ৫.২ দ্র:)।

প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত এবং এর ফলাফল সুনির্দিষ্ট। কোনো প্রজাতির সকল সদস্যের দেহে প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলাফল একরূপ হয়ে থাকে। প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া দেহের পেশীগুলির স্বাভাবিক টোন (tone) রক্ষা করে। স্বাভাবিক টোন সংক্রান্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া সাধারণত মন্থর, চেতনাবহির্ভূত ও মোটামুটি স্থায়ী। এরা দেহের সাম্যাবস্থা রক্ষণের কাজে নিযুক্ত। সক্রিয় সংকোচন, প্রসারণ ও তাল (rhythm) সংক্রান্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া দ্রুত কার্যকরী এবং এরা সাধারণত অস্থায়ী। সহজ প্রতিবর্তী সংকোচন বা প্রসারণ মেরুরজ্জুর কয়েকটি খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। কিন্তু সমন্বিত পদক্ষেপ, গতি নিয়ন্ত্রণ, দিক পরিবর্তন ও জটিল অঙ্গচালন (যথা—সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটা) মেরুরজ্জুর অনেকগুলি খণ্ডের সম্মিলিত কাজ। ওসবের নিয়ন্ত্রণের জন্য মধ্যমস্তিষ্ক ও সেরিব্রেল কর্টেক্সের প্রভাব অত্যাবশ্যকীয়।

প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় কিরূপে জটিলতা সৃষ্টি হয় তা লক্ষণীয়। সংবেদী স্নায়ুটি মেরুরজ্জুতে প্রবেশ করে অনেক ক্ষেত্রেই বহুশাখায় বিভক্ত হয়ে পরে। এদের একটি শাখা কোনো একটি মধ্যবর্তী নিউরনের নিকট শেষ হয়। অন্য শাখাগুলি মেরুরজ্জুতে বিভিন্ন দূরত্ব পর্যন্ত যায় ও অন্যান্য খণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন মধ্যবর্তী নিউরনের নিকট শেষ হয়। কোনো কোনো শাখা মেরুরজ্জুর মধ্যস্থান অতিক্রম করে অপর পাশে যায়। এরূপে একটি সংবেদী স্নায়ু অনেকগুলি মধ্যবর্তী নিউরনের সাথে বিভিন্ন স্তরে সীনাপস্ গঠন করতে সক্ষম হয় (চিত্র ৫.২ দ্র:)।

মধ্যবর্তী নিউরনগুলি অনুরূপে শাখা বিস্তার করে অন্যান্য মধ্যবর্তী স্নায়ুকোষ বা অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষের সাথে সীনাপস্ গঠন করে। ফলে যে যোগাযোগের কাঠামো সৃষ্টি হয়, তাতে একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়া একাধিক মধ্যবর্তী স্নায়ুকোষ ও মেরুরজ্জুর একাধিক খণ্ডকে জড়িত করে।

মস্তিষ্কের অসংখ্য স্নায়ুকোষ স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নস্তরে অবস্থিত প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুকোষসমূহের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। ওদেরকে অসংখ্য মধ্যবর্তী স্নায়ুকোষের সম্মেলনরূপে গণ্য করা যায়। উপরের স্তরের স্নায়ুকোষসমূহের অধিকাংশই সংবেদী গ্রাহীযন্ত্র বা সক্রিয় গতিসঞ্চালক দেহযন্ত্রের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়; এদের যোগাযোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষ।

প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া একটি সহজ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়া মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে অঙ্গচালন একটি জটিল সমন্বিত কাজ। কোনো অঙ্গচালন করতে হলে একদিকে যেমন কতগুলি পেশীকে সংকোচন করতে হয়, ঠিক তখন অন্যদিকে বিপরীত কতকগুলি পেশীকে

সমতালে প্রসারিত করতে হয়। বিপরীত পেশীগুলির প্রসারণের কাজ সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত স্নায়বিক কাজের ফলেই সম্ভবপর। কোনো অঙ্গ চালিত হবার সময় বিপরীতমুখী কাজ দুটির (একাংশের সক্রিয় সংকোচন ও অন্য অংশের সক্রিয় প্রসারণ) মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় অপরিহার্য। মেরুরজ্জুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিপরীতমুখী স্নায়বিক যোগপথ (reciprocal innervation) রয়েছে বলেই মসৃণভাবে অঙ্গচালনা সংঘটিত হতে পারে। বিপরীতমুখী অংশে সমকালীন উত্তেজন (excitation) বা অবনমন (inhibition) স্নায়বিক প্রক্রিয়ার একটি বিশেষত্ব।

মেরুরজ্জুর মধ্যে নিম্নগামী স্নায়ুতন্তুসমূহ বহির্বাহী বা মোটর জাতীয়। এরা অনেকেই কেন্দ্রীয় শাসনের সংকেতমালা মস্তিষ্ক থেকে অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষ পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং এর নিকটে শেষ হয়। মেরুরজ্জুর স্নায়ুকোষগুলোর মাধ্যমেই মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্নায়বিক বার্তা ঐচ্ছিক পেশীসমূহের কাছে প্রেরিত হয়। প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও মস্তিষ্কের সকল নির্দেশাবলি একই অন্তিম স্নায়ুতন্তু বেয়ে ঐচ্ছিক পেশীগুলির উপরে ওদের সম্মিলিত প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবস্থাটি এরূপ যেন শাসনকার্যের জন্যে বিভিন্ন স্তরে একাধিক পরিচালক রয়েছে, কিন্তু অন্তিম কার্যনির্বাহক এক ও অভিন্ন।

পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজন করার ক্ষেত্রে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সমগ্র প্রাণীজগতে একটি প্রধান প্রক্রিয়া। নিম্নস্তরের প্রাণীর প্রায় সামগ্রিক আচরণই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল। তবে সকল প্রতিবর্তী ক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী নিউরনগুলো সহজভাবে অবস্থান করে না। দেহযন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। দেহযন্ত্রগুলির নিয়ন্ত্রণে প্রতিবর্তী ক্রিয়া একটি জটিল আকার ধারণ করেছে। সেখানে সংবেদী ও মোটর অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন পথে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যুক্ত। ওদের মধ্যবর্তী নিউরনগুলিও মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে জটিলভাবে বিস্তৃত থাকে ; ঐচ্ছিক পেশীর প্রতিবর্তী ক্রিয়ার নিউরনগুলির মতো ওরা রীতিবদ্ধভাবে অবস্থান করে না।

মেরুরজ্জুর যে সকল স্নায়ুতন্তু ঊর্ধ্বগামী তারা সংবেদী সংকেতমালা মেরুরজ্জু থেকে বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। ঊর্ধ্বগামী স্নায়ুতন্তুগুলি মেরুরজ্জু অতিক্রম করার পরে, মস্তিষ্কের নিম্নভাগে ওদের পার্শ্ব পরিবর্তন করে। অর্থাৎ সংবেদী স্নায়ুতন্তুগুলো দেহের যে পাশ থেকে উদ্ভূত, মস্তিষ্কে এরা অপর পাশে যায়। অনুরূপে নিম্নগামী মোটর স্নায়ুতন্তুসমূহ মস্তিষ্কের যে পাশ থেকে উদ্ভূত, পাশ পরিবর্তন করে মেরুরজ্জুতে ওরা বিপরীত পাশের অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষসমূহের কাছে শেষ হয়। ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্নায়ুতন্তুগুলি পথে দিক পরিবর্তন করে বলে মস্তিষ্কের বামদিকের অংশ দেহের ডানদিকের ও মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশ দেহের বামদিকের প্রতিনিধিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে মস্তিষ্কের কোনো একপাশ আঘাত পেলে, দেহের অপর পাশ পক্ষাঘাতে (paralysis) পঙ্গু হয়।

স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্র : স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলি দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র, গ্রন্থি, রক্তবাহী ধমনী ও উপধমনীর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের সাথে মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

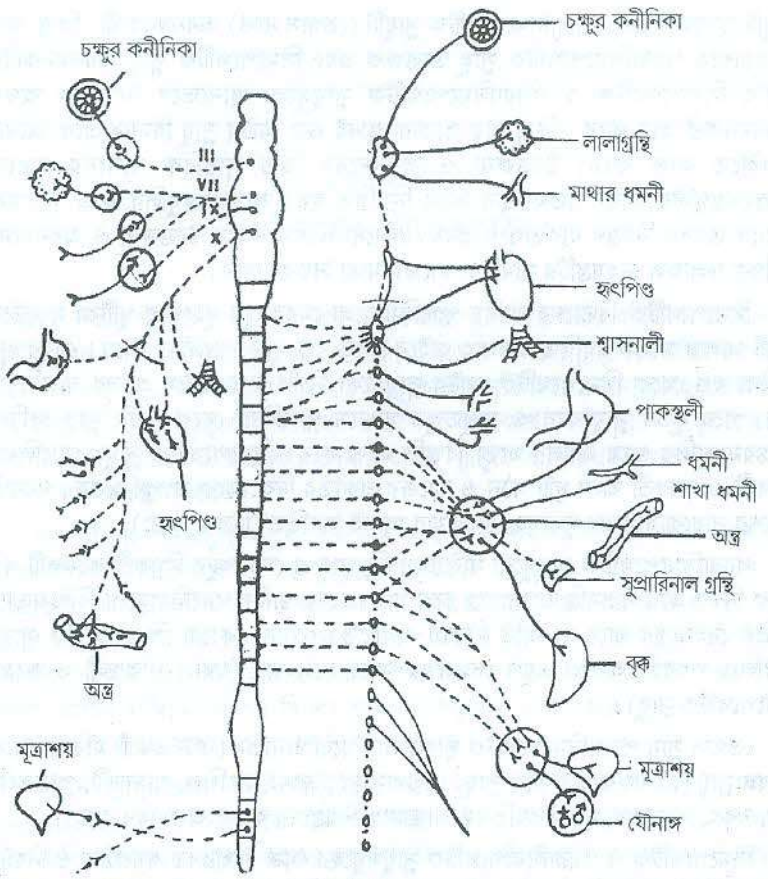

চিত্র ৫.৩: স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্র (মেরুরজ্জুর একদিক মাত্র চিত্রে দ্রষ্টব্য) বামদিকে প্যারাসিমপেথেটিক ও ডানদিকে সিমপেথেটিক স্নায়ুগুলি দেখানো হয়েছে।
---------- গ্যাংলিয়ার পূর্ববর্তী অংশ
———— গ্যাংলিয়ার পরবর্তী অংশ

স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রে দুটি প্রধান বিভাগ—সিমপেথেটিক (sympathetic) ও প্যারাসিমপেথেটিক (parasympathetic)। দেহের আন্তরযন্ত্রগুলি এই উভয় জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত মোটর স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের কোনটি আন্তরযন্ত্রকে উত্তেজিত করে, কোনটি একে অবনমিত করে। কোনো ক্ষেত্রে সিমপেথেটিক স্নায়ু উত্তেজক, অন্য ক্ষেত্রে প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ু উত্তেজক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হৃৎপিণ্ডের সিমপেথেটিক

স্নায়ুটি উত্তেজক এবং প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ুটি (ভেগাস নার্ভ) অবনমনকারী। কিন্তু অন্ত্রে ও মূত্রাশয়ে প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ু উত্তেজক এবং সিমপেথেটিক স্নায়ু অবনমনকারী। অর্থাৎ সিমপেথেটিক ও প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ুগুলো স্থানভেদে উত্তেজক অথবা অবনমনকারী হয়ে থাকে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক স্থানই ওরা মোটর স্নায়ু হিসাবে একে অন্যের বিপরীতে কাজ করে। উত্তেজনা ও অবনমনের দ্বৈত স্নায়বিক শাসনের মাধ্যমে আন্তরযন্ত্রগুলির কাজ গতিময়তার সাথে নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তরযন্ত্রগুলির কাজ গতিময়, সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও গতিময়। কোনো বিশেষ সময়ে উত্তেজনা ও অবনমনের যৌগিক ফলাফল দেহযন্ত্রটির সামগ্রিক কাজের মাত্রা নির্ধারণ করে।

সিমপেথেটিক বিভাগের স্থানীয় গ্যাংলিয়াগুলো মেরুরজ্জুর দুইপাশে গুটিকা সংবলিত দুইটি মালার মতো অবস্থিত। মালার বাইরেও বড় বড় দুটি গ্যাংলিয়া আছে। মেরুরজ্জুর বিভিন্ন খণ্ড থেকে সিমপেথেটিক মোটর স্নায়ুগুলো নির্গত হয়ে প্রথমে এইসব গ্যাংলিয়ায় যায়। পরে নূতন স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে গ্যাংলিয়া থেকে নূতন স্নায়ু বেরিয়ে আন্তরযন্ত্রগুলির গায়ে জালির মতো বিস্তৃতি লাভ করে। সিমপেথেটিক স্নায়ুর গ্যাংলিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অংশ দুটি গঠন ও কাজের প্রকৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরবর্তী অংশের স্নায়ুকোষগুলোর মূলদেহ গ্যাংলিয়ার মধ্যেই অবস্থিত (চিত্র ৫.৩ দ্র:)।

প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের নিম্নভাগ ও মেরুরজ্জুর নিম্নবর্তী কয়েকটি খণ্ড থেকে নির্গত হয়ে সরাসরি আন্তরযন্ত্রে চলে যায়। এদের স্থানীয় গ্যাংলিয়াগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দেহযন্ত্রের গায়ে বা অতি নিকটে অবস্থিত। কোনো কোনো সিমপেথেটিক স্নায়ুর গ্যাংলিয়া–পূর্ববর্তী অংশও এরূপ দেহযন্ত্রের কাছে চলে যায় (যথা : পাকস্থলী ও অন্ত্রের সিমপেথেটিক স্নায়ু)।

ভেগাস স্নায়ু প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ুগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা একটি মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন স্নায়ু (১০ নং করোটিজাত স্নায়ু)। ভেগাস স্নায়ু একাই হৃৎপিণ্ড, শ্বাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক ইত্যাদি বহু আন্তরযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের কাজে অংশগ্রহণ করে।

সিমপেথেটিক ও প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ুসমূহের কাজ সাধারণত স্বয়ংক্রিয় ও নির্জ্ঞান বলেই ওদেরকে স্বায়ত্তশাসিত বলা হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত হলেও এরা মস্তিষ্কের শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। প্রকৃতপক্ষে এই উভয় বিভাগের জন্যই মস্তিষ্কে অনুবদ্ধ স্নায়ুকেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এসব স্নায়ুকেন্দ্র প্রধানত মস্তিষ্কের মেডুলা ও হাইপোথ্যালামাস অংশে অবস্থিত।

সিমপেথেটিক ও প্যারাসিমপেথেটিক স্নায়ুগুলি মোটর জাতীয়। অর্থাৎ এরা বহির্বাহী স্নায়ু এবং এদের মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা কেবল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বাইরের দিকেই নিষ্ক্রান্ত হয়। দেহযন্ত্রগুলো থেকে যে সকল সংবেদী অন্তর্বাহী স্নায়ু মেরুরজ্জু বা মস্তিষ্কে যায়, এরা অন্য সাধারণ সংবেদী স্নায়ুর মতোই এবং ওরা স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন

সেরিব্রেল কর্টেক্স মস্তিষ্কের প্রধান ধূসরাংশ। এটা প্রায় পুরো মস্তিষ্কটির বহির্ভাগ আবৃত করে রয়েছে এবং এখানে অসংখ্য স্নায়ুকোষ রয়েছে। এ ছাড়াও অসংখ্য স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে সংঘবদ্ধ হয়ে কতকগুলো বড় বড় স্নায়ুকেন্দ্রের সৃষ্টি করে। অন্যত্র বহু ছোট ছোট স্নায়ুকেন্দ্র ও বিচ্ছিন্ন স্নায়ুকোষ রয়েছে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যেসব স্থানে স্নায়ুতন্তুগুলোর প্রাধান্য, সেটা মস্তিষ্কের শুভ্রাংশ ; সেখানেও বহু স্নায়ুকোষ স্নায়ুতন্তুগুলোর মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে।

মৃত মস্তিষ্ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করা যায়, কিন্তু স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর কে কি কাজ করছে তা জানা যায় না। মস্তিষ্কের কোন্ অংশ কি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে তা অনুসন্ধান করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অংশ ধ্বংস হলে, যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা হতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশের কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু অনুধাবন করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে প্রাণীর মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ স্থান বা স্নায়ুকেন্দ্র ধ্বংস করে কেন্দ্রগুলোর সঠিক অবস্থান ও কার্যগত বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে নির্ণয় করা যায়।

কোনো স্নায়ুকোষের মূল দেহটি বিনষ্ট হলে, কালক্রমে এর এক্সনটিরও আপজাত্য (degeneration) হয়। অপজাত এক্সনটির সমগ্র গতিপথ তখন অণুবীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়ে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে মস্তিষ্কের বহু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়বিক যোগপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের একের সাথে অন্যের সম্পর্কও বহুলাংশে অবারিত হয়েছে।

বর্তমানে মস্তিষ্কে অনুসন্ধান কাজের জন্য আরোও সঠিক এবং বিশ্বস্ত পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাইরে থেকে সুচের মতো সূক্ষ্ম ইলেকট্রোড মস্তিষ্কের সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিয়ে সেখানে সংস্থাপন করা যায় এবং স্থানটিকে বৈদ্যুতিক উপায়ে উত্তেজিত করা যায়। অনুরূপভাবে বিশেষ স্থানে সুচের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থ বা ওষুধও প্রবেশ করানো যায়। পরীক্ষণীয় প্রাণীর মস্তিষ্কে এরূপ বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রদান বা ওষুধ প্রবেশ করানোর ফলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা থেকে নির্দিষ্ট স্থানটির কার্যাবলী সম্পর্কে বহু তথ্য লাভ করা যায়। স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য স্টেরিওটেক্সীক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর কোন কোনটি স্পষ্ট সংবেদী অথবা মোটর কাজে নিযুক্ত। অন্য বহু কেন্দ্র রয়েছে যারা প্রত্যক্ষ সংবেদী বা মোটর কাজে নিযুক্ত নয়, কিন্তু সংবেদী বা মোটর কাজে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। একটি কেন্দ্র অন্য কেন্দ্রের উপরে উত্তেজক বা অবনমনকারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সব কিছু মিলে মস্তিষ্কে যে জটিল ও বহু

স্থানাঙ্কবিশিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার জটিলতা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু এর একটি সঠিক মডেল বা ছক নির্মাণ সহজ নয়। মস্তিষ্কের সকল অংশ এবং স্নায়ুতন্তুসমূহের মধ্যে জটিল যোগপথের বিশদ বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব ব্যবচ্ছেদ ও অণুবীক্ষণযন্ত্রে বহুকালব্যাপী পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ না করলে অংশগুলির জটিল গঠন ও অবস্থান অনুধাবন করা সম্ভব নয়। নীচে মস্তিষ্কের কতকগুলি প্রধান প্রধান অংশ সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করা হলো।

১. মস্তিষ্ক কাণ্ড বা ব্রেইন-স্টেম (Brain-Stem) : মেডুলা অবলঙ্গাটা, পনস্ ও মধ্যমস্তিষ্ক নিয়ে মস্তিষ্কের এই অংশ গঠিত। মস্তিষ্কের পশ্চাৎ নিম্নভাগে মেডুলা অবস্থিত। মেরুরজ্জুর স্ফীত ঊর্ধ্বতম অংশই মেডুলা ; এর ঠিক উপরে পনস্ এবং এর সম্মুখ উপর দিকে মধ্যমস্তিষ্ক (midbrain) অবস্থিত (চিত্র ৬.১ দ্রঃ)।

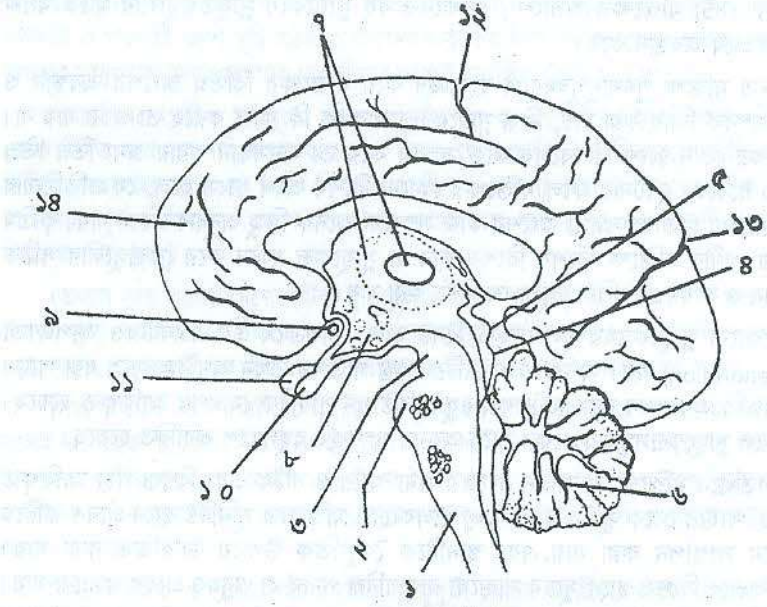

চিত্র ৬.১ : মস্তিষ্কটি মাঝামাঝি দ্বিখণ্ডিত করার পর মস্তিষ্কের ডান অর্ধেক অংশটির চিত্র।
১. মেডুলা, ২. পনস্, ৩. পেডাঙ্কল (মধ্য মস্তিষ্ক), ৪. নীচের কলিকিউলাস (মধ্যমস্তিষ্ক), ৫. উপরের কলিকিউলাস (মধ্যমস্তিষ্ক), ৬. সেরিবেলাম, ৭. থ্যালামাস, ৮. হাইপোথ্যালামাস, ৯. অপটিক স্নায়ুর ক্রুশাকার জংশন, ১০. পিটুটারীর পশ্চাৎভাগ, ১১. পিটুইটারীর পুরোভাগ, ১২. সেরিব্রামের মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজ, ১৩. সেরিব্রামের পশ্চাদস্থ প্রধান ভাঁজ, এবং ১৪. সেরিব্রামের পুরো খণ্ড।

মেডুলায় বেশ কয়েকটি স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত এবং তা থেকে বেশ কয়েকটি করোটিজাত স্নায়ু বের হয়। মুখমণ্ডলী ও মাথার অংশের ত্বক ও পেশী, জিহ্বা, মুখের তালু ও কণ্ঠ এলাকার সংবেদী ও মোটর স্নায়ুগুলো মেডুলা থেকে বের হয়। শ্বসনকাজ ও হৃৎপিণ্ডের কাজ নিয়ন্ত্রণ করার স্নায়ুকেন্দ্রগুলোও মেডুলায় অবস্থিত। মেরুরজ্জুর মতো মেডুলারও পেছনভাগে সংবেদী ও সামনের অংশে মোটর স্নায়ুকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর মধ্যে যে প্রধান ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্নায়ুস্তম্ভগুলো রয়েছে এরা মেডুলার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অতিক্রম করে। নিম্নগামী স্নায়ুস্তম্ভগুলোর অধিকাংশই মেডুলা পার হবার সময় পার্শ্ব পরিবর্তন করে।

পনস্ এর অধিকাংশ স্থান জুড়েই ঊর্ধ্ব ও নিম্নগামী স্নায়ুস্তম্ভগুলি অবস্থিত। ওদের মধ্যে ছোট ছোট স্নায়ুকেন্দ্রও আছে। সে সকল কেন্দ্র থেকে বহু স্নায়ুতন্তু আড়াআড়িভাবে বিপরীত দিকের সেরিবেলামের সাথে পনস্কে সংযুক্ত করে।

মধ্য মস্তিষ্কের পার্শ্ব ও পুরোভাগে (পেডাঙ্গল অংশ) ঊর্ধ্ব ও নিম্নগামী স্নায়ুস্তম্ভগুলি অবস্থিত। এর পশ্চাৎভাগে দুটি উপরের কলিকিউলাস ও দুটি নীচের কলিকিউলাস অবস্থিত। নীচের কলিকিউলাসে শ্রবণের সংবেদী স্নায়ুতন্তুর যোগাযোগ কেন্দ্র অবস্থিত। এখান থেকে স্নায়বিক রিলে (relay) থ্যালামাস ও কর্টেক্সে বিস্তার লাভ করে। উপরের কলিকিউলাসে দৃষ্টির কিছু সহজ যোগাযোগ কেন্দ্র রয়েছে। নিম্নস্তরের প্রাণীর (যথা : ব্যাঙ) মস্তিষ্কে এই অংশেই দৃষ্টির প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র অবস্থিত। মানবমস্তিষ্কে থ্যালামাস ও কর্টেক্সে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন দৃষ্টির কেন্দ্র অবস্থিত। উন্নত প্রাণীর মধ্যমস্তিষ্কে দৃষ্টির কেন্দ্রগুলি প্রায় লুপ্ত। মানুষের ক্ষেত্রে চক্ষু থেকে আসা সংবেদী স্নায়ুতন্তুগুলির অধিকাংশই মধ্যমস্তিষ্ককে পাশ কেটে সরাসরি থ্যালামাস ও কর্টেক্সে চলে যায়।

২. সেরিবেলাম (Cerebellum) : পনস্-এর পশ্চাতে ও উপর দিকে সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক অবস্থিত। সেরিবেলামটি অসংখ্য ভাঁজযুক্ত ও বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত। বাইরে থেকে সম্পূর্ণ মস্তিষ্কটির দিকে তাকালে সেরিব্রেল কর্টেক্সের পরে সেরিবেলামই প্রকটতম অংশ। বিবর্তনের দিক থেকে সেরিবেলামকে দু'অংশে ভাগ করা যায়—একটি পুরনো ও অপরটি নূতন অংশ। সেরিবেলামের বাহিরের স্তর ধূসরাংশ ও ভিতরের স্তর শুভ্রাংশ।

দেহের ঐচ্ছিক পেশীগুলির সংকোচনের মাত্রা, তাল ও স্বাভাবিক টানের উপরে সেরিবেলাম প্রভাব বিস্তার করে। দেহের ভারসাম্য ও ভঙ্গিমা রক্ষা এবং সূক্ষ্ম কাজে পেশীগুলিকে সমন্বিতভাবে নিয়ন্ত্রণের কাজে সেরিবেলাম পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। মেরুরজ্জু থেকে আগত কোনো কোনো ঊর্ধ্বগামী স্নায়ু সেরিবেলামে আগমন করে। কর্টেক্স ও থ্যালামাসের সাথে সেরিবেলামের উভয়মুখী যোগাযোগ রয়েছে। থ্যালামাস ও কর্টেক্সের মাধ্যমেই সেরিবেলাম ঐচ্ছিক পেশীগুলির উপরে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

সেরিবেলাম আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পেশীগুলির স্বাভাবিক টান কমে যায় এবং ওদের কাজে সঙ্গতি লোপ পায়, কিন্তু পেশীগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় না। যার সেরিবেলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাই অত্যন্ত কষ্টকর। চোখ বন্ধ করলে সহজেই সে পিছন দিকে পড়ে যায় এবং হাঁটতে গেলে আঁকাবাঁকা ও অসংযতভাবে অগ্রসর হয়।

পেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ কাজে কর্টেক্স যেন প্রধান কার্যালয় এবং সেরিবেলাম যেন বিশেষ কাজে নিযুক্ত একটি সহকারী উপকার্যালয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহের গতি নির্ধারণের কাজে সেরিবেলামের নূতন অংশই প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৩. ডায়েন্‌কেফালন (Diencephalon) : মস্তিষ্কের মাঝামাঝি নিম্নস্থান জুড়ে এই অংশ অবস্থিত। এর উপরের ভাগ থ্যালামাস ও নিচের ভাগ হাইপোথ্যালামাস নামে পরিচিত। দুই চোখ থেকে আসা অপটিক স্নায়ু দুটির ক্রুশাকৃতি জংশনের পেছনে হাইপোথ্যালামাস অবস্থিত (চিত্র ৬.১ দ্র:)।

থ্যালামাস মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় সংবেদন কাজের একটি প্রধান কেন্দ্র ও রিলে স্টেশন। অনেক মেরুজাত (spinal) ও মেডুলা থেকে উদ্ভূত ঊর্ধ্বগামী স্নায়ুস্তম্ভ থ্যালামাসের পেছনের অংশে এসে শেষ হয়। স্পর্শ, বেদনা, তাপ সংবেদন ও অন্যান্য বহু সংবেদী কাজে নিযুক্ত স্নায়ুতন্তু থ্যালামাসে বাধা পায়। থ্যালামাসের স্নায়ুকেন্দ্রগুলি থেকে নূতন স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে সংবেদী সংকেত কর্টেক্সে যায়। কোনো কোনো সংবেদন (যথা : বেদনা) থ্যালামাস স্তরেই অনুভূতি বা উপলব্ধি লাভ করতে পারে। তবে দৈহিক বেদনার সঠিক উপলব্ধি ও স্থান নির্ধারণ কর্টেক্সের কাজ বলেই মনে করা হয়।

শ্রবণ ও দৃষ্টি সংক্রান্ত সংবেদী স্নায়ুতন্তুগুলিও থ্যালামাসে বাধা পায়। শ্রবণের রিলে-কেন্দ্র মধ্যস্থানীয় জেনিকুলেট ও দৃষ্টির রিলে-কেন্দ্র পার্শ্বস্থানীয় জেনিকুলেট অংশে অবস্থিত। দৃষ্টির অধিকাংশ স্নায়ুতন্তুর জন্য রেটিনার পরে এটাই প্রথম স্নায়বিক রিলে। রেটিনার বিভিন্ন স্থান ও বিন্দুর জন্য পার্শ্বস্থানীয় জেনিকুলেট অংশে রীতিবদ্ধ অভিক্ষেপ রয়েছে। এই রিলে স্টেশনে দৃষ্টির সংবেদী সংকেত বার্তা পরবর্তী স্নায়ুকোষের নিকট হস্তান্তরিত হয়। এখানে থেকে নূতন স্নায়ুতন্তু সরাসরি সেরিব্রেল কর্টেক্সের দৃষ্টি সংক্রান্ত এলাকায় চলে যায়।

হাইপোথ্যালামাস ও এর নিকটবর্তী লিম্‌বিক্ তন্ত্র (limbic system) সহজ আচরণ ও ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগজনিত দেহযন্ত্রগুলির নিয়ন্ত্রণ প্রধানত হাইপোথ্যালামাসের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। আচরণ ও ভাবাবেগ সংক্রান্ত বহু জটিল ও গূঢ় রহস্য হাইপোথ্যালামাসেই সুপ্ত রয়েছে। এই সব রহস্যের একদিকে যেরূপ স্নায়বিক, অন্যদিকে সেরূপ ক্ষেত্র বিশেষে রাসায়নিক প্রক্রিয়াও নিহিত রয়েছে।

দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুধার উদ্রেক ও খাদ্যগ্রহণ, তৃষ্ণা ও জল পান, দেহে জলভাগের ভারসাম্য রক্ষা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি বহু সহজ আচরণ ও ভাবাবেগ মূলত হাইপোথ্যালামাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

হাইপোথ্যালামাসে বিশেষ 'আনন্দদায়ক' অনুভূতির কেন্দ্রও রয়েছে। ইঁদুরের হাইপোথ্যালামাসে বিশেষ বিশেষ স্থানে সূক্ষ্ম ইলেকট্রোড স্থাপন করে স্থানটিকে উত্তেজিত করা যায়। ইঁদুরটিকে তখন এরূপ একটি খাঁচায় (স্কিনার বাক্স) স্থাপন করা যায়, যেখানে একটি হাল্কা রড চাপ দিলেই অল্পক্ষণের জন্য ইলেকট্রোডে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং হাইপোথ্যালামাসের বিশেষ স্থানটি উত্তেজনা লাভ করে। হাইপোথ্যালামাসের 'আনন্দদায়ক' অনুভূতির কেন্দ্রে ইলেকট্রোডটি সংস্থাপিত হলে এরূপ অবস্থারও সৃষ্টি হয় যে সমস্তদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে ইঁদুরটি কেবল বারে বারে রডটি চাপার কাজেই নিযুক্ত থাকে।

অন্যপক্ষে উত্তেজনার স্থানটি বেদনাদায়ক অনুভূতির সৃষ্টি করলে ইঁদুরটি সবসময় রডটিকে বর্জন করে চলে।

হাইপোথ্যালামাসের নীচের দিকে বৃন্তের সাহায্যে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ফলের মতো একটি অঙ্গ রয়েছে। এটাই মহামূল্যবান পিটুইটারী গ্রন্থি। পিটুইটারীর পশ্চাৎ খণ্ডের গঠন স্নায়ুবৎ এবং ঠিক গ্রন্থি জাতীয় নয়। কিন্তু এর সম্মুখ খণ্ড যথার্থই একটি নালীহীন রস-নিঃসরণকারী গ্রন্থি। পিটুইটারীর সম্মুখ খণ্ড থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'হরমোন' বা রস নিঃসৃত হয়ে সরাসরি রক্তের সাথে মিশে যায়। মিশ্রিত রস রক্ত প্রবাহের সাথে দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাসায়নিক যোগাযোগের মাধ্যমে দেহের অন্যান্য নালীহীন রস নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলির (যথা : থাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়ের আইলেট অংশবিশেষ, সুপ্রারিনেল কর্টেক্স, যৌনগ্রন্থি, ইত্যাদির) কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। পিটুইটারীর সম্মুখ খণ্ডের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরমোন দেহের গঠন ও সামগ্রিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। পিটুইটারী গ্রন্থির কার্যকলাপের উপরে হাইপোথ্যালামাসের প্রত্যক্ষ ও প্রবল প্রভাব বিদ্যমান।

৪. ব্যাসাল গ্যাংলিয়া (Basal ganglia) : কডেট্ নিউক্লিয়াস, পুটামেন্ ও প্যালিডাম্, এই তিনটি অংশ সম্মিলিতভাবে ব্যাসাল গ্যাংলিয়া নামে পরিচিত। থ্যালামাসের উপরিভাগে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এরা অবস্থিত। বিবর্তনের দিক থেকে প্যালিডাম্ পুরনো অংশ ; কডেট্ নিউক্লিয়াস ও পুটামেন তুলনামূলকভাবে নূতন অংশ। কডেট্ নিউক্লিয়াস ও পুটামেনের সাথে থ্যালামাস ও কর্টেক্সের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এরা প্রধানত অবনমনকারী প্রভাব বিস্তার করে ঐচ্ছিক পেশীগুলির কাজে অধিকতর নমনীয়তা ও মসৃণতা আনয়ন করে।

মধ্যবয়সে 'পার্কিনসনের অসুখ' নামক বিশেষ একপ্রকার হাত পা কাঁপুনির অসুখ হয়। ব্যাসাল গ্যাংলিয়ার আপজাত্যের কারণে এই অসুখ হয়ে থাকে।

৫. করোটিজাত স্নায়ু (cranial nerves) : মস্তিষ্ক প্রধানত মেরুরজ্জুর মাধ্যমেই দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে স্নায়বিক যোগাযোগ রক্ষা করে। তবে মেরুরজ্জু ব্যতীতও মস্তিষ্কের দুই অর্ধাংশের ১২টি করে স্নায়ু রয়েছে। এদেরকে মস্তিষ্কজাত বা করোটিজাত স্নায়ু বলা হয়।

করোটিজাত স্নায়ুগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর। এদের কোনো কোনোটি সম্পূর্ণ সংবেদী স্নায়ু (যথা : অলফেক্টরি স্নায়ু ও অপটিক স্নায়ু)। কোনো কোনোটি মুখমণ্ডল ও করোটি এলাকার সাধারণ সংবেদী ও মোটর স্নায়ু, যারা মেরুরজ্জুর সাথে যুক্ত না হয়ে সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত। আবার কোনো কোনো করোটিজাত স্নায়ু (যথা : ভেগাস স্নায়ু) দেহযন্ত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ব্রেইন-স্টেমে (বিশেষত এর পশ্চাৎভাগ ও মেডুলা) বেশ কয়টি করোটিজাত স্নায়ুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসসমূহ (nuclei) রয়েছে। এসব নিউক্লিয়াস (সর্বমোট সাতটি) ব্রেইন-স্টেমের পশ্চাৎভাগে লম্বালম্বি কলামের মতো সাজানো। মাঝামাঝি দিকের স্তম্ভগুলো মোটর ও পাশের দিকের কলামগুলো সংবেদী। এসব কলামের ধূসরাংশ স্থানে স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে করোটিজাত স্নায়ুগুলোর নিউক্লিয়াই তৈরি করেছে। করোটিজাত স্নায়ুগুলোর নাম, শ্রেণীবিন্যাস ও কার্যাবলী নিয়ে সংক্ষেপে নিম্নে তালিকা করা হলো।

করোটিজাত স্নায়ুগুলোর তালিকা

	নাম	শ্রেণীভাগ	বিস্তারস্থান/কাজ
(I)	অলফ্যাকটরি (olfactory)	সংবেদী	নাক থেকে মস্তিষ্কে ঘ্রাণের কেন্দ্র (অলফেকটরি লোব) পর্যন্ত; ঘ্রাণের কাজ।
(II)	অপটিক (Optic)	সংবেদী	রেটিনা থেকে মস্তিষ্কে দৃষ্টির কেন্দ্রসমূহ পর্যন্ত; দৃষ্টির সংবেদী কাজ।
(III)	অকুলোমোটর (Oculomotor)	মোটর প্যারাসিমপেথেটিক	অক্ষিগোলকের পেশী ও কণীনিকা।
(IV)	ট্রকলিয়ার (Trochlear)	মোটর	চোখের পেশী।
(V)	ট্রাইজেমিন্যাল (Trigeminal)	সংবেদী ও মোটর	মুখ, দাঁত ও চোখের পেশী।
(VI)	এবডুসেন্ট (Abducent)	মোটর	চোখের পেশী।
(VII)	ফ্যাসিয়াল (Facial)	সংবেদী, মোটর ও প্যারাসিমপেথেটিক	জিহ্বা, স্বাদের গ্রাহীকোষ, লালাগ্রন্থি ও মুখের পেশী।
(VIII)	অডিটরি (Auditory) অপর নাম : ভেস্টিবুলো-ককলিয়ার (Vestibulo-cochlear)	সংবেদী	(ক) ককলিয়ার অংশ : কর্ণের অভ্যন্তরে ককলিয়া অংশে 'কর্টির যন্ত্রে' যেখানে শ্রবণ সংক্রান্ত গ্রাহীকোষগুলি অবস্থিত; শ্রবণের সংবেদী কাজ। (খ) ভেস্টিবুলার অংশ : কর্ণের অভ্যন্তরে ইউট্রিকল, স্যাকীউল ও অর্ধচক্রাকৃতি নালিকাগুলির গোড়ার দিকে অবস্থান-সংক্রান্ত গ্রাহীকোষগুলিতে। কাজ : দেহের স্থিতি ও অবস্থান সংক্রান্ত সংবেদী কাজ।
(IX)	গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glosso-pharyngeal)	সংবেদী, মোটর ও প্যারাসিমপেথেটিক	কণ্ঠদেশ, জিহ্বার পশ্চাৎভাগ ও লালাগ্রন্থি।
(X)	ভ্যাগাস (Vagus)	মোটর ও প্যারাসিমপেথেটিক	বুক ও পেটের প্রায় সব দেহযন্ত্র (যথা : হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, শ্বাসনালী, যকৃৎ, পাকস্থলী, অন্ত্র, ইত্যাদি)।
(XI)	স্পাইনাল এক্সেসরি (Spinal accessory)	মোটর	কাঁধের পেশী
(XII)	হাইপোগ্লোস্যাল (Hypoglossal)	মোটর	জিহ্বার পেশী।

এদের মধ্যে III ও IV নং স্নায়ুর নিউক্লিয়াসসমূহ মধ্যমস্তিষ্কে অবস্থিত; V নং স্নায়ুটির নিউক্লিয়াসসমূহ আংশিক পনস্এ ও অপরাপর অংশ মধ্যমস্তিষ্কে ও মেরুরজ্জুর উপরাংশে অবস্থিত; VI, VII ও VIII নং স্নায়ুগুলোর নিউক্লিয়াসসমূহ পনস্ এর নিম্নাংশে অবস্থিত ; IX, X, XII নং স্নায়ুগুলোর নিউক্লিয়াসসমূহ মেডুলায় অবস্থিত এবং XI নং স্নায়ুটির এক অংশ মেডুলায় ও অপর অংশ মেরুরজ্জুর উপরাংশে অবস্থিত।

[মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা করোটিজাত স্নায়ুগুলোর নাম, কাজ ও ধারাবাহিকতা মনে রাখতে পারে না বলে একটা ছড়া মুখস্থ করে। সেটা হলো : **O**n **O**ld **O**lympus's **T**owering **T**ops, **A** **F**at **A**ngelic **G**irl **V**iews **S**panish **H**ops.]

৬. রেটিকুলার ফর্মেশান (Reticullar formation) : এটি মস্তিষ্কের এক স্থানে বা একটি বিশেষ অংশরূপে অবস্থিত নয়, বরং জালের মতো ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কতগুলো স্নায়ুকেন্দ্রের সমন্বয়বিশেষ। বিবর্তনের দিক থেকে রেটিকুলার ফর্মেশান মস্তিষ্কের অতি পুরনো অংশ এবং নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটি মস্তিষ্কের বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ। মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশটি ব্রেইন-স্টেমের অভ্যন্তরে এখানে ওখানে চিহ্নিত করা যায়। স্থানিক দিক থেকে সুনির্দিষ্ট না হলেও কার্যগত দিক থেকে রেটিকুলার ফর্মেশান মস্তিষ্কের একটি সুনির্দিষ্ট অংশবিশেষ।

এটা দেখা যায় যে, মস্তিষ্কে আগত সব সংবেদী স্নায়ু (যথা : দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত) থেকেই কিছু কিছু সংযোগ পথ রেটিকুলার ফর্মেশান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এসব সংযোগের ফলে, প্রাণীদের সার্বিক জাগরণ বা উত্তেজনামূলক অবস্থাটির উপরে রেটিকুলার ফর্মেশান প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। জাগরণের অবস্থাটিকে রেটিকুলার ফর্মেশান, বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মস্তিষ্কটিকে একটি রঙিন টেলিভিশন যন্ত্রের পর্দার মতো মনে করা হলে, প্রতিবেশ ও দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সরাসরি আগত সংবেদী উত্তেজনাগুলোকে বলা যায় যেন ছবি ও শব্দ সংক্রান্ত মূলবার্তা। সেক্ষেত্রে, রেটিকুলার ফর্মেশানের কাজ যেন ছবির ফোকাস, উজ্জ্বলতা ও রং এর সামঞ্জস্য এবং শব্দের ঘনমান (বা ভলিউম) নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রক বা রেগুলেটরের মতো। প্রাণীদের নিদ্রা, জাগরণ ও সতর্কতা (alertness) ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেরিব্রেল কর্টেক্স ও রেটিকুলার ফর্মেশানের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও দ্বিমুখী সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।

৭. লিম্বিক্ তন্ত্র (Limbic system) : হাইপোথ্যালামাসের কিছুটা উপরে, মস্তিষ্কের নীচের দিকে ও মাঝামাঝি নাভিস্থলে, কতকটা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লিম্বিক্ তন্ত্রটির বিভিন্ন অংশ অবস্থিত। এই তন্ত্রটি সেরিব্রেল কর্টেক্সেরই অংশবিশেষ, তবে বিবর্তনের দিক থেকে এটি কর্টেক্সের সবচেয়ে পুরানো অংশ। আগে অনেকটা ভুলবশত একে রাইনেনকেফ্যালন (rhinencephalon) বা ঘ্রাণবিষয়ক মস্তিষ্ক বলা হতো। মস্তিষ্কে ঘ্রাণের কেন্দ্র বা অলফ্যাক্টরি লোব (Olfactory lobe) এই অংশে অবস্থিত হলেও, অংশটি কিন্তু ঘ্রাণ ছাড়াও প্রাণীদের আচরণের অনেক দিক নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য, আহার গ্রহণ ও যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত আচরণসমূহ লিম্বিক্ তন্ত্রেই প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়াও, আনন্দ, দুঃখ, ভয়, আগ্রাসন,

বন্ধুত্ব, পছন্দ-অপছন্দ, ইত্যাদি ভাবাবেগ সংক্রান্ত শারীরিক ও আচরণগত দিকসমূহ হাইপোথ্যালামাসের সমন্বয়ে লিম্‌বিক্ তন্ত্রের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়। হাইপোথ্যালামাসের কাজগুলো মূলত অচেতন ও স্বয়ংক্রিয়। লিম্‌বিক্ তন্ত্রের কাজের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়তাসহ বেশকিছু অবধারণ (cognition) ও ঐচ্ছিক মানসিক ক্ষমতার চিহ্ন বিদ্যমান।

লিম্‌বিক্ তন্ত্রের প্রধান অংশগুলোর মধ্যে আছে : অলফ্যাক্টরি লোব, এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস (Amygdaloid nucleus), হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus) ও তার অন্যান্য অংশবিশেষ এবং একাধিক স্যাপ্টাল নিউক্লিয়াসসমূহ (Septal nuclei)। এছাড়াও ফর্নিক্স (fornix) ও স্ট্রাইয়া (stria) অংশগুলো মস্তিষ্কের মাঝামাঝি অংশে ও গভীরে গুচ্ছবদ্ধ তন্ত্রীর মতো সামনে পিছনে বিস্তৃত।

লিম্‌বিক্ তন্ত্রের স্নায়ুকোষগুলো ও তাদের স্থাপত্য সেরিব্রেল কর্টেক্সের অন্যান্য অংশের তুলনায় অন্য রকম। লিম্‌বিক্ তন্ত্রকে বাদ দিয়ে কর্টেক্সের বাকি প্রধান অংশকে নিয়োকর্টেক্স (neocortex) বা নূতন কর্টেক্স বলা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্কে এবং বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে নিয়োকর্টেক্স বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে মস্তিষ্কের প্রধান স্থান দখল করেছে। ফলে, কার্যগত দিক থেকেও লিম্‌বিক্ তন্ত্র কিছুটা আড়ালে পড়েছে।

৮. সেরিব্রাম (Cerebrum) : মস্তিষ্কের সমগ্র সম্মুখ, পশ্চাৎ ও উপরিভাগ জুড়ে সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক অবস্থিত। এর বাইরে ধূসরাংশ ও অভ্যন্তরে শুভ্রাংশ। বাইরের ধূসরাংশকেই সেরিব্রেল কর্টেক্স (cerebral cortex) বা সংক্ষেপে শুধু কর্টেক্স বলা হয়। অসংখ্য ভাঁজের ফলে মস্তিষ্কের সার্বিক আয়তন বৃদ্ধি না করেও কর্টেক্সের আয়তন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। সেরিব্রামের প্রায় সকল স্নায়ুকোষের মূল দেহই কর্টেক্সে অবস্থিত। এই কর্টেক্সের মধ্যেই দেহের সর্বোচ্চ স্নায়ুনিয়ন্ত্রক কেন্দ্রগুলো অবস্থিত।

সেরিব্রামের প্রধান গোলার্ধটির মাঝামাঝি যে গভীর ভাঁজ রয়েছে তাকে মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজ (central sulcus) বলা হয়। উপরের গোলার্ধ ও পার্শ্বস্থ স্ফীত অংশের মধ্যে যে গভীর ভাঁজটি রয়েছে, তাকে পার্শ্বস্থ প্রধান ভাঁজ বলে। মস্তিষ্কের পশ্চাৎ অংশেও আর একটি বড় ভাঁজ আছে। উপরিলিখিত তিনটি প্রধান ভাঁজ মস্তিষ্কের প্রতিটি গোলার্ধকে মোটামুটি চারটি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত করে; যথা : (ক) পুরো খণ্ড (frontal lobe) বা মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজের সম্মুখবর্তী সমগ্র অংশ; (খ) মধ্যপশ্চাৎ খণ্ড (parietal lobe) বা মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজ থেকে পশ্চাদস্থ প্রধান ভাঁজ পর্যন্ত অংশ; (গ) পশ্চাৎ খণ্ড (occiputal lobe) বা পশ্চাদস্থ প্রধান ভাঁজের পশ্চাৎদিকে অবস্থিত সমগ্র অংশ; ও (ঘ) পার্শ্বস্থ খণ্ড (temporal lobe) বা পার্শ্বস্থ প্রধান ভাঁজ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র পার্শ্ববর্তী স্ফীত অংশ (৬.১ ও ৬.২ চিত্র)।

কর্টেক্সের ধূসরাংশ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে (গড়ে ২.৫ থেকে ৪.৫ মিলিমিটার পর্যন্ত) গভীর। কর্টেক্সের স্নায়ুকোষগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতির। কমপক্ষে পাঁচ প্রকার মৌলিক আকৃতির স্নায়ুকোষ কর্টেক্সে দেখা যায় এবং নিয়োকর্টেক্সে এরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছয়টি স্তরে থাকে থাকে সাজানো থাকে। কর্টেক্সের বিভিন্ন অংশে নিউরনগুলোর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্থাপনকে মস্তিষ্কের 'কোষস্থাপত্য' বলা হয়। কোষস্থাপত্যের সাথে স্নায়ুকোষগুলোর কার্যপ্রণালি সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়।

কার্যগত দিক থেকে কর্টেক্সকে অনেকগুলো প্রধান এলাকায় ভাগ করা যায়। মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজের সাক্ষাৎ সম্মুখবর্তী অংশ কর্টেক্সের (বা দেহের) প্রধান মোটর এলাকা (চিত্র ৬.৩ 'ক')। মেরুরজ্জুর নিম্নগামী স্নায়ুস্তম্ভগুলির মূলদেহ এই এলাকায় অবস্থিত। এরা অপেক্ষাকৃত বড় বড় ও দেখতে পিরামিডের মতো। এজন্য এদেরকে পিরামিডাকৃতির স্নায়ুকোষ বলা হয়।

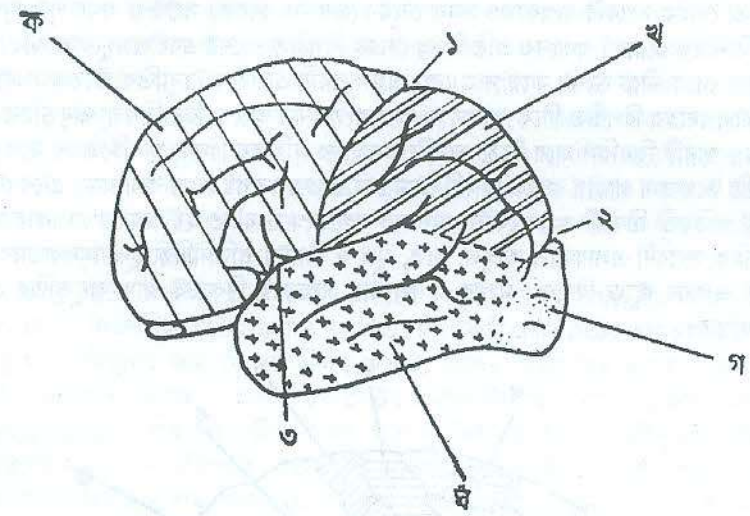

চিত্র ৬.২ : মানবমস্তিষ্ক (পার্শ্ব দৃশ্য)

১.	মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজ	(ক)	পুরো খণ্ড
২.	পশ্চাদস্থ প্রধান ভাঁজ	(খ)	মধ্যপশ্চাৎ খণ্ড
৩.	পার্শ্বস্থ প্রধান ভাঁজ	(গ)	পশ্চাৎ খণ্ড
		(ঘ)	পার্শ্বস্থ খণ্ড

প্রধান মোটর এলাকায় দেহের ঐচ্ছিক পেশীগুলোর জন্য সংক্ষিপ্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। মস্তিষ্কের কোনো এক পাশের মোটর এলাকায় কেবল দেহের অপর পাশের পেশীগুলির অভিক্ষেপ রয়েছে। এখানে পেশীগুলোর প্রতিনিধিত্ব উপর থেকে নীচে উল্টো করে সংস্থাপিত। অর্থাৎ, উপরের দিকে প্রথমে পা, তারপর দেহ, হাত এবং তারও নীচে (পার্শ্বস্থ ভাঁজের কাছাকাছি) মাথা ও মুখের প্রতিনিধিত্ব অবস্থিত। দেহের অন্যান্য অংশের পেশীর তুলনায় হাতের (বিশেষত হাতের আঙ্গুলগুলোর) ও মুখের (বিশেষত ঠোঁট দুটির) প্রতিনিধিত্ব অনেক বড় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মোটর এলাকার কোন অংশ ধ্বংস হলে, দেহের অপরদিকে তুলনীয় অংশে ঐচ্ছিক পেশীগুলো গুরুতররূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, কিন্তু মেরুরজ্জুর প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া অক্ষত থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে পেশীগুলিকে ইচ্ছা

অনুসারে ব্যবহার করার ক্ষমতা লোপ পায়। প্রধান মোটর এলাকার সাক্ষাৎ সম্মুখবর্তী বিস্তৃত অংশ পরোক্ষভাবে ঐচ্ছিক গতিসঞ্চালন বা মোটর কাজে সহযোগিতা করে। একে সহকারী মোটর এলাকা বলা যায় (চিত্র ৬.৩ 'খ')।

মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজের সাক্ষাৎ পশ্চাদ্বর্তী অংশ ত্বকের প্রধান সংবেদী এলাকা (চিত্র ৬.৩ 'গ')। ত্বকে অবস্থিত সংবেদী গ্রাহীস্থানগুলোর এটাই উচ্চতম কেন্দ্র। দৈহিক অনুভূতি (যথা : স্পর্শ, চাপ, ব্যথা, উত্তাপ ইত্যাদি) এই এলাকায় চেতনা লাভ করে। প্রধান মোটর এলাকার মতো দৈহিক সংবেদী এলাকায়ও সমস্ত দেহের (প্রধানত ত্বকের) সংক্ষিপ্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এখানেও প্রতিনিধিত্ব দেহের বিপরীত পাশের এবং অঙ্গগুলোর অভিক্ষেপ উপর থেকে নীচে উল্টো করে সাজানো। এই সংবেদী এলাকায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করলে দেহের বিপরীত দিকে ত্বকের বা অঙ্গের তুলনীয় অংশে 'বিভ্রান্তিকর' অনুভূতির সৃষ্টি হয় ; স্থানটি ঝিনঝিন করে উঠে, স্থানটিতে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় কিংবা স্থানটি অবশ মনে হয়। অতি উত্তেজনা প্রয়োগ করলে অঙ্গটি টেনে নেবার প্রয়াস স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। টেনে নেবার এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি প্রধান মোটর এলাকার সহযোগে সংঘটিত হয়। মোটর এলাকার মতো দৈহিক সংবেদী এলাকায়ও আঙ্গুল, হাত, মুখ ও ঠোঁটের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে বড় বড় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মুখের ও জিহ্বার এলাকার নিকটেই স্বাদ অনুভূতির কেন্দ্র অবস্থিত।

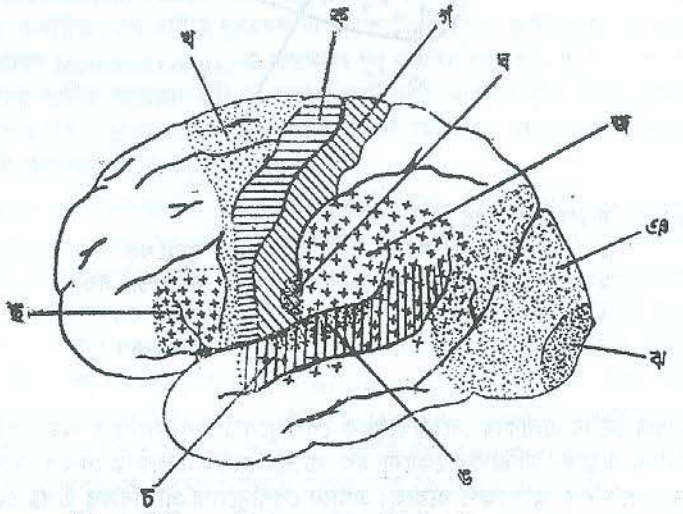

চিত্র ৬.৩ : সেরিব্রেল কর্টেক্সের প্রধান এলাকাসমূহ (পার্শ্বদৃশ্য)।

ক. প্রধান মোটর এলাকা
খ. সহকারী মোটর এলাকা
গ. দৈহিক সংবেদী এলাকা
ঘ. স্বাদের সংবেদী এলাকা
ঙ. শ্রবণের প্রধান এলাকা
চ. শ্রবণের মানসিক এলাকা
ছ. বাক্‌শক্তির মোটর এলাকা
জ. বাক্‌শক্তির সংবেদী ও মানসিক এলাকা
ঝ. দৃষ্টির প্রধান এলাকা
ঞ. দৃষ্টির মানসিক এলাকা।

পাশের প্রধান ভাঁজের কাছাকাছি মস্তিষ্কের পাশের খণ্ডে, শ্রবণের প্রধান সংবেদী এলাকা অবস্থিত। এর চতুর্দিকে বিস্তৃত এলাকাকে শ্রবণ-সংক্রান্ত মানসিক এলাকা বলা হয়। শ্রবণের প্রধান এলাকায় কক্‌লিয়ার বিভিন্ন অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং তা শব্দের স্পন্দনমাত্রাজনিত তারতম্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এলাকার পশ্চাৎভাগ কক্‌লিয়ার চূড়ার অংশের (অধিক স্পন্দনমাত্রার শব্দের) প্রতিনিধিত্ব করে। শ্রবণের প্রধান এলাকার অংশবিশেষ ধ্বংস হলে বিশেষ বিশেষ স্পন্দনমাত্রার শব্দের প্রতি বধিরতা সৃষ্টি হয়। শ্রবণের প্রধান এলাকা ও মানসিক এলাকা বাক্‌শক্তির উপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

বাক্‌শক্তি একটি জটিল, ঐচ্ছিক ও মানসিক ক্রিয়া। শ্রবণ ব্যতীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ প্রতীকগুলো নির্মাণ বা তাদের স্মৃতিধারণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে, কণ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠতালু ও ঠোঁটের পেশীগুলির ঐচ্ছিক সঞ্চালন ব্যতীত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করাও সম্ভব নয়। তদুপরি বাক্‌ক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্য স্মৃতিশক্তি ও মানসিক প্রচেষ্টারও অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায় যে, বাক্‌শক্তি কিছুটা সংবেদী, কিছুটা ঐচ্ছিক মোটর ও কিছুটা মানসিক ক্রিয়ার একটি সুষ্ঠু সমন্বয়। এসব কারণেই, বাক্‌শক্তির জন্য মানুষের মস্তিষ্কে বিশাল এলাকা নিয়োজিত আছে।

প্রধান মোটর এলাকার ঠিক সামনে, মস্তিষ্কের পুরো-খণ্ডের পার্শ্বস্থানীয় অংশে (চিত্র ৬.৩ 'ছ' দ্র:) বাক্‌শক্তির মোটর এলাকা অবস্থিত। নিকটবর্তী প্রধান মোটর এলাকায় কণ্ঠনালী ও মুখের পেশীগুলির জন্য যে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, তাদের পরিমেলের জন্যই বাক্‌শক্তির মোটর এলাকার প্রয়োজন। বাক্‌শক্তির মোটর এলাকাটির অন্য নাম 'ব্রোকার এলাকা' (Broca's area) ; তবে এলাকাটির সীমানা ততো সুনির্দিষ্ট নয়। হাতের পেশীগুলোর ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন মস্তিষ্কের কোনো এক গোলার্ধের প্রাধান্য থাকে (অর্থাৎ স্বভাবত ডান হাত ব্যবহারকারীদের বাম গোলার্ধ ও বাম হাত ব্যবহারকারীদের ডান গোলার্ধ), বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রণেও তেমনি মস্তিষ্কের কোনো এক গোলার্ধে অবস্থিত 'ব্রোকার এলাকা' অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করে। বিশেষ গোলার্ধের এই এলাকাটি ধ্বংস হলে, কথা বলার কাজে নানা জড়তা ও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

মস্তিষ্কের মধ্যপশ্চাৎ খণ্ডে দৈহিক সংবেদী এলাকার পশ্চাদ্বর্তী অংশে এবং শ্রবণের প্রধান এলাকার চতুর্দিকে বাক্‌শক্তির সংবেদী ও মানসিক এলাকা বিস্তৃত। এই এলাকা বাক্‌শক্তির মোটর এলাকা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত হলেও, এলাকা দুটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এছাড়াও লিখিত ভাষা পাঠ ও উপলব্ধি করার জন্য বাক্‌কেন্দ্রগুলোর সাথে দৃষ্টিশক্তির সমন্বয় অত্যাবশ্যক। সেই কারণে মস্তিষ্কের পশ্চাৎখণ্ডে অবস্থিত দৃষ্টির মানসিক এলাকার সাথে বাক্‌কেন্দ্রগুলোর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। অত্যন্ত জটিল ও বহুভাবে জড়িত বলে বাক্‌কেন্দ্রগুলোর সীমানা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাক্‌ক্রিয়া একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানবিক ক্রিয়া বলে প্রাণীদের মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও অসম্ভব। বাক্‌শক্তির সাথে সম্পর্কিত মানবমস্তিষ্কের বিস্তৃত এলাকা লক্ষ্য করলেই মানবজীবনে বাক্‌শক্তির বিরাট প্রভাবের নির্দেশ পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কের পশ্চাৎ খণ্ডে দৃষ্টির এলাকা অবস্থিত। দৃষ্টির প্রধান এলাকা পশ্চাৎ খণ্ডের শেষ প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে মস্তিষ্কের গোলার্ধটির মধ্যস্থানীয় পৃষ্ঠে বিস্তৃত। চিত্র ৬.৩-এ এই এলাকার কেবল বাইরের দিক ও শেষপ্রান্তটি দেখা যাচ্ছে। দ্বিখণ্ডিত মস্তিষ্কে (৬.১ চিত্র)

পশ্চাদস্থ প্রধান ভাঁজের পেছনে দৃষ্টির প্রধান এলাকার বাকি অংশ লক্ষ্য করা যায়। এলাকাটিকে অর্ধ-দৃষ্টির কেন্দ্র বলা হয়, কারণ প্রতিটি গোলার্ধে তা সমগ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের (Field of Vision) প্রধানত বিপরীত অর্ধেক অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

থ্যালামাসের পার্শ্বস্থানীয় জেনিকুলেট অংশ থেকে দৃষ্টির সংবেদী দ্বিতীয় স্নায়ুতন্তুগুলো উত্থিত হয়ে কর্টেক্সে দৃষ্টির প্রধান এলাকায় আসে। দৃষ্টির প্রধান এলাকায় রেটিনার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিনিধিত্ব রয়েছে ; অর্থাৎ রেটিনার প্রতিটি বিন্দুর জন্য দৃষ্টির প্রধান এলাকায় একটি প্রতিবিন্দু রয়েছে।

দৃষ্টির প্রধান এলাকার চারদিকে কর্টেক্সের বিরাট এলাকা জুড়ে দৃষ্টির মানসিক এলাকা বিস্তৃত (চিত্র ৬.৩ দ্র:)। দৃষ্টির প্রধান এলাকা অক্ষত থেকে, এইসব এলাকা ধ্বংস হলে দৃষ্টির মৌলিক অনুভূতিটি টিকে থাকে, কিন্তু এর তীক্ষ্ণতা অনেক কমে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে দৃষ্টির সাহায্যে ব্যক্তিটি স্থান নিরূপণ বা দেহের সঠিক অবস্থানও নিরূপণ করতে পারে না। কখনও বা এমন হয় যে পূর্বপরিচিত সাধারণ বস্তুও সে চিনতে পারে না।

রেটিনা থেকে আগত সংবেদী স্নায়বিক বার্তাগুলো মস্তিষ্কে কি করে চেতনাযুক্ত উপলব্ধিতে পরিণত হয় তা অজ্ঞাত। শুধু দৃষ্টি নয়, সব ইন্দ্রিয়-নির্ভর উপলব্ধির ক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন প্রযোজ্য। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া এখনও সম্ভব নয়। কোনো বস্তুর প্রতি আমরা যেসব গুণাগুণ আরোপ করি, তাদের অধিকাংশই আমাদের মস্তিষ্কের (ও স্নায়বিক প্রক্রিয়ার) আরোপিত গুণাগুণ। একটি লাল গোলাপকে আমরা 'লাল গোলাপ' বলে চিনতে পারি ও চিহ্নিত করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কি? গোলাপটি থেকে বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়বিক বার্তার সৃষ্টি করে এবং তা পরে মস্তিষ্কের দৃষ্টি এলাকায় একটি স্নায়বিক উত্তেজনার নকশা নির্মাণ করে। এই নকশার সাথে আমাদের পূর্ব পরিচিত নকশাগুলো মিলিয়ে আমরা নমুনা ও রং এর বৈশিষ্ট্য 'অবধারণ' করি। তখন পুরাতন নকশাগুলোর শব্দ প্রতীক বা ভাষা প্রতীক ব্যবহার করে আমরা উপলব্ধি করি—'একটি লাল গোলাপ দেখলাম'। নকশা থেকে নকশার প্রতীক ও পরে বিশ্লেষণ ; তা থেকে শব্দপ্রতীক বা ভাষাপ্রতীক, ওদের স্মৃতি ও সর্বোপরি অবধারণ। অতঃপর বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে অতীত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ ও তুলনা, স্মৃতিউদ্ধার, ইত্যাদি সবকিছু মিলে 'সংবাদ' প্রদান করে যে, যে বস্তুটি দেখলাম, তা একটি 'লাল গোলাপ'—কোনো 'হলুদ পাখি' বা 'কালো পাথর' নয়। সহজতম অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথেও চেতনার প্রক্রিয়াটি জড়িত। স্নায়বিক বার্তা চেতনায় অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে। চেতনশক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, তা এই অভিক্ষেপটি গ্রহণ করতে পারে, ধারণ করতে পারে এবং এটিকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'মানসিক অস্তিত্ব' প্রদান করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি একটি 'লাল গোলাপ' না হয়ে, একটি লাল গোলাপের নিখুঁত লেজার হলোগ্রাম (Laser hologram) হলে এবং সে কথা দর্শকের জানা না থাকলে, তার চেতনায় 'লাল গোলাপ' দেখার 'মানসিক অস্তিত্ব' দুটি ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন প্রকার হতে পারে। বস্তুটির সাথে মূল সংবেদী বার্তাগুলোর সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট না হলেও, বার্তাগুলোর সাথে চেতনশক্তির সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট। উপলব্ধির বিষয়টি পরে (পঞ্চদশ অধ্যায়ে) আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সেরিব্রেল কর্টেক্সের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত। কাজগুলোর ভাগাভাগি হলেও সমগ্র কর্টেক্সের একটি একত্ব রয়েছে। এর কারণ এলাকাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ। কর্টেক্সের যে কোনো একটি প্রধান এলাকা ধ্বংস হলে, এর ফলে কমবেশি অন্য সকল এলাকার কাজেই বিরূপ প্রভাব বিস্তারিত হয়। স্মৃতিধারণ ও শিক্ষার প্রক্রিয়াগুলোর সাথে নিয়োকর্টেক্সের অনেক অংশই জড়িত। কিন্তু স্মৃতি ও শিক্ষার জন্য কোনো বিশেষ অংশ চিহ্নিত করা যায় না।

এছাড়াও কর্টেক্সে বিরাট কতকগুলি এলাকা রয়েছে, যাদের কাজ কোনো সুনির্দিষ্ট দৈহিক বা মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলে পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। কর্টেক্সের এসব এলাকাকে মস্তিষ্কের 'নীরব এলাকা' বলা হয়। এসব এলাকায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করলে কোনো বিশেষ অনুভূতি, উপলব্ধি বা গতিসঞ্চালন ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। এসব এলাকা ধ্বংস হলেও কার্যগত বা আচরণিক দিক থেকে মানুষটির মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। মানুষের মস্তিষ্কে কর্টেক্সের প্রধান অংশই 'নীরব এলাকা'। এর তুলনায় প্রধান প্রধান সংবেদী ও মোটর কাজগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ।

কপালের দিকে মস্তিষ্কের পুরো খণ্ডটির প্রায় সবটুকুই 'নীরব এলাকা'। এই অংশটিকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলেও মানুষ বেঁচে থাকে, তবে তার ব্যক্তিত্বের কিছুটা পরিবর্তন ও জটিল চিন্তাশক্তির কিছুটা অবনতি ঘটে। কর্টেক্সের 'নীরব এলাকা'গুলো নষ্ট হয়ে গেলেও জৈবিক দিক থেকে একটি মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব।

তবে কি 'নীরব এলাকা'গুলো অতিরিক্ত? মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য ও সাধারণ মানসিক কাজগুলোর জন্য তার কর্টেক্সের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করে। তবে এতো বড় 'নীরব অংশ'গুলোর তাৎপর্য কি? একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মানুষের মস্তিষ্কে বিস্তৃত 'নীরব এলাকা'গুলো তার সার্বিক কাজের সম্ভাবনাকেও বিস্তৃত করেছে। মস্তিষ্কের পূর্ণ-সম্ভাবনার একটি ক্ষুদ্র অংশই সাধারণত বাস্তবায়ন করা সক্ষম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কের সম্ভাবনা কমবেশি বাস্তবায়িত হয় বটে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিরই পূর্ণ-সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে না। যিনি প্রগাঢ় মানসিক শক্তিপ্রয়োগ করে বিখ্যাত শিল্পী, তিনিই হয়তো দাবা কিংবা ফুটবল খেলায় অত্যন্ত অপটু। মস্তিষ্কের বিরাট 'নীরব এলাকা' লক্ষ্য করে দুঃখবাদীগণ হয়তো একে মূল্যবান অপব্যয় বলতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো অপব্যয় নয়। মানুষের মস্তিষ্কে বিরাট 'নীরব এলাকা' আছে বলেই হয়তো এই প্রজাতির সার্বিক মানসিক ক্ষমতা এতো বিশাল। এরূপ অব্যবহৃত প্রাচুর্যের উদাহরণ জীবজগতে অন্যত্র অনেক স্থানেই বিদ্যমান।

কোনো কোনো মানসিক রোগে নানা বিভ্রান্তি, ভয় বা হতাশা (প্রকৃত অথবা কল্পিত) মস্তিষ্কে যে কঠিন মানসিক চাপের সৃষ্টি করে, তার ফলে মানসিক স্থিরাবস্থা বিঘ্নিত হয়। এসব রোগের চিকিৎসার জন্য পূর্বে তেমন কোনো কার্যকরী ওষুধ ছিল না। বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে এরূপ অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। নিদ্রাবৃদ্ধি, বেদনা উপশম ও অবেদন (anaesthesia) করার অনেক ওষুধ অবশ্য আগেও ছিল। নূতন ওষুধগুলোর বিশেষত্ব হলো, এরা মানুষের মানসিক ক্রিয়াগুলোর উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ জন্যই এ জাতীয় ওষুধগুলোকে এন্টিসাইকোটিক্ (antipsychotic) বা মনোবিকার-প্রতিরোধী ওষুধ

নামে আখ্যা করা হয়েছে। নানা মানসিক রোগে ও এমনকি সম্পূর্ণ উন্মত্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্যও এসব ওষুধ আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জাতীয় ওষুধের মধ্যে প্রথম যেটি আবিষ্কৃত হয়, সেটি হলো রেসারপিন্ (reserpine)। এই ওষুধটি সর্পগন্ধা গাছের শিকড় থেকে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে প্রথম বিশুদ্ধরূপে শোধন করা হয়। প্রাণীদের ও মানুষের আচরণের উপরে রেসানপিন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, কিন্তু বিরূপ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে ওষুধটি এখন আর মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না।

বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্যও মানুষের মানসিক ক্রিয়াসমূহের ও মানসিক ভারসাম্যের উপরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কোনো কোনো মাদকদ্রব্য (যথা : গাঁজা, এল. এস. ডি., ইত্যাদি) মানুষের চেতনায় বিভ্রান্তিমূলক উপলব্ধি সৃষ্টি করতে পারে। যে-কোনো একটি মাদকদ্রব্য বা যে-কোনো একটি মনোবিকার-প্রতিরোধী ওষুধের ক্রিয়া ও প্রভাব প্রায় প্রতিটি স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে মোটামুটি একই হয়ে থাকে। এতে এটা মনে করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর পেছনে (তাদের ভিত্তিরূপে) নির্দিষ্ট ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ সংশ্লিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগুলো সব মানুষের জন্যই এক। এরূপ না হলে, এতো বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সকল মানুষের ক্ষেত্রে এতো পুনরুৎপাদনযোগ্য (reproducable) হতো না।

তবুও এ কথা বলতেই হয় যে, মস্তিষ্কের ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো কি পর্যায়ে ও কি প্রকারে মানুষের চেতনার স্তরে উপলব্ধি বা প্রজ্ঞারূপে রূপান্তরিত হয়, সে প্রশ্নে বিজ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণ নিরুত্তর। ভবিষ্যৎ গবেষণা ও আবিষ্কার হয়তো মানুষের এই দুমুখো অস্তিত্বের মধ্যে সংশ্লেষণ (synthesis) বা সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় ভাগ

সপ্তম অধ্যায়

স্নায়বিক উত্তেজনা

স্নায়বিক উত্তেজনা সহজেই স্নায়ুতন্তুর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রবাহিত হয়। নানান দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, স্নায়বিক উত্তেজনা অনেকটা বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো। গ্যালভেনোমিটার, ভোল্টমিটার, এম্‌মিটার ও অসিলোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে ধাতব তারের মধ্যে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক উত্তেজনার বিভিন্ন প্রভাব ও মান যেভাবে পরিমাপ করা যায়, স্নায়ুতন্তুর মধ্যে প্রবাহিত উত্তেজনার বিভিন্ন মানও এসব যন্ত্র দ্বারা একইভাবে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু স্নায়ুগুলি ধাতব তার নয় এবং স্নায়বিক উত্তেজনাও একটি সাধারণ তড়িৎ প্রবাহ নয়। স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি ও সঞ্চালনের সাথে স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুর মধ্যে সংঘটিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাসায়নিক ক্রিয়া জড়িত। ক্রিয়াগুলি মূলত প্রাণ-রাসায়নিক, কিন্তু ওদের প্রকাশ ও ফলাফল অনেকাংশে সাধারণ বৈদ্যুতিক শক্তির রূপ গ্রহণ করে। সেজন্য স্নায়বিক উত্তেজনার ক্রিয়াটিকে একটি বিশেষ প্রকার তাড়িত-রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়।

স্নায়ুর স্বাভাবিক মেরুকরণ (Polarization) : একটি স্নায়ুকোষ বা স্নায়ুতন্তুর ভিতরে একটি ও বাইরে অপর একটি সূক্ষ্ম ইলেকট্রোড স্থাপন করে, এদেরকে উপযুক্ত যন্ত্রের (যথা : অসিলোস্কোপ) সাথে যুক্ত করলে বাইরের তুলনায় স্নায়ুটির ভিতরের বৈদ্যুতিক বিভব বা পটেন্‌শিয়েল পরিমাপ করা যায়। বৈদ্যুতিক বিভব একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি এবং নিরপেক্ষ অবস্থার তুলনায় এটা ঋণাত্মক (negative) অথবা ধনাত্মক (positive) হতে পারে। অনুত্তেজিত বা স্থির অবস্থায় স্নায়ুর ভিতরের বৈদ্যুতিক বিভব বাইরের তুলনায় ঋণাত্মক এবং এই 'স্থির বিভব' এর পরিমাণ মোটামুটি – ৭০ mV (মিলিভোল্ট বা mV = ১/১০০০ ভোল্ট)। স্নায়ুর যে সূক্ষ্ম গাত্রাবরণী রয়েছে তা সহজভেদ্য হলে ভিতরে ও বাইরের বৈদ্যুতিক বিভবে কোনো তারতম্য থাকতো না। কারণ, সে অবস্থায় বাইরের বৈদ্যুতিক ভারাক্রান্ত রাসায়নিক অণু-পরমাণু বা চার্জকৃত আয়ন স্বচ্ছন্দে স্নায়ুর ভিতরে প্রবেশ করতে পারতো এবং তাতে স্নায়ুর ভিতরে ও বাইরে বৈদ্যুতিক বিভব এক হয়ে পড়তো। প্রকৃতপক্ষে গাত্রাবরণীটি স্থির অবস্থায় সম্পূর্ণ অভেদ্যও নয় তবে এর ভেদ্যতা অত্যন্ত কম ও নির্বাচনমূলক। স্থির অবস্থায় স্নায়ুর ভিতরে বাইরে অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পটাশিয়াম (K^+) ও অল্প পরিমাণে সোডিয়াম (Na^+) রয়েছে। স্নায়ুর ভিতরে অতিরিক্ত K^+, এর স্থির বিভবটির জন্য প্রধানত দায়ী।

সুতরাং দেখা যায় যে স্থির অবস্থায় স্নায়ুর অভ্যন্তর ভাগটি এর বাইরের তুলনায় বৈদ্যুতিক শক্তি ভারাক্রান্ত বা মেরুকৃত। একেই স্নায়ুর স্বাভাবিক মেরুকরণ বলা হয়।

বিমেরুকরণ (depolarization) **ও 'সক্রিয় বিভব'** : স্নায়ুর কোনো স্থানে আঘাত, উত্তাপ, ভেষজ বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করে স্থানটিকে উত্তেজিত করা যায়। উত্তেজনা স্নায়ুর গাত্রাবরণীতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উত্তেজনার স্থানে গাত্রাবরণীটি মুহূর্তের জন্য সহজভেদ্য হয়ে যায়। তখন বাইরের অতিরিক্ত চার্জকৃত আয়ন (প্রধানত Na^+) দ্রুত স্নায়ুর ভিতরে প্রবেশ করে এবং স্নায়ুটির ভিতর থেকে অতিরিক্ত কিছু K^+ আয়নও আবরণীর বাইরে চলে আসে। প্রধানত বাইরের অতিরিক্ত Na^+ আয়ন ভিতরে প্রবেশ করার ফলেই স্থানটির স্থির বিভব বিনষ্ট হয়ে যায়। উত্তেজনার স্থানে স্থির বিভবটির ঋণাত্মক অঙ্কমান (– ৭০ mV) কমে সেস্থানে স্পষ্ট ধনাত্মক অঙ্কমানের (+ ৪০ mV) নূতন বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টি হয়। স্নায়ুটির অভ্যন্তরে অন্যত্র তখনও ঋণাত্মক স্থির বিভব (– ৭০ mV) রয়েছে। এই অবস্থায় উত্তেজিত ধনাত্মক স্থান থেকে তড়িৎ-প্রবাহ দ্রুত স্নায়ুর ঋণাত্মক অংশের দিকে ধাবিত হয়। উত্তেজিত স্থান থেকে অনুত্তেজিত স্থানের দিকে ধাবমান ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তিভারটিকে স্নায়ুর 'সক্রিয় বিভব' (action potential) বলা হয়।

উত্তেজিত স্থানটির স্থির বিভব বা মেরুকরণ বিনষ্ট হওয়াকে স্থানটির বিমেরুকরণ বলে। বাইরের তুলনায় স্থানটির মুহূর্তের জন্য বিমেরুকরণ হলেও, স্নায়ুর অন্যত্র স্থির ঋণাত্মক অংশের তুলনায় এখন এটা বিপরীত বৈদ্যুতিক শক্তিভারসম্পন্ন। এই বিপরীত সম্পর্কের জন্যই বৈদ্যুতিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং সক্রিয় বিভবটি গতিশীল হয়ে উঠে। সক্রিয় বিভবটি একটি তরঙ্গের মতো ধনাত্মক স্থান থেকে ঋণাত্মক স্থানের দিকে ধাবিত হয় ও একটি স্নায়বিক উত্তেজনার রূপ পরিগ্রহ করে। উত্তেজিত স্থানে সক্রিয় বিভব +৪০ mV এবং অনুত্তেজিত স্থানে স্থির বিভব – ৭০ mV বলে এই দুই স্থানের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভবের পরিমাণভেদ মোটামুটি ১১০ mV (অর্থাৎ + ৪০ mV হতে – ৭০ mV পর্যন্ত)।

সম্মুখে অগ্রসরমান সক্রিয় বিভব স্নায়ুতন্তুর অভ্যন্তরে একটি চলমান বিমেরুকরণের প্রবাহ সৃষ্টি করে। সক্রিয় বিভব বা বিমেরুকরণের এই প্রবাহটি কোনো স্থানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করে না। কোনো একটি বিশেষ স্থানে এর অবস্থানক্ষণ ১ থেকে ২ msec (মিলিসেকেন্ড বা msec = ১/১০০০ সেকেন্ড) মাত্র। কোনো স্থানে উপস্থিত হবার পরক্ষণেই তা সামনে চলে যায়। ভূতপূর্ব স্থানটি তখন অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক বা স্থির অবস্থায় ফিরে আসে এবং সেখানে স্থির বিভব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্নায়বিক উত্তেজনার প্রবাহটিকে স্নায়ুতন্তুর মধ্যে একটি অস্থায়ী বিমেরুকরণের প্রবাহ বলা যায়। অগ্রসরমান বিমেরুকরণের প্রবাহ স্নায়ুর যে অংশেই উপস্থিত হয়, সেখানেই স্নায়ুর গাত্রাবরণী মুহূর্তের জন্য সহজভেদ্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে বাইরের Na^+ ভিতরে প্রবেশ করে। এভাবে সক্রিয় বিভবটির শক্তি অক্ষতভাবে রক্ষিত হয়। বিমেরুকরণের প্রবাহ পার হয়ে গেলে স্থানটি থেকে অতিরিক্ত Na^+ ছেঁকে বের করে আনা হয়। তখন স্থানটির গাত্রাবরণী আবার বাইরের Na^+ এর প্রতি দুর্ভেদ্য হয়ে যায়। এভাবেই স্থানটির স্থির বিভব বা স্বাভাবিক মেরুকরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (চিত্র ৭.১ 'ক' দ্র:)।

স্নায়বিক উত্তেজনার সমগ্র ক্রিয়াটিতেই স্নায়ুতন্তুর গাত্রাবরণী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। স্বাভাবিক মেরুকরণ সংরক্ষণ, বিমেরুকরণ সৃষ্টি ও অবশেষে স্বাভাবিক মেরুকরণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এসব কাজে স্নায়ুর গাত্রাবরণীটি একটি সক্রিয় নির্বাচনমূলক ছাঁকনি বা

পাম্পের মতো কাজ করে। Na^+ ও K^+ আয়নের প্রতি নির্বাচনমূলক ব্যবহার স্নায়ুর গাত্রাবরণীটির বৈশিষ্ট্য। স্থির অবস্থায়ও গাত্রাবরণীর নির্বাচনমূলক আয়ন-ছাঁকুনি বেশ সক্রিয় থাকে এবং সেজন্যই স্নায়ুর ভিতরে ও বাইরে K^+ ও Na^+ আয়নের পরিমাণে তারতম্য এবং স্নায়ুর স্বাভাবিক মেরুকরণটি রক্ষিত হয়।

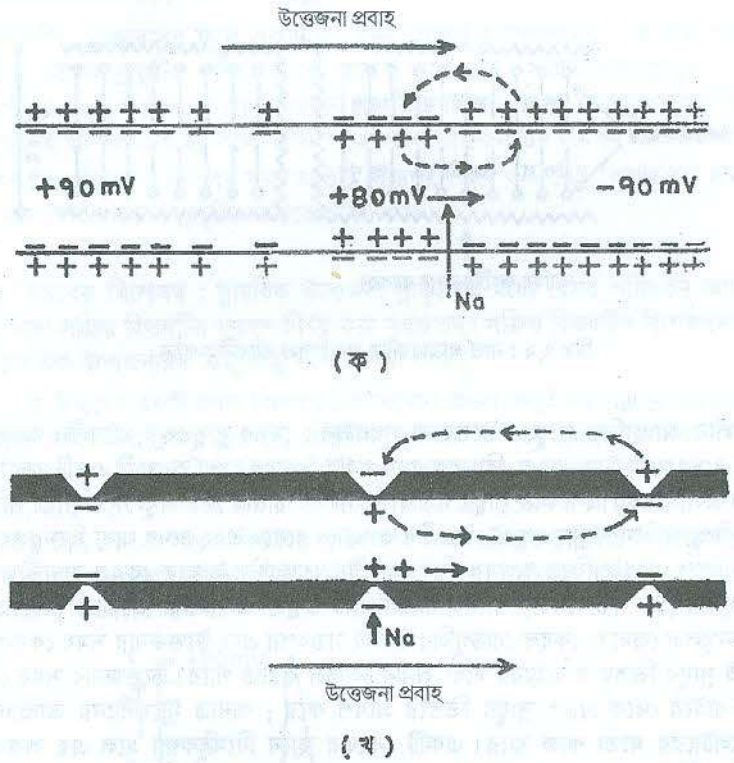

চিত্র ৭.১ : নার্ভতন্তুর মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনার সঞ্চালন (ব্যাখ্যার জন্য মূল গ্রন্থাংশ দ্রষ্টব্য)।
(ক) মায়েলীবিহীন নার্ভতন্তুর মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চালন।
(খ) মায়েলীনবিশিষ্ট নার্ভতন্তুর মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চালন।

গাত্রাবরণীটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আণবিক সংগঠনই একে এসব বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। স্নায়ুর গাত্রাবরণী মোটামুটি ১০০ Å (এঙ্গস্ট্রম বা Å = $১০^{-৭}$ মিলিমিটার) পুরু। গাত্রাবরণীটির সক্রিয়স্থানের মধ্যবর্তী অংশে স্নেহজাতীয় অণুর দুটি স্তর রয়েছে। এদের বাইরের দিকের প্রান্ত জলকামী (hydrophilic বা polar) অথচ ভিতরের প্রান্ত জলত্যাগী (hydrophobic বা nonpolar)। এরও বাইরে রয়েছে আমিষ জাতীয় পদার্থের একটি স্তর (চিত্র ৭.২)। অন্যত্র যেখানে গাত্রাবরণীটি পুরু মায়েলীন আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত সেখানে এটি নিষ্ক্রিয়। গাত্রাবরণীটি

ঠিক কিভাবে সক্রিয় ছাঁকনির মতো কাজ করে তা বলা মুশকিল। অনুরূপ অন্য নির্বাচনমূলক আবরণ বা পর্দা রসায়নশাস্ত্রে পরিচিত হলেও, স্নায়ুর গাত্রাবরণীটির মতো কোনো কৃত্রিম সক্রিয় পর্দা নির্মাণ করা এখনও সম্ভবপর হয় নি।

চিত্র ৭.২ : নার্ভ গাত্রাবরণীর প্রকল্পিত আণবিক গঠন।

মায়েলীন আচ্ছাদিত স্নায়ুতে উত্তেজনা সঞ্চালন : যেসব স্নায়ুতন্তুর মায়েলীন আচ্ছাদন নেই, ওদের মধ্যে উত্তেজনা বা বিমেরুকরণের প্রবাহ উপরের বর্ণনা অনুযায়ী একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। সেক্ষেত্রে স্নায়ুর গাত্রাবরণীটির সব স্থানেই নির্বাচনমূলক ভেদ্যতা লক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্নায়ুতন্তুরই মায়েলীন আচ্ছাদন রয়েছে এবং ওদের মধ্যে বিমেরুকরণের প্রবাহ ধাপে ধাপে লাফিয়ে অগ্রসর হয়। মায়েলীন আচ্ছাদিত স্নায়ুতে কেবল র‍্যানভীয়ারের নোডগুলির (১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) স্থানেই গাত্রাবরণীটি উন্মুক্ত ও সক্রিয়। এক্ষেত্রে গাত্রাবরণীর নির্বাচনমূলক ভেদ্যতা কেবল নোডগুলির স্থানেই সম্ভবপর এবং উত্তেজনার সময় কেবল সে স্থানেই স্নায়ুর ভিতর ও বাইরের মধ্যে আয়ন চলাচল করতে পারে। উত্তেজনার সময় নোড স্থানে বাইরে থেকে Na^+ স্নায়ুর ভিতরে প্রবেশ করে ; অন্যত্র মায়েলীনের আচ্ছাদনটি ইন্‌সুলেটারের মতো কাজ করে। একটি নোডের স্থানে বিমেরুকরণ হলে এর অন্তর্ভাগ ধনাত্মক বিভব ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন এর এবং এর সম্মুখবর্তী স্থির (ঋণাত্মক বিভব ভারাক্রান্ত) নোডটির মধ্যে, বাইরের সাথে একটি স্থানীয় তড়িৎ-প্রবাহের চক্র সৃষ্টি হয় (চিত্র ৭.১ 'খ' দ্র:)। ফলে পরক্ষণে এই দুটি নোডের মধ্যবর্তী পুরো অংশ ও সম্মুখবর্তী নোডটিতে বিমেরুকরণ সংঘটিত হয়। তখন দ্বিতীয় নোডটির সাথে এর সম্মুখবর্তী তৃতীয় নোডের আর একটি স্থানীয় তড়িৎ-প্রবাহের চক্র সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে প্রথম নোডটির স্থির বিভব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এভাবে মায়েলীন আচ্ছাদিত স্নায়ুতে বিমেরুকরণের প্রবাহ একটি নোড থেকে অন্য একটি নোডে ধাপে ধাপে লাফিয়ে চলে।

প্রতিটি পূর্ববর্তী নোড পরবর্তী নোডকে উত্তেজিত করতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্নায়ুকোষের মূলদেহ থেকেই বিমেরুকরণের (depolarization) প্রবাহ জন্ম হয় এবং তা একসন বেয়ে শুধু সামনের দিকেই চলতে থাকে। একস্থানে বিমেরুকরণ সংঘটিত হলে

পরক্ষণে স্থানটির সংবেদনশীলতা বেশকিছুটা কমে যায় এবং স্থানটি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সামান্য বিলম্ব হয়। এ কারণেই উত্তেজনার প্রবাহ সচরাচর কেবল স্নায়ুকোষের মূলদেহ থেকে এক্সনের শেষপ্রান্তের দিকেই প্রবাহিত হয়ে থাকে। অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে এক্সনের যে-কোনো স্থানে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে, উত্তেজনা প্রবাহ উভয়দিকেই সঞ্চালিত হতে দেখা যায়।

মায়েলীন আচ্ছাদনের ফলে একদিকে যেমন উত্তেজনা সঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমন স্নায়ুটির শক্তির ব্যয়ও অনেক কমে যায়। সক্রিয়ভাবে স্নায়ুর সমগ্র গাত্রাবরণীতে Na^+ ও K^+ এর আদান-প্রদান সংঘটিত না হয়ে কেবল নোডগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরতিস্থানেই তা সংঘটিত হয় বলে, শক্তি সংরক্ষণ ও উত্তেজনাটির দীর্ঘপথ অতিক্রম করা সহজতর হয়। উত্তেজনা প্রবাহের সময় প্রতিটি নোডস্থানে প্রায় ৬ × $১০^৬$ (অর্থাৎ ষাট লক্ষ) Na^+ আয়ন বাইরে থেকে স্নায়ুটির ভিতরে প্রবেশ করে।

সক্রিয় বিভবের বিশেষত্ব : স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুতন্তুর মধ্যে যেসব পরিবর্তন আনে, তাদের মধ্যে সক্রিয় বিভবটির গুণাগুণ নির্ণয় করা সহজতম। সক্রিয় বিভবটির বিশেষত্বসমূহ থেকে স্নায়বিক উত্তেজনারও কিছু কিছু বিশেষত্ব ধরা পড়ে।

সক্রিয় বিভবের একটি প্রধান বিশেষত্ব এর 'সর্বমান অথবা কিছুই নয়' (all or none)— এই নীতি। অন্য কথায় বলা যায় যে, প্রতিটি স্নায়ুর একটি বিশেষ মানের সক্রিয় বিভব রয়েছে। যখন স্নায়ুটিতে সক্রিয় বিভবের সৃষ্টি হয়, তখন সবসময় তা একই মানের (mV পরিমাণে) হয়ে থাকে ; কখনও কম বা বেশি মানের হয় না। উত্তেজক শক্তি একটি বিশেষ মানের কম হলে কোনো সক্রিয় বিভবের সৃষ্টিই হবে না। উত্তেজক শক্তি ঐ বিশেষ মানের ঊর্ধ্বে হলে একক ও সর্বমানবিশিষ্ট সক্রিয় বিভবটি সৃষ্টি হবে। উত্তেজক শক্তি আরো অধিক হলেও সক্রিয় বিভবটির মান অধিক হবে না (চিত্র ৭.৩ দ্র:)।

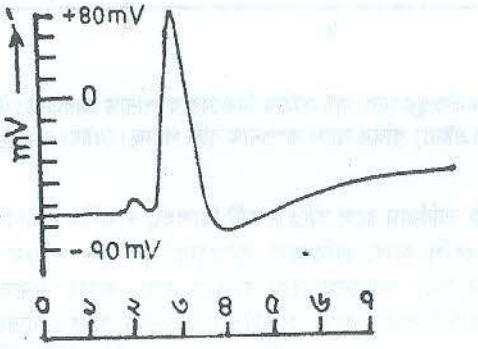

চিত্র ৭.৩ : অসিলোস্কোপ যন্ত্রে নার্ভের সক্রিয় বিভব। একটি ইলেকট্রোড নার্ভতন্তুর ভিতরে অন্য একটি বাইরে স্থাপন করে দুই স্থানে বৈদ্যুতিক বিভবের মাত্রাভেদ রেকর্ড করা হয়েছে। উপরের দিকে স্থানাঙ্ক প্রতিঘর ১০ mV (মিলিভোল্ট) এবং ডানদিকে স্থানাঙ্ক প্রতি ঘর ১ msec (মিলিসেকেন্ড) নির্দেশ করে।

স্নায়ুর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সঞ্চালিত হবার সময় সক্রিয় বিভবটির মানের কোনো অবনতি ঘটে না। স্নায়ুর মধ্যে চলার পথে তা সর্বক্ষণ পুনঃপুনঃ ও সক্রিয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে থাকে। উত্তেজক শক্তিটি যে প্রকারই হোক না কেন, স্নায়ুকোষ নিজস্ব সক্রিয় বিভবটি একইভাবে সৃষ্টি করে ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং সক্রিয় বিভবটির গুণাগুণ মূলত স্নায়ুকোষের উপরই নির্ভর করে—উত্তেজক শক্তিটির উপরে নয়। উত্তেজক শক্তিটি কেবল একটি বন্দুকের ঘোড়া বা ট্রিগারের মতোই ব্যবহৃত হয়। তা কেবল একটি বিশেষ মানের অধিক হলেই চলে ; পরবর্তী ফলাফল স্নায়ুকোষটির উপরেই নির্ভর করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একবার সক্রিয় বিভব সৃষ্টি হলে স্নায়ুটির পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সামান্য বিলম্ব হয়। সুতরাং উত্তেজক শক্তি অবিরাম বা একটানা হলেও সক্রিয় বিভবগুলি একটানা সৃষ্টি হতে পারে না। এরা পরপর কয়েকটি দলে সংঘবদ্ধ হয় এবং দুটি দলের মধ্যবর্তী সময়ে অবসাদজনিত বিরতির সৃষ্টি হয়।

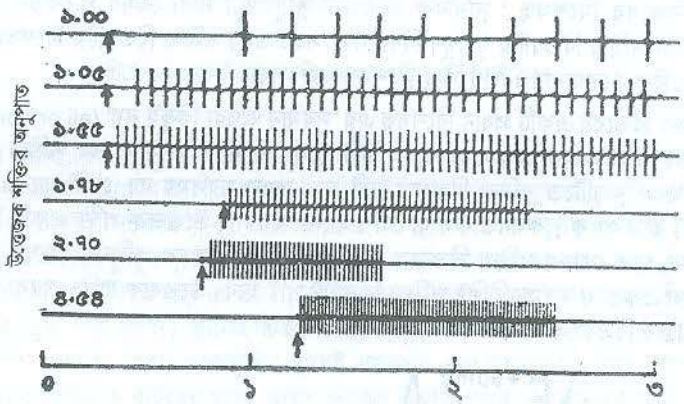

চিত্র ৭.৪ : একক নার্ভতন্তুর মধ্যে সৃষ্ট সক্রিয় বিভবের কম্পনাঙ্ক তারতম্য। উত্তেজনা শক্তি (বামে অনুপাত দ্রষ্টব্য) বৃদ্ধির সাথে কম্পনাঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। (দ্রষ্টব্য : Hodgkin, 1954)।

উত্তেজক শক্তি অবিরাম হলে আর একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। অবিরাম উত্তেজক শক্তি পরিমাণে কম বা বেশি হলে, প্রতিদলে পুনঃপুনঃ সংঘটিত সক্রিয় বিভবগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরতির সময় যথাক্রমে বেড়ে বা কমে যায়। অর্থাৎ উত্তেজক শক্তি পরিমাণে অধিক হলে এবং তা অবিরাম থাকলে, স্নায়ুটির মধ্যে ঘনঘন সক্রিয় বিভবের সৃষ্টি হয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, অবিরাম উত্তেজক শক্তির পরিমাণ, সক্রিয় বিভবগুলির সংঘটনমাত্রা বা কম্পাঙ্ককে (frequency) প্রভাবান্বিত করে (চিত্র ৭.৪ দ্র:)। অবিরাম উত্তেজক শক্তির পরিমাণ অধিক হলে সক্রিয় বিভবগুলির কম্পাঙ্ক অধিক (বিরতি কম) এবং উত্তেজক শক্তির পরিমাণ কম হলে সক্রিয় বিভবগুলির কম্পাঙ্ক কম (বিরতি অধিক) হয়ে থাকে। কিন্তু সব

ক্ষেত্রেই প্রতিটি একক সক্রিয় বিভবের মান সমান থাকে। উত্তেজক শক্তির প্রভাবে স্নায়ুতে সক্রিয় বিভবের কম্পাঙ্কের তারতম্যকে স্নায়বিক সংকেতমালার কম্পাঙ্ক মডুলেশন (frequency modulation) বলা যায়।

সব স্নায়ুতে কম্পাঙ্ক মডুলেশন (বা কম্পাঙ্কের তারতম্য) স্পষ্ট লক্ষণীয় নয়। সংবেদী স্নায়ুসমূহেই এটি স্পষ্ট ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অপটিক স্নায়ুতে স্নায়বিক উত্তেজনার কম্পাঙ্ক স্পষ্টত রেটিনায় পতিত আলোকের উজ্জ্বলতার উপরে নির্ভর করে। সংবেদী স্নায়ুগুলিতে সক্রিয় বিভবের কম্পাঙ্কের তারতম্য হয়তো বহিরাগত উত্তেজক শক্তিটির পরিমাণ বা তীব্রতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ বহন করে। তবে বহু স্নায়ুবিশিষ্ট দীর্ঘ স্নায়বিক পথে, কম্পাঙ্কের তারতম্য সংক্রান্ত বার্তা একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে অক্ষত অবস্থায় পৌঁছে না।

কম্পাঙ্ক মডুলেশন স্নায়বিক সংকেত সঞ্চালন ব্যবস্থায় কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা বলা মুশকিল। এটা লক্ষণীয় যে, কম্পাঙ্ক নির্ভরশীল বহির্জগতের শক্তিসমূহের (যথা : আলোক ও শব্দ) ভিন্ন ভিন্ন মানের কম্পাঙ্ক সংবলিত বার্তা হস্তান্তরের জন্য গ্রাহীযন্ত্রগুলিতে কম্পাঙ্ক মডুলেশনের ব্যবস্থা প্রচলিত নয়। বরং ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্ক হস্তান্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহীকোষের প্রচলনই দেখা যায় (যথা : রেটিনা ও কক্লিয়ার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহীকোষের ব্যবস্থা)। তবে কম্পাঙ্ক মডুলেশনের মাধ্যমে একটি স্নায়ুতন্তু থেকে অপর একটি স্নায়ুতন্তুতে বার্তাপ্রবাহের ক্ষেত্রে একটি নির্বাচনমূলক বাধার সৃষ্টি হতে পারে। উত্তেজক শক্তিটি অবিরাম ও যথেষ্ট উচ্চমানের হলে যখন সক্রিয় বিভবের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পায়, হয়ত কেবল তখনই দ্বিতীয় স্নায়ুতন্তুটিতে উত্তেজনা প্রভাবিত হতে পারে। এরূপ ব্যবস্থায় অল্পমানের ও স্বল্পক্ষণস্থায়ী উত্তেজক শক্তি যদিও প্রথম স্নায়ুতন্তুটিকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়, হয়ত তা পরবর্তী দ্বিতীয় স্নায়ুতন্তুটিকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হবে না। মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত সংবেদী স্নায়বিক বার্তাসমূহের পথে এরূপ নির্বাচনমূলক বাধা আছে, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

অষ্টম অধ্যায়

সিনাপ্‌স্ স্থানে উত্তেজনা সঞ্চালন

পূর্বে বলা হয়েছে যে কয়েকটি স্নায়ুকোষ বা নিউরন পরপর অবস্থিত হয়ে দীর্ঘ স্নায়বিক যোগাযোগ-পথ সৃষ্টি করে। যে স্থানে একটি নিউরনের এক্সন প্রান্ত অন্য একটি নিউরনের মূলদেহ বা ডেনড্রাইটের নিকট সংস্পর্শে এসে কার্যগতভাবে সংযোগ স্থাপন করে, সে স্থানগুলিই সিনাপ্‌স্ স্থান। কোনো কোনো সিনাপ্‌স্ জটিল আকারের হতে পারে, কারণ অনেক সময় একাধিক এক্সন প্রান্ত একটি সাধারণ নিউরনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। অন্যদিকে একটি নিউরনের শাখা প্রশাখাযুক্ত এক্সন, অন্য অনেকগুলি নিউরনের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। সিনাপ্‌স্‌গুলির অবস্থান বহুমুখী ও বহুস্থানাঙ্কবিশিষ্ট স্নায়বিক যোগাযোগের সহায়তা করে।

সিনাপ্‌স্ স্থানে সংকেত সঞ্চালন স্নায়ুতন্তুর মতো নয়। স্নায়ুতন্তুর বিমেরুকরণের প্রবাহ সিনাপ্‌স্ স্থানে এসে বাধাপ্রাপ্ত ও ক্ষান্ত হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বিশেষ প্রক্রিয়ায় সিনাপ্‌স্ স্থান অতিক্রম করে পরবর্তী নিউরনটিকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়। স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদী বিভাগে ও মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্থানে সিনাপ্‌স্‌সমূহে ঠিক কি প্রক্রিয়ায় উত্তেজনা সঞ্চালিত হয়, তা এখনও বহুলাংশে অজ্ঞাত। তবে মোটর স্নায়ুগুলির শেষপ্রান্তে (অর্থাৎ স্নায়ু-পেশী সংযোগ স্থলে) এবং স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের গ্যাংলিয়ায় (স্নায়ু-স্নায়ু সংযোগস্থলে) ও শেষপ্রান্তে (স্নায়ু-পেশী বা স্নায়ু-গ্রন্থিকোষ সংযোগস্থলে) সিনাপ্‌স্‌গুলির কার্যপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

নিউরো-হরমোন বা স্নায়ু-হরমোন : স্নায়বিক উত্তেজনা যখন মোটর স্নায়ুর শেষপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন তা পেশী বা গ্রন্থির কোষগুলিতে সরাসরি প্রবেশ করে না। উত্তেজনার ফলে স্নায়ুতন্তুটির শেষপ্রান্ত থেকে কোনো একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাসায়নিক বস্তু নিঃসৃত হয়। এই রাসায়নিক বস্তু তখন পেশী বা গ্রন্থির কোষগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। স্নায়ুপ্রান্ত থেকে উত্তেজনার মুহূর্তে নিঃসৃত এরূপ বিশেষ রাসায়নিক বস্তুকে নিউরো-হরমোন বা স্নায়ু-হরমোন বলে। নিউরো-হরমোনগুলি রাসায়নিক সংকেতবস্তুর মতো কাজ করে এবং ওদের জন্য সিনাপ্‌স্-এর অপরপ্রান্তে বিশেষ বিশেষ গ্রাহীস্থান আছে। সিনাপ্‌স্ স্থানে নিউরো-হরমোন যথাসময়ে মুহূর্তের জন্য নিঃসৃত হয়; পেশীকোষ, গ্রন্থিকোষ বা অপর একটি স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত বা অবনমন করে পরমুহূর্তেই তা ধ্বংস হয়। সিনাপ্‌স্ স্থানে নিউরো-হরমোন সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও ধ্বংস করার জন্য বিস্তারিত সক্রিয় ও গতীয় স্থানীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

এসিটাইলকোলীন (acetylcholine) এরূপ একটি সুপরিচিত নিউরো-হরমোন। যেসব স্নায়ুতন্তুর শেষপ্রান্ত থেকে উত্তেজনার ফলে এসিটাইলকোলীন নিঃসৃত হয়, তাদেরকে কোলীনারজিক স্নায়ু বলা হয়। মেরুরজ্জুর ধূসরাংশে অবস্থিত অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষগুলি সবই কোলীনারজিক। দেহের সর্বত্র ঐচ্ছিক পেশীকোষগুলির কাছে, অন্তিম মোটর স্নায়ুর শেষপ্রান্ত অবস্থিত। ঐচ্ছিক পেশীর স্নায়ু-পেশী সংযোগস্থলে এসিটাইলকোলীনই একমাত্র সক্রিয় নিউরো-হরমোন। ঐচ্ছিক পেশীর সংকোচন ও হস্তপদাদির অঙ্গসঞ্চালন, স্নায়ু-পেশী সংযোগস্থলে মুহূর্তের জন্য নিঃসৃত এসিটাইলকোলীনের জন্যই সম্ভবপর হয়ে থাকে। স্নায়ুপ্রান্তে এসিটাইলকোলীন সৃষ্টির জন্য সেখানে কোলীন এসিটাইলজ নামক এনজাইম রয়েছে। নিঃসৃত হবার মুহূর্তকাল মধ্যে সিনাপ্‌স্ স্থানে অবস্থিত কোলীন-এস্টাইরেজ নামক অপর একটি এনজাইম এসিটাইলকোলীনকে ধ্বংস ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। স্বাভাবিক অবস্থায় সৃষ্ট এসিটাইলকোলীন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সে অবস্থায় তা নিষ্ক্রিয় থাকে। উত্তেজনার মুহূর্তে কণাগুলি ভেঙ্গে মুক্ত এসিটাইলকোলীন নিঃসৃত হয় এবং কেবল তখনই কোলীনএস্টাইরেজ তাকে ধ্বংস করতে পারে। সিনাপ্‌স্ স্থানে এসিটাইলকোলীন, কোলীনএসিটাইলেজ অথবা কোলীনএস্টাইরেজ—এদের যে-কোনো একটির ব্যতিক্রম হলে ঐচ্ছিক পেশীগুলির ক্রিয়ায় নানাপ্রকার অস্বাভাবিক বিঘ্ন দেখা দেয়। ভেষজ দ্বারা সক্রিয় এনজাইমগুলিকে অস্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় করে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়।

স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের সিম্‌পেথেটিক ও প্যারাসিম্‌পেথেটিক—উভয় বিভাগেই গ্যাংলিয়ার পূর্ববর্তী অংশের (চিত্র ৫.৩) স্নায়ুকোষগুলি কোলীনারজিক। গ্যাংলিয়ায় অবস্থিত সিনাপ্‌স্ স্থানে, গ্যাংলিয়া-পূর্ববর্তী নিউরনের শেষপ্রান্ত থেকে উত্তেজনার সময় এসিটাইলকোলীন নিঃসৃত হয় ও গ্যাংলিয়া-পরবর্তী নিউরনকে উত্তেজিত করে। এস্থলে স্নায়ু-স্নায়ু সংযোগস্থানে এসিটাইলকোলীন একটি প্রকৃত নিউরো-হরমোনের কাজ করে এবং সিনাপ্‌স্ স্থানে রাসায়নিক সংকেত সঞ্চালনের রীতি পূর্ণ সমর্থন করে।

গ্যাংলিয়া-পরবর্তী স্নায়ুগুলি কিন্তু দু'প্রকার। প্যারাসিম্‌পেথেটিক বিভাগে গ্যাংলিয়া-পরবর্তী স্নায়ুগুলি সকলেই কোলীনারজিক। কিন্তু সিম্‌পেথেটিক বিভাগে অধিকাংশ গ্যাংলিয়া-পরবর্তী স্নায়ুই কোলীনারজিক নয়; ওদের শেষপ্রান্ত থেকে (অর্থাৎ, স্নায়ু-পেশী বা স্নায়ু-গ্রন্থি সংযোগস্থলে) উত্তেজনার সময় নর-এড্‌রিনেলীন (noradrenaline) নামক নিউরো-হরমোন নিঃসৃত হয়। স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের গ্যাংলিয়া-পরবর্তী স্নায়ুগুলি যেসব দেহযন্ত্র (যথা : হৃৎপিণ্ড, ধমনী, উপ-ধমনী, অন্ত্র, ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে, ওদের উপরে এসিটাইলকোলীন ও নর-এড্‌রিনেলীনের প্রকট ও বিপরীতমুখী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যে সকল স্নায়ুর শেষপ্রান্ত থেকে নর-এড্‌রিনেলীন নিঃসৃত হয়, তাদেরকে এড্‌রিনারজিক্ স্নায়ু বলা হয়।

নর-এড্‌রিনেলীনের মতো এবং এরই সমতুল্য অন্য একটি রাসায়নিক বস্তু এড্‌রিনেলীন (adrenaline)। নর-এড্‌রিনেলীন থেকেই সামান্য রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এড্‌রিনেলীনের সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র ৮.১ দ্র:)। এড্‌রিনেলীন স্নায়ুপ্রান্ত থেকে নিঃসৃত না হলেও তা দেহে একটি বিশেষ হরমোনরূপে কাজ করে। কিডনীর উপরস্থ সুপ্রারিনেল

নালীহীন গ্রন্থির মেডুলা অংশ (অন্তস্থ ভাগ) থেকে হঠাৎ ভয় বা বিপদ আশঙ্কার সময় এড্‌রিনেলীন নিঃসৃত হয় এবং রক্তের সাথে মিশে সারা শরীরে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ডের দ্রুততর সংকোচন, রক্তচাপ বৃদ্ধি, রক্তে অধিকতর গ্লুকোজ সরবরাহ, ইত্যাদি প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া এড্‌রিনেলীনের কাজ।

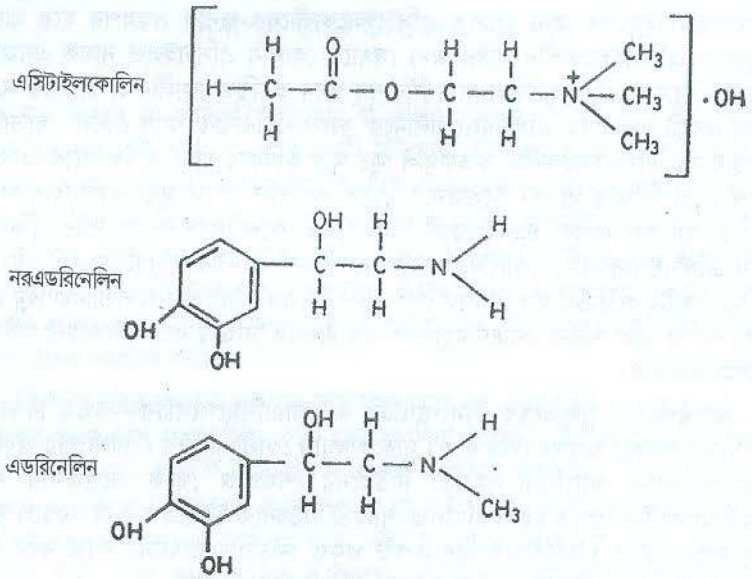

চিত্র ৮.১ : প্রধান নার্ভ হরমোনগুলির আণবিক গঠন।

গ্যাংলিয়া-পরবর্তী সিম্‌পেথেটিক স্নায়ুর শেষপ্রান্ত থেকে যেখানে নর-এড্‌রিনেলীন নিঃসৃত হয়, সেখানে দেহযন্ত্রগুলিতে নর-এড্‌রিনেলীনের জন্য বিশেষ গ্রাহীস্থান রয়েছে। এসকল গ্রাহীস্থানের সন্নিকটে এড্‌রিনেলীনের জন্যও অন্য বিশেষ গ্রাহীস্থান আছে। স্নায়ুপ্রান্ত থেকে নিঃসৃত নর-এড্‌রিনেলীন তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না ; এর কতকাংশ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে এড্‌রিনেলীনে রূপান্তরিত হয় এবং তা এড্‌রিনেলীনের গ্রাহীস্থানসমূহে রক্তবাহী হরমোনটির মতোই কাজ করে। সেজন্য সিম্‌পেথেটিক স্নায়ুর উত্তেজনার সময় এর শেষপ্রান্তে নর-এড্‌রিনেলীন ও এড্‌রিনেলীন এই উভয় রাসায়নিক বস্তুরই উপস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত ব্রেইনস্টেম (মেডুলা, পন্‌স্ ও মধ্যমস্তিষ্ক) ও হাইপোথ্যালামাস অংশে বহু এড্‌রিনারজিক্ স্নায়ুকোষ রয়েছে। এসব স্নায়ুকোষের শেষপ্রান্ত মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। পরীক্ষিত ফলাফল থেকে এরূপ বিশ্বাস

করার কারণ রয়েছে যে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বহুঅংশেই সিনাপ্‌স্ স্থানে এড্‌রিনারজিক্ রাসায়নিক সংকেত সঞ্চালনের প্রথা প্রচলিত। কেন্দ্রীয় এড্‌রিনারজিক্ নিউরনগুলি মেরুরজ্জুর কোনো কোনো প্রতিবর্তী ক্রিয়া (যথা : ফ্লেক্সর রিফ্লেক্স) ও মস্তিষ্কে কতগুলি সহজাত ক্রিয়ার (যথা : স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নালীহীন গ্রন্থিগুলির স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ) সাথে ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কবদ্ধ। সেরিব্রেল কর্টেক্স ও লিম্‌বিক্ তন্ত্রের (limbic system) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এড্‌রিনারজিক্ নিউরনগুলি অনেক জটিল আচরণিক ক্রিয়ার উপরেও প্রভাব বিস্তার করে (যথা : প্রাণীর ভাবাবেগ, সাপেক্ষ বর্জন প্রতিক্রিয়া, সহজাত প্রবৃত্তি, ইত্যাদি)।

নর-এড্‌রিনেলীন ও এড্‌রিনেলীন মানুষের ভাবাবেগের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিপদাশঙ্কার সময় এ প্রভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে। বিপদের সম্মুখীন হলে বা বিপদের সংকেত পেলে প্রাণীর মতো মানুষও তার দেহের সমগ্র স্নায়বিক ও রাসায়নিক শক্তি উত্তেজিত করে আকস্মিক আক্রমণ বা বিপদ থেকে নিজকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। এটা প্রধানত একটি সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া, কিন্তু এর লক্ষণ ও প্রভাব অনেক সময়েই ভাবাবেগ ও আচরণের পরিবর্তনরূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিপদাশঙ্কায় মানসিক উদ্বেগ ও দৈহিক পরিবর্তনাদির সাথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্নায়বিক ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত। কোনো কোনো ভেষজ (যথা : রেসারপিন) প্রয়োগ করলে এড্‌রিনারজিক্ নিউরনগুলির নিউরো-হরমোন প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় প্রাণীর আচরণে বিরাট পরিবর্তন উপস্থিত হয়। আধুনিককালে এ সম্পর্কে বহু তথ্যাবলি উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং প্রাণীর ও মানুষের আচার ব্যবহারের পরিবর্তনের সাথে মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তনের কার্য-কারণ সম্পর্কের মতবাদ বহুলাংশে সমর্থন লাভ করেছে।

স্নায়ুতন্ত্রে ও দেহে এড্‌রিনারজিক্ পদ্ধতিগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই গ্রন্থে সম্ভব নয়। পদ্ধতিগুলি খুবই জটিল এবং গতীয়। টাইরোসীন নামক আমিষ জাতীয় পদার্থ থেকে প্রথমে ডোপা (DOPA বা 3,4-dihydroxyphenylalanine) সৃষ্টি হয়। পরে ডোপা থেকে ডোপামিন (Dopamine বা 3,4-dihydroxyphenylethylamine) ও তা হতে নর-এড্‌রিনেলীনের সৃষ্টি হয়। নর-এড্‌রিনেলীন রূপান্তরিত হয়ে এড্‌রিনেলীনের সৃষ্টি হয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরিলিখিত প্রতিটি রূপান্তরই বিশেষ বিশেষ এনজাইমের ক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। নর-এড্‌রিনেলীন ও এড্‌রিনেলীন উভয়ই কাজ শেষে নিষ্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং তাও বিশেষ এনজাইমের ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হয়। রূপান্তরের ক্রিয়াগুলির উপরে প্রভাব বিস্তার করে নর-এড্‌রিনেলীনের প্রাপ্যতা কমবেশি করা যায় এবং তাতে সমগ্র এড্‌রিনারজিক পদ্ধতির উপরে প্রভাব বিস্তৃত হয়।

মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। যে-কোনো পরিবর্তনেই এরা উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে। তেমনটি যাতে না হয় সেজন্য ব্যাপক অবনমনকারী ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকের মতে মস্তিষ্কে যতো না কর্মতৎপর স্নায়ুকোষ রয়েছে, প্রায় সে পরিমাণ অবনমনকারী (বা উত্তেজনারোধক) স্নায়ুকোষ রয়েছে। অবনমনকারী স্নায়ুকোষ নির্বাচনের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত স্নায়বিক উত্তেজনা দমন করে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগমনী উত্তেজনাকে ছেঁকে বাদ দেয়। অবনমনকারী অনেক স্নায়ুকোষে γ-এমাইনোবুটাইরিক এসিড

বা গাবা (γ-aminobutyric acid বা GABA) নামক রাসায়নিক কাজ করে। গাবা একটি সাধারণ আমিষ জাতীয় পেপ্‌টাইড্ (গঠন : NH_2-CH_2-CH_2-CH_2-COOH), তবে মস্তিষ্কে এটি অবনমনকারী স্নায়বিক সঞ্চালকরূপে কাজ করে বলে অনুমান করা হয়। অনুরূপে সেরোটনিন (serotonin বা 5-HT) নামক অপর একটি পেপটাইডও মস্তিষ্কে স্নায়বিক ও মানসিক প্রক্রিয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে নর-এড্‌রিনেলীনের মতো গাবা ও সেরোটনিনও প্রধানত মস্তিষ্কের আদি বা নিম্নাংশেই বেশি পাওয়া যায়; সেরিব্রেল কর্টেক্স তাদের খুব একটা ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। মস্তিষ্কে নিউরোনের মধ্যে ও বিশেষ বিশেষ গ্রাহী স্থানে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গাবা ও সেরোটনিন হয়তো বা স্নায়বিক সঞ্চালকের মতো কাজ করে অথবা কোনো উপায়ে স্নায়বিক সঞ্চালনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। নিদ্রা ও দুঃশ্চিন্তা সৃষ্টির সাথেও এসব পেপ্‌টাইড্ জড়িত বলে মনে করা হয়।

মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কের অপরাপর সিনাপ্‌স্ : মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশে সিনাপ্‌স্ স্থানে রাসায়নিক সংকেত সঞ্চালনের (কোলীনারজিক অথবা এড্‌রিনারজিক) প্রমাণ থাকলেও, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিস্তৃত অংশে সিনাপ্‌স্ স্থানে রাসায়নিক সংকেত সঞ্চালনের কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। স্বায়ত্তশাসিত গ্যাংলিয়া ও কেন্দ্রীয় এড্‌রিনারজিক নিউরনগুলির উদাহরণ থেকে অনেকে মনে করেন, মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্‌সমূহের জন্যও হয়তো কোনো না কোনো নিউরো-হরমোন আছে। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে (ফ্লোরসেন্স পদ্ধতি) মস্তিষ্কের এড্‌রিনারজিক সিনাপ্‌স্ স্থানগুলি ও নিউরনগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু মস্তিষ্কের সমগ্র সিনাপ্‌স্ ও নিউরনের সংখ্যার তুলনায় ওদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তদুপরি এড্‌রিনারজিক নিউরনগুলি কেবলমাত্র মস্তিষ্কের নিম্নভাগেই অবস্থিত।

মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কের অসংখ্য স্নায়ু-স্নায়ু সংযোগস্থলে কোনো এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিউরো-হরমোন আছে কিনা এবং থাকলে এরা কি কি বা কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করে তা এখনও অজ্ঞাত। বহু অনুসন্ধান করেও কোনো সাধারণ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক সঞ্চালকের আবিষ্কার সম্ভব হয় নি। মস্তিষ্কের বিস্তৃত অংশে সিনাপ্‌স্ স্থানে কী উপায়ে সংকেত সঞ্চালন হয়, তা মস্তিষ্কের গবেষণার ক্ষেত্রে এখনও একটি মুখ্য প্রশ্ন।

মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্‌গুলি এতো সুক্ষ্ম যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত তাদের গঠন স্পষ্ট নিরীক্ষণ করা যায় না। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যতটুকু দেখা যায় (চিত্র ৮.২ দ্র:) তাতে মনে হয়, সিনাপ্‌স্ স্থানে হয়তো বা কোনো রাসায়নিক সঞ্চালক থাকতে পারে। একসনের শেষপ্রান্তে (সিনাপ্‌স্ পূর্ববর্তী অংশে) যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বা ভেসিক্যাল দেখা যায় এরা সিনাপ্‌স্ এর পর্দার কাছে ভীড় করে থাকে এবং কোথাও কোথাও এরা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। বিভিন্ন সিনাপ্‌স্ স্থানে ওদের কমবেশি অবস্থানও লক্ষণীয়। এসব ভেসিক্যাল অজ্ঞাত সঞ্চালক বস্তুর বাহক বলে কেউ কেউ মনে করেন, তবে এর কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্ স্থানে সংকেত হস্তান্তরের জন্য রাসায়নিক পদ্ধতির বিকল্প অন্য কোনো অজ্ঞাত মিতব্যয়ী ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা গবেষণার বিষয়। কোনো কোনো নিম্নস্তরের প্রাণীর দেহে সিনাপ্‌স্ স্থানে সরাসরি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় সংকেত সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্‌গুলিতে অনুরূপ বৈদ্যুতিক বা অন্য কোনো অজ্ঞাত শক্তি হস্তান্তরের প্রথাও

থাকতে পারে, যেখানে রাসায়নিক সঞ্চালকের প্রয়োজন হয় না। সিনাপ্‌স্ স্থানে রাসায়নিক সঞ্চালন ব্যবস্থার কতগুলি প্রয়োজনীয় দিক (যথা : বহুমুখী যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন) যেমন রয়েছে, তাতে তেমনি কতকগুলি ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। রাসায়নিক সঞ্চালনের পথে স্বাভাবিক কারণেই নানাপ্রকার বিলম্ব সৃষ্টি হয়; তাছাড়া কতক্ষণ একটানা কাজের পর সিনাপ্‌স্‌গুলি দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাসায়নিক সঞ্চালকটির অভাবে ক্লান্ত সিনাপ্‌স্‌গুলিতে সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। গ্যাংলিয়ায় বা মোটর স্নায়ু প্রান্তে রাসায়নিক সঞ্চালন ব্যবস্থায় সিনাপ্‌স্ স্থানে ভূতপূর্ব সংবাদ সঞ্চালনের ঘটনার কোনো স্থায়ী প্রভাব বা রেকর্ড থাকে না। অথচ মস্তিষ্কে এরূপ রেকর্ড বা স্মৃতিধারণের জন্য ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

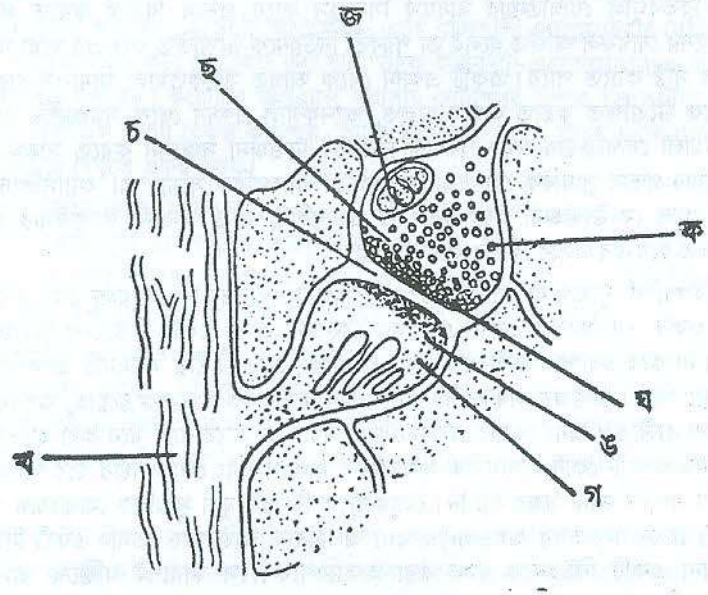

চিত্র ৮.২ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মস্তিষ্কের একটি সিনাপ্‌স্।
ক. একসন প্রান্ত ; খ. ডেনড্রাইট ; গ. ডেনড্রাইটের শাখা ; ঘ. সিনাপ্‌স্ পূর্ববর্তী পর্দা ; ঙ. সিনাপ্‌স্ পরবর্তী পর্দা ; চ. মধ্যবর্তী ঘন-স্তর; ছ. সিনাপ্‌স্ এর ভেসিক্যাল ; জ. একটি মাইটোকন্ড্রিয়া।

স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদী বিভাগে স্নায়ু-স্নায়ু সংযোগস্থলে রাসায়নিক সঞ্চালন ব্যবস্থার কোনো প্রমাণ নেই। তবে কতগুলি সংবেদী গ্রাহীস্থানে (যথা : স্বাদ ও গন্ধের ইন্দ্রিয়যন্ত্রে) রাসায়নিক গ্রাহীকোষ রয়েছে। এরা প্রধানত শক্তি হস্তান্তরকারী রূপেই কাজ করে। এসিটাইলকোলীন, ডোপামিন ও আরো কিছু সংখ্যক এমিন ও পেপ্‌টাইড জাতীয় রাসায়নিক বস্তু রেটিনা ও স্নায়ুতন্ত্রের অন্যত্র পাওয়া যায়, তবে এরা সিনাপ্‌স্ স্থানে সঞ্চালক রূপে কাজ করে কিনা

সেটা নিশ্চিত নয়। এক্সনের ক্ষেত্রে কেবল Na^+ ও K^+ স্থানান্তরের মাধ্যমেই উত্তেজনার প্রবাহ সৃষ্টি হয়, কিন্তু স্নায়ুকোষের মূলদেহের গাত্রাবরণীতে এটা ব্যতীতও অন্যান্য নির্বাচনমূলক রাসায়নিক যোগাযোগ পথ (পাঁচটি অথবা তারও বেশি) আছে। এসকল পথেও বিশেষ প্রকার রাসায়নিক সঞ্চালন ক্রিয়া সংঘটিত হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

সিনাপ্‌স্ স্থানে ফ্যাসিলিটেশান ও অবনমন : সিনাপ্‌স্ স্থানে উত্তেজনা সঞ্চালনের একটি বিশেষত্ব সেখানে সংকেতের যোগক্রিয়া বা সামেশান (summation)। এক্সনপ্রান্তে আগত সংকেত (অর্থাৎ সক্রিয় বিভব) সংখ্যায় কম হলে এরা পরবর্তী নিউরনকে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু পুনঃপুনঃ আগত (অধিক কম্পাঙ্কের বা বহুস্থান থেকে সমকালীন আগত সক্রিয় বিভবগুলি যোগক্রিয়ার মাধ্যমে সিনাপ্‌স্ স্থানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নির্দিষ্টমানের যোগফল অর্জিত হলেই তা পরবর্তী নিউরনকে উত্তেজিত করে এর মধ্যে সক্রিয় বিভবের সৃষ্টি করতে পারে। একটি এক্সন থেকে আগত সংকেতমালা সিনাপ্‌স্–পরবর্তী নিউরনকে উত্তেজিত করতে অক্ষম হলেও, অনেকগুলি এক্সন থেকে সমকালীন আগত সংকেতমালা যোগক্রিয়ার ফলে পরবর্তী নিউরনে উত্তেজনা সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়। যোগক্রিয়ার প্রভাব স্নায়বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে 'পারস্পরিক সুযোগ' বা 'ফ্যাসিলিটেশান' আনে। ফলে যে উত্তেজনা স্বয়ং দুর্বল ও প্রভাবহীন, তাও অন্যান্য উত্তেজনার সাথে সংযোজিত হয়ে এর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

পারস্পরিক সুযোগ বা ফ্যাসিলিটেশানের বিপরীত অবস্থাটিও মেরুরজ্জু এবং মস্তিষ্কে অত্যন্ত প্রকট। সে অবস্থায় একটি এক্সনের উত্তেজনা অপর একটি নিউরনের উত্তেজনায় সহায়তা না করে এর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ; এতে দ্বিতীয় নিউরনটি অবনমিত বা দমিত হয়ে পড়ে। উত্তেজনা সঞ্চালনের জন্য যেমন রাসায়নিক সঞ্চালক রয়েছে, অবনমনের জন্য গাবা ব্যতীতও অন্য কোনো অবনমনকারী সঞ্চালক আছে বলে মনে করা হয়। তবে অবনমনের কাজটি কোন্ রাসায়নিক সঞ্চালকের মাধ্যমে এবং কোন্ পন্থায় হয়ে থাকে তা বিস্তারিত এখনও জানা সম্ভব হয় নি। মেরুরজ্জুতে বিপরীতমুখী স্নায়বিক যোগাযোগ (৩৬ পৃষ্ঠা দ্র:) যেমন মসৃণভাবে অঙ্গচালনার জন্য অপরিহার্য, মস্তিষ্কেও তেমনি একটি নিউরন দিয়ে অন্য একটি নিউরনকে দমন করা অত্যাবশ্যক। সে কারণেই মস্তিষ্কে অসংখ্য অবনমনকারী স্নায়ুকোষ রয়েছে।

নবম অধ্যায়

মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভব

স্বাভাবিক অবস্থায় মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক বিভবের একটি পশ্চাদ্‌ভূমি রয়েছে। করোটির বাইরে মাথার ত্বকের উপরে বিভিন্ন স্থানে সংবেদনশীল ইলেকট্রোড স্থাপন করে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভবটি রেকর্ড করা যায়। বিভবটি অতি ক্ষীণ ; একে শক্তিশালী এমপ্লিফাইয়ার (বৃদ্ধিকারী) যন্ত্রের সাহায্যে বর্ধিত করে যে রেকর্ড করা যায়, তাকে ইলেকট্রো–এনকেফালোগ্রাফ বা ই. ই. জি. (EEG) বলা হয়। করোটির অন্তরালে সরাসরি কর্টেক্সের উপরে ইলেকট্রোড স্থাপন করে যে বৈদ্যুতিক বিভব রেকর্ড করা হয়, তাকে কর্টিওগ্রাফ বলে। মূলত এনকেফালোগ্রাফ ও কর্টিওগ্রাফ দেখতে একই রকম।

এনকেফালোগ্রাফ দ্বিমেরুজাত (bipolar) বা একমেরুজাত (unipolar) হতে পারে। প্রথমটির ক্ষেত্রে দুটি ইলেকট্রোড শিরস্ত্রকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করে দুটি স্থানের বৈদ্যুতিক বিভবের তারতম্য রেকর্ড করা হয়। অপর ক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রোড শিরস্ত্রকের কোনো স্থানে ও অন্যটি মস্তিষ্ক থেকে দূরে দেহের অন্যত্র স্থাপন করা হয়।

সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থায় অথবা নিদ্রার সময়ও এনকেফালোগ্রাফ রেকর্ড করা যায়। তবে গভীর অচেতন অবস্থায় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভব যন্ত্রে ধরা পড়ে না। জাগ্রত অবস্থায় বৈদ্যুতিক বিভবটি নিয়মিত কমবেশি হয়ে তরঙ্গের মতো স্পন্দনের নির্দেশ দেয়। করোটির বিভিন্ন স্থানে ইলেকট্রোড স্থাপন করলে এনকেফালোগ্রাফে নানান আকৃতি ও স্পন্দন ধরা পড়ে।

আগে মনে করা হতো যে মস্তিষ্কের অসংখ্য স্নায়ুকোষের স্থির ও সক্রিয় বিভবগুলি সম্মিলিত হয়েই মস্তিষ্কের একটি সামগ্রিক বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টি করে এবং সেটিই এনকেফালোগ্রাফে ধরা পড়ে। নূতনতর প্রমাণাদির ভিত্তিতে এখন মনে করা হয় যে এনকেফালোগ্রাফে বৈদ্যুতিক বিভবের যে স্পন্দন ও তারতম্য ধরা পড়ে তা মূলত কর্টেক্সে সৃষ্ট অসংখ্য ডাইপোলের (dipole) মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ওঠানামার জন্যই হয়ে থাকে। কর্টেক্সের স্নায়ুকোষগুলির ডেনড্রাইট ও মূল দেহের মাধ্যমে ডাইপোলের সৃষ্টি হয়। ডেনড্রাইটগুলি ঘন জালের মতো সেরিব্রেল কর্টেক্সের উপর স্তরে অবস্থিত এবং তারা স্থানীয় বৈদ্যুতিক বিভব ধারণ করে। স্নায়ুকোষের মূলদেহের সাথে ডেনড্রাইটগুলির সম্পর্ক একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল অস্থির ডাইপোলের মতো।

এনকেফালোগ্রাফে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তরঙ্গ : শান্ত ও চক্ষু বন্ধ অবস্থায় একজন বয়স্ক ব্যক্তির এনকেফালোগ্রাফে আলফা (α) তরঙ্গ প্রকট। এটা সেকেন্ডে ১০/১২ বার ওঠানামা করে এবং

এর বিভবমান প্রায় ৫০ μv (মাইক্রোভোল্ট বা μv = ১০$^{-৬}$ ভোল্ট)। দৃষ্টি সংক্রান্ত কর্টেক্সের উত্তেজনার সাথে আলফা তরঙ্গের সম্পর্ক রয়েছে। তীব্র আলোকে চোখ খোলা থাকলে অথবা কোনো বস্তুর উপরে দৃষ্টি একাগ্রভাবে সন্নিবিষ্ট হলে, আলফা তরঙ্গগুলি ম্রিয়মান বা লুপ্ত হয়ে যায়। দ্রুত অঙ্গচালনা বা মনোযোগের সাথে অঙ্ক কষার সময়ও আলফা তরঙ্গ লুপ্ত হয়ে যায়।

বিটা (β) তরঙ্গগুলি কম শক্তিশালী কিন্তু এদের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্কের মাত্রা আলফা তরঙ্গের তুলনায় বেশি (সেকেন্ডে ১৫–৩০ বার)। আলফা তরঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেলে এর স্থানে বিটা তরঙ্গগুলি প্রকট হয়ে উঠে ও তা যন্ত্রে ধরা পড়ে। বিটা তরঙ্গগুলির প্রধানত সেরিব্রেল কর্টেক্সের সম্মুখভাগেই দেখা যায়। গভীর নিদ্রার সময় মন্থর ডেল্টা (δ) তরঙ্গ দেখা যায়। এদের ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ৪/৫ বার। মস্তিষ্কের কোনো কোনো রোগেও ডেলটা তরঙ্গ দেখা যায়।

এনকেফালোগ্রাফের তাৎপর্য : মানসিক সতর্কতা, ভাবাবেগ ও দৈহিক পরিবর্তনাদির সাথে এনকেফালোগ্রাফের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মানসিক প্রভাবক নানা ওষুধও এনকেফালোগ্রাফে পরিবর্তন সৃষ্টি করে। তবে এনকেফালোগ্রাফের পূর্ণ তাৎপর্য ও মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালির সাথে এর কার্য-কারণ সম্পর্ক এখনও বহুলাংশে অজ্ঞাত। মস্তিষ্কের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রাণিদেহে যত সহজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় মানুষের দেহে তা সম্ভব নয়। সুস্থ মানুষের দেহে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালির গতীয় নির্দেশকরূপে এনকেফালোগ্রাফ রেকর্ড করা একটি সহজপন্থা, কিন্তু এক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্বন্ধ ততো সুস্পষ্ট নয়।

এনকেফালোগ্রাফ বিশ্লেষণ করে মস্তিষ্কের কোনো কোনো রোগ নির্ণয় ও শ্রেণীবদ্ধ করা যায় (যথা : মস্তিষ্কের টিউমার, ইপিলেপসী বা মৃগী রোগ, ইত্যাদি)। মানুষের আচরণিক পরিবর্তনের সাথেও এনকেফালোগ্রাফের সম্পর্ক রয়েছে। এনকেফালোগ্রাফের সাহায্যে মানসিক প্রভাবক ওষুধগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়, নূতন ওষুধের গুণাগুণ ও প্রভাব নির্ণয় করা যায় এবং মানসিক ব্যধির কারণে মস্তিষ্কে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটা নিরূপণ করা যায়। তবুও এটা স্বীকার করতেই হয় যে মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এনকেফালোগ্রাফী বা কর্টিওগ্রাফী এখনও একটা বিশ্বস্ত ও ফলদায়ক পন্থারূপে প্রমাণিত হয় নি।

মস্তিষ্কে অসংখ্য নিউরোনের মধ্যে সবসময় যে স্নায়বিক উত্তেজনার অবস্থাটি বিদ্যমান, তার সামগ্রিক যোগফলটি মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভবরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। অনেক কটি বাদ্যযন্ত্রের যৌথ সমন্বয়ে যখন একটি সিম্ফোনী অর্কেস্ট্রা বাজতে থাকে, তখন ঐকতানের সকল ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি অসিলোস্কোপের পর্দায় প্রবাহমান একটি মিশ্র ঢেউরূপে ধরে রাখা যায়। বাদ্যযন্ত্রগুলি আলাদা আলাদাভাবে পূর্বপরিচিত না হলে, কেবল মিশ্র ঢেউটি দেখে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রকৃতি বা ক্রিয়াকলাপ কিছুই বোঝা যায় না। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভবটিও বহু মূলগত কার্যকলাপের একটি মিশ্র প্রতিফলন। এনকেফালোগ্রাফের তরঙ্গগুলি মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে ততটুকুই ধারণা দেয়, যতটুকু একটি বিশেষ ধ্বনি একটি বন্দুকের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

দশম অধ্যায়

নিয়ন্ত্রণের মূলকথা

গতিময় ব্যবস্থা : কোনো প্রণালিবদ্ধ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তনশীল বিভিন্ন প্রক্রিয়া থাকলে, ব্যবস্থাটি গতিময় হয়ে ওঠে। যে ব্যবস্থায় পরিমাণগত বা গুণগত কোনো পরিবর্তন হয় না, তা একটি আবদ্ধ ব্যবস্থা। যে-কোনো মুহূর্তে একটি গতিময় ব্যবস্থার গুণাগুণ, কতগুলি পরিবর্তনশীল পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। কোনো একটি সাধারণ চৌবাচ্চায় একটি আগমন ও অন্য একটি নির্গমন পথ রয়েছে। পথ দুইটিই স্থায়ীভাবে বন্ধ থাকলে, চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণ স্থায়ী থাকে এবং একটি আবদ্ধ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আগমন ও নির্গমন পথ দুটিই খোলা থাকলে একটি গতিময় ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। আগমন ও নির্গমন অনির্দিষ্ট বা নিয়ত পরিবর্তনশীল হলে, চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণ সবসময় ওঠানামা করতে থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত চৌবাচ্চায় পানির পরিমাণে স্থিরাবস্থা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্যকথায়, বলা যায় যে, কোনো গতিময় ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থানগুলির মধ্যে কোনো একটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থান রক্ষা করতে হলে নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

সামান্য একটি বা দুটি পরিমাণ পরিবর্তনশীল হলে এবং প্রক্রিয়া অভিন্ন হলে নিয়ন্ত্রণ সহজতর। কিন্তু গতিময় ব্যবস্থাটিতে বিভিন্ন প্রণালিতে কার্যরত বহু সক্রিয় অংশ থাকলে নিয়ন্ত্রণ ততো সহজ নয়। অংশগুলির সম্মিলিত কাজের জন্য ওদেরকে একই সূত্রে আবদ্ধ করতে হবে। এরূপক্ষেত্রে পুরো ব্যবস্থাটি সুপরিচালনের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক।

নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য : গতিময় ব্যবস্থায় প্রতিটি সক্রিয় অংশের কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত না হলে অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অংশগুলির পারস্পরিক সুসম্পর্ক রক্ষিত হলে একটি অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থা বা স্টেডি-স্টেট সৃষ্টি হতে পারে। পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াগুলির প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ পূর্বনির্ধারিত মাত্রায় সক্রিয় থাকলে ওদের অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থা রক্ষিত হয়। এজন্যেই অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থাটিকে 'গতিময় স্থিরাবস্থা' বা 'গতিময় সাম্যাবস্থা' (dynamic equilibrium) বলা হয়। পরিবর্তনশীল মাত্রাগুলির নির্ধারণ যুগপৎ হলে পুরো ব্যবস্থাটির গতিময় স্থিরাবস্থা রক্ষা করা যেতে পারে। এটাও দেখা যায় যে গতিময় স্থিরাবস্থা রক্ষা করতে হলে বিভিন্ন মাত্রাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

গতিময় ব্যবস্থাটির একটি নিজস্ব আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ব্যবস্থাটির বাইরের প্রতিবেশ। ব্যবস্থাটি প্রতিবেশের সাথে নানারকম আগমন-নির্গমণ পথে

সংযুক্ত থাকলে প্রতিবেশের সাথে সাম্যাবস্থা রক্ষা ব্যতীত ব্যবস্থাটির গতিময় স্থিরাবস্থা সংরক্ষণ সম্ভবপর নয়। প্রতিবেশের প্রভাব অংশগুলিকে ওদের পূর্বনির্ধারিত স্থিরাবস্থা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তখন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অংশগুলিকে পুনরায় পূর্বনির্ধারিত স্থিরাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবে, কারণ স্থিরাবস্থাটির রক্ষণ ও স্থিতিশীলতাই নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য। তবে পূর্বনির্ধারিত স্থিরাবস্থাটি যদি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সুনির্দিষ্ট হয়, তখন পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সাথে সাম্যাবস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, নিয়ন্ত্রণ অংশগুলিকে দৃঢ়রূপে একই স্থানে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও, প্রতিবেশের প্রভাব ওদেরকে স্থির রাখবে না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবেশের সাথে নমনীয়ভাবে সাম্যাবস্থা অর্জন ব্যতীত নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

সুতরাং পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াসমূহের মাত্রা মোটামুটি পূর্বনির্ধারিত হলেও, দৃঢ়ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে পূর্বনির্ধারিত হবার অবকাশ নেই। ওদেরকে বিশেষ সীমানার মধ্যে পূর্বনির্ধারিত করা যায়। যতক্ষণ প্রক্রিয়াগুলি ওদের নির্ধারিত নিজ নিজ সীমানার মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ দৃঢ় ও আদর্শ না হলেও, মোটামুটি ব্যবস্থাটির অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থা রক্ষিত হবে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তখন প্রক্রিয়াগুলিকে কমেবেশি করে পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সাথে অভিযোজন (adaptation) করতে পারে। এতে অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থাও রক্ষিত হয়, আবার প্রতিবেশের সাথে সাম্যাবস্থাও রক্ষিত হয়। এরূপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যবস্থাটি প্রতিবেশের সাথে গতিময় সাম্যাবস্থা অর্জন করতে পারে। গতিময় সাম্যাবস্থা অর্জনে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য—পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সাথে সাম্যাবস্থা রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিকে ওদের নিজ নিজ পূর্বনির্ধারিত সীমানার মধ্যে কমবেশি করে, অভ্যন্তরীণ গতিময় স্থিরাবস্থা সংরক্ষণ।

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : নিয়ন্ত্রণের কাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থার মধ্যে, কোনো একটিকে নির্ধারণ বা নির্বাচন করার প্রয়োজন অবধারিত। যে ক্ষেত্রে গ্রহণীয় পন্থা কেবল একটি, সেখানে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই উঠে না (যথা : আবদ্ধ ব্যবস্থায়)। যে ক্ষেত্রে একাধিক উন্মুক্ত বা গতিময় ব্যবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাব্য গতিময় ব্যবস্থাগুলির মাত্রা সুনির্ধারণ করাই নিয়ন্ত্রণের সমস্যা। এই কাজের জন্য নানা প্রকার নির্ধারক যন্ত্র (মডুলেটর বা সিলেক্টর) অত্যাবশ্যক। নির্ধারক যন্ত্রগুলি একদিকে যেমন নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করে, অন্যদিকে তেমনই নানা প্রক্রিয়ার উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণ করে।

নির্ধারণ কাজের জন্য মাপকাঠি ও মাত্রার প্রয়োজন। মাত্রা সম্পূর্ণ পূর্বনির্ধারিত হলে নিয়ন্ত্রণে নমনীয়তা (flexibility) থাকে না এবং গতিময় সাম্যাবস্থা রক্ষার সমস্যাটি থেকে যায়। নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাটির সাক্ষাৎ অবস্থান, পরিস্থিতি ও ফলাফলের উপরে নির্ভর করে একটানা ও অবিরাম নির্ধারণ কাজটি সংঘটিত হলে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পুরো গতিময় ব্যবস্থাটির প্রক্রিয়াগুলির ফলাফলের বার্তা পুনরায় নির্ধারক যন্ত্রে প্রেরণ করা হয়। এরূপ বার্তাকে উপাবৃত্ত বার্তা বা ফিড-ব্যাক বলা হয়। উপাবৃত্ত বার্তার উপরে নির্ভর করে সূক্ষ্ম ও গতিময় নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর। গতিময় প্রক্রিয়াগুলির ফলাফল, প্রতিবেশের প্রভাব ও নানা আভ্যন্তরিক গোলযোগের প্রভাব, উপাবৃত্ত বার্তার মাধ্যমে নির্ধারক যন্ত্রটিতে আনীত হয়। উপাবৃত্ত বার্তা সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটির পরিস্থিতি ও

প্রক্রিয়াগুলির ফলাফল জ্ঞাপন করে বলে এর উপরে স্বয়ংক্রিয় নির্ধারক যন্ত্রটি নির্ভর করতে পারে।

থার্মোস্ট্যাট যন্ত্র একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। এতে একটি বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র (হিটার) আছে। অন্য একটি অংশ পাত্রে তরল পদার্থ কতটুকু উত্তপ্ত এর বার্তা সংগ্রহ করে। তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে হিটারটিকে অন (সক্রিয়) অথবা অফ (নিষ্ক্রিয়) করার ব্যবস্থা আছে। যে-কোনো মুহূর্তে পাত্রের তরল পদার্থের উত্তাপের পরিমাণ সংক্রান্ত বার্তাই যন্ত্রটির উপাবৃত্ত বার্তা। তাপ নির্দিষ্টমানের উপরে ওঠার উপক্রম হলেই হিটারটি অফ হয়ে যায় এবং তাপ সেই নির্দিষ্টমানের নিচে গেলেই হিটারটি অন হয়ে যায়। থার্মোস্ট্যাটের একটি তৃতীয় অংশ, একটি ঘূর্ণমান বৈদ্যুতিক পাখা, যা পাত্রের তরল পদার্থকে মিশ্রণ করে সর্বত্র একই তাপ রক্ষা করে। সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি এরূপভাবে নির্মিত যে পাত্রের তরল পদার্থকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যে-কোনো একটি বিশেষ তাপমাত্রায় (যথা : ৩৭ ± ০.০৫°C) স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্ষা করা সম্ভব। এখানে লক্ষ্য করার একটি বিষয় এই যে, যত নিখুঁতই হোক না কেন, থার্মোস্ট্যাট যন্ত্র দিয়ে একটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (যথা : ৩৭.০০°C) রক্ষা করা সম্ভব নয় ; অতি অল্প সীমানার মধ্যে (যথা : ± ০.০৫°C) হলেও তাপমাত্রাটি কিছুটা ওঠানামা করবে।

প্রাণীদেহে গতিময় সাম্যাবস্থা : নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের সাথে সাম্যাবস্থা রক্ষা করা ব্যতীত কোনো প্রাণীর জীবনধারণ করা সম্ভবপর নয়। এই সাম্যাবস্থা রক্ষার জন্য প্রাণীকে এর দেহের কার্যপ্রক্রিয়া ও সামগ্রিক আচরণ কমেবেশি নিয়ন্ত্রণ করে চলতে হয়। প্রাণীরা একদিকে যেমন দেহের প্রক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে উন্নত প্রাণীরা তার প্রতিবেশকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রতিবেশকে পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করা যতো কঠিন বলে মনে হয়, তা ততো কঠিন নয়। একটি ব্যাঙ যখন লাফ দিয়ে পুকুরের পাড় থেকে পানিতে পড়ে, তখন সে তার পুরো প্রতিবেশ পরিবর্তন করেছে। কঠিন ভূমি থেকে তার প্রতিবেশ এখন তরল জলের প্রতিবেশে পরিণত হয়েছে এবং প্রাণীটিও ভূমিচর অন্যান্য প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উন্নত প্রাণীদের দেহে, মস্তিষ্ক গতিময় সাম্যাবস্থা রক্ষার কাজে নিযুক্ত। প্রতিবেশের পরিবর্তনের ফলে দেহে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা মস্তিষ্কের হস্তক্ষেপের ফলেই সংঘটিত হয়। দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যে গতিময় সাম্যাবস্থা রয়েছে, প্রতিবেশের পরিবর্তন হলে সে সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। বড় পরিবর্তন হলে সাম্যাবস্থাটি সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্ক দেহযন্ত্রগুলির কার্যপ্রণালির মধ্যে অথবা প্রতিবেশের মধ্যে পরিবর্তন এনে পূর্বনির্ধারিত সাম্যাবস্থাটিতে ফিরে যায়। সেটি একান্তই সম্ভব না হলে, মস্তিষ্ক দেহটিকে একটি নূতনতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাম্যাবস্থা অর্জনে সহায়তা করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন বাইরের তাপ হঠাৎ কমে যায়, তখন উষ্ণ রক্তবাহী প্রাণীদেহে অধিকতর তাপের প্রয়োজন হয়। তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তখন এভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে যে, দেহে অধিকতরো তাপ সৃষ্টি হয় ও দেহ থেকে পূর্বাপেক্ষা কম তাপ বিকিরণ হয়।

অন্যদিকে প্রাণীটি উষ্ণতর প্রতিবেশের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, দেহে উষ্ণ পোশাক ধারণ করতে পারে, এমন কি প্রতিবেশকে শীততাপ নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। এরকম সরাসরি

বেদনাদায়ক অনুভূতি বা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রাণীরা সেই অনুভূতি বা পরিস্থিতির উৎস থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখতে বা উৎসটিকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। প্রাণীদের এসব আচরণ মস্তিষ্কই নির্ধারণ করে। প্রতিবেশের সাথে সাম্যাবস্থা রক্ষার জন্য মস্তিষ্ক সবসময় সজাগ ও সক্রিয় থাকে। তবে সাম্যাবস্থা রক্ষার কাজে মস্তিষ্কের ক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অচেতন বা অবচেতন স্তরে সংঘটিত হয় এবং প্রাণীর চেতন স্তরে তা পরিস্ফুট হয় না।

বহুদিনব্যাপী অস্বাভাবিক প্রতিবেশিক প্রভাব বিদ্যমান থাকলে, কোনো একটি প্রধান প্রক্রিয়ার পরিমাপে সাম্যাবস্থা রক্ষা করতে গিয়ে অন্য অন্যান্য প্রক্রিয়ার সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত বা ছিন্ন হতে পারে। প্রতিবেশের প্রভাবে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি ও এর ফলে দেহে পরবর্তী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে এরকম বিপর্যয় সম্পর্কে কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সাম্যাবস্থা রক্ষায় দেহের অংশ বিশেষের অতিক্রিয়া বা বিকল অবস্থা দেহে নানা দুরারোগ্য ব্যধি সৃষ্টি করতে পারে। রক্তচাপবৃদ্ধি, ডায়েবিটিস ম্যালিটাস (বহুমূত্র), এস্থমা (হাঁপানি), কোলাইটিস (বৃহদন্ত্রের প্রদাহ), ইত্যাদি বহু রোগের মূল কারণ দেহের গতিময় সাম্যাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপর্যয়।

একাদশ অধ্যায়

যোগাযোগ ব্যবস্থা

স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালি আলোচনা করার সময় প্রায়ই যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যতীত বৃহৎ প্রণালিবদ্ধ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং কি বিষয়ে যোগাযোগ? নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংবাদ বা বার্তা বিনিময়ের জন্যই যোগাযোগ অত্যাবশ্যক। যোগাযোগ বলতে এক্ষেত্রে সংবাদ বিনিময়ের ব্যবস্থার কথাই বলা হচ্ছে।

সংবাদ প্রবাহের ধারা : প্রাণীদেহ একটি বিশাল ও জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো এবং প্রতিবেশের সাথে নানাভাবে সংযুক্ত। এরা একে অন্যের উপরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে এবং এদেরকে একটি সংযুক্ত ব্যবস্থা বলে ধরা যায়। প্রাণীদেহের প্রায় সব পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াগুলোই প্রতিবেশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। গতিময় সাম্যাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার জন্যই নির্দিষ্ট গণ্ডী রয়েছে। অর্থাৎ কোনো প্রক্রিয়ার কার্যমাত্রায় একটি উর্ধ্বসীমা ও একটি নিম্নসীমা রয়েছে। প্রক্রিয়াগুলির কার্যমাত্রা তাদের স্বাভাবিক সীমানার মধ্যে রয়েছে কিনা, তা প্রাণীটির জন্য ও সমগ্র সংযুক্ত ব্যবস্থাটির জন্য একটি মূল্যবান তথ্য।

মস্তিষ্ক দেহের প্রধান নির্ধারক বা মডুলেটর যন্ত্রগুলি ধারণ করে। প্রতিবেশের সংবাদ সেখানে আনার জন্য ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহীস্থান ও সংবেদী স্নায়ুপথ রয়েছে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণের বার্তা গতি সঞ্চালক বা ইফেক্টর যন্ত্রগুলোর নিকট প্রেরণ করার জন্য রয়েছে বহির্মুখী মোটর স্নায়ুপথ। নির্ধারক যন্ত্রের অনুশাসন এই বহির্মুখী বার্তার মাধ্যমেই দেহের সর্বত্র বিস্তৃত হয়। একটি তৃতীয় যোগপথ নিয়ন্ত্রণের ফলাফল ও প্রক্রিয়াগুলির পরিস্থিতি সংক্রান্ত উপাবৃত্ত বার্তা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় মডুলেটর যন্ত্রে প্রেরণ করে। উপাবৃত্ত বার্তার এই চক্রটি দেহের পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াগুলির কার্যমাত্রার সংবাদ বহন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা প্রক্রিয়াগুলির সাথে যুক্ত পরিবর্তনশীল সংবেদী অনুভূতির (যথা : বেদনার অনুভূতি) বার্তাও গ্রহণ করে। প্রক্রিয়াগুলির ফলাফল স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রয়েছে কিনা এবং কোন স্থানে অবস্থান করছে তার সংবাদ উপাবৃত্ত পথেই মডুলেটর যন্ত্রে গমন করে (চিত্র ১১.১ দ্র:)।

স্নায়বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংবাদ প্রবাহের ধারা ১১.১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এটি দেহে স্নায়বিক যোগাযোগের একটি মৌলিক কাঠামো। মোটর ও ইফেকটর যন্ত্রগুলির ক্রিয়া যান্ত্রিক হোক বা রাসায়নিক হোক, ওদের চালনা করার শক্তি অন্যস্থান থেকে আসে। স্নায়বিক সংকেত তাদেরকে শক্তি সরবরাহ করে না, বরং ওদের অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতার মাত্রায় তারতম্য সৃষ্টি করে।

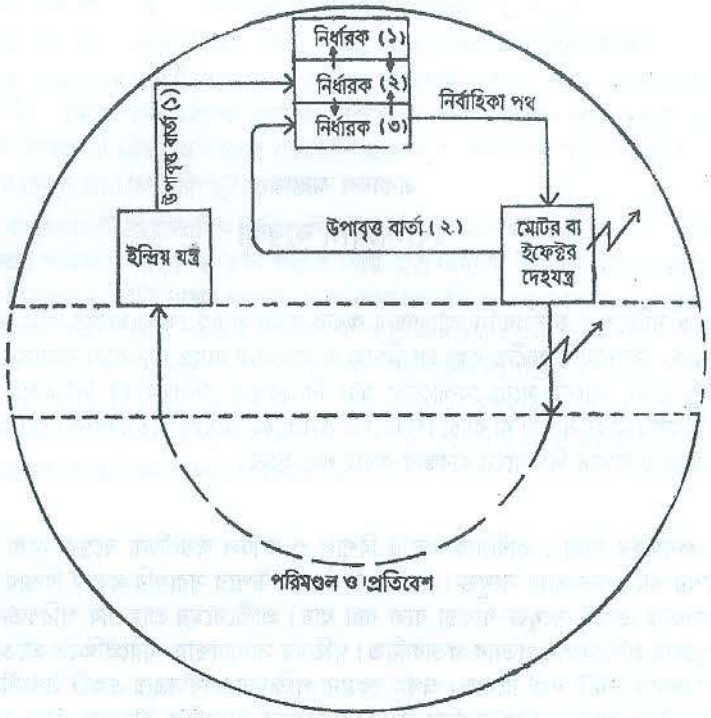

চিত্র ১১.১ : প্রাণীদেহে সংবাদ প্রবাহের ধারা ও প্রাণীদেহের সাথে পারিপার্শ্বিকতার গতিময় সাম্যাবস্থা (গ্রন্থাংশ দ্রষ্টব্য)।

সংকেত প্রণালি : কোনো প্রবাহমান ঘটনার ধারাবাহিক সংবাদ একস্থান থেকে দূরবর্তী অন্যস্থানে প্রেরণ করতে হলে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোন না কোন সংকেত প্রণালি থাকতে হবে। যে কোনো প্রতীক চিহ্নকেই সংকেত চিহ্নরূপে ব্যবহার করা যায় কিন্তু প্রশ্ন হলো কতগুলি সংকেত চিহ্ন থাকবে এবং কী উপায়ে ওদেরকে বিশ্বস্তরূপে একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা যাবে। সংকেত প্রণালিতে যত অধিক সংখ্যক চিহ্ন থাকবে, যোগাযোগে ততই অধিক জটিলতা ও গোলযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। অধিক সংখ্যক সংকেত চিহ্ন থাকলে ওদের প্রণালিবদ্ধ করাও কষ্টসাধ্য। আমরা লিখিত ভাষায় বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণ ও সংখ্যার জন্য দশটি (০ হতে ৯ পর্যন্ত) মৌলিক সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করি। ওদের প্রণালিবদ্ধভাবে সাজিয়ে নানা ভাব ও সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। কিন্তু দ্রুত ও বিশ্বস্ত উপায়ে সংবাদ প্রেরণের জন্য দশটি চিহ্নও অনেক বেশী।

সহজতম ও সংক্ষিপ্ততম সংকেত চিহ্ন কেবলমাত্র দুটি। শুধু দুটি সংকেত চিহ্নের উপর ভিত্তি করে প্রকৃতপক্ষে যে-কোনো সংবাদ বিশ্বস্তরূপে একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা

যায়। এরূপ সংকেত প্রণালিকে দ্বিমাত্রিক প্রণালি (বা বাইনারী কোডিং) বলা হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটাই সহজতম ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সংকেত প্রণালি। বিশেষত, বৈদ্যুতিক উপায়ে বার্তা সঞ্চালনের জন্য দ্বিমাত্রিক সংকেত প্রণালি কার্যগত ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে অতুলনীয়।

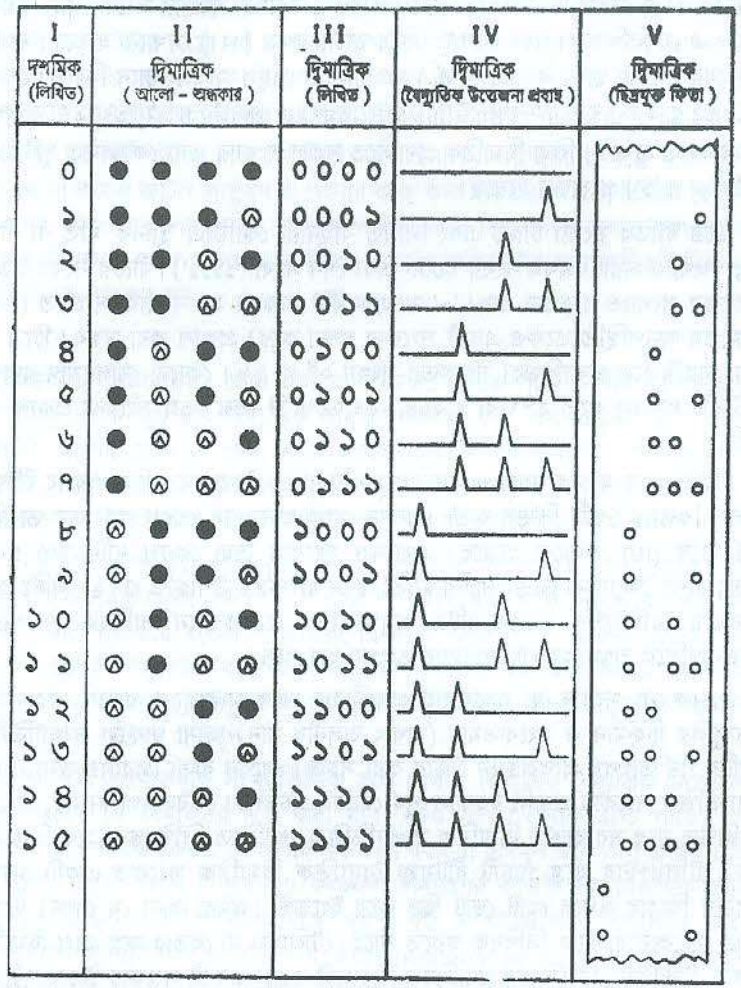

চিত্র ১১.২ : দশমিক ও দ্বিমাত্রিক সংকেত প্রণালি।

দ্বিমাত্রিক সংকেত প্রণালি : ১১.২ নং চিত্রে প্রথম স্তম্ভে (I) ০ হতে ১৫ পর্যন্ত ১৬টি সংখ্যা উপর থেকে নীচে পরপর সাজানো আছে। প্রত্যেকটি সংখ্যা এক একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংকেত। এদের প্রকাশ করার জন্য দশমিক পদ্ধতিতে দশটি সংকেত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়

স্তম্ভে (।।) চারটি বাতির একটি সারি আছে। বাতিগুলিকে জ্বালিয়ে অথবা নিবিয়ে (অর্থাৎ কেবলমাত্র আলো ও অন্ধকার এই দুটি চিহ্ন ব্যবহার করে) ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন সংকেত প্রকাশ করা হয়েছে। বাতি জ্বালানোর বা নিবানোর প্রক্রিয়াটি প্রণালিবদ্ধ এবং যে ১৬টি সংকেত চিত্রে প্রকাশ করা হয়েছে তারাও একে অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। বাতি জ্বলার চিহ্নটিকে '১' ও নেবার চিহ্নটিকে '০' ধরলে পরিচিত দশমিক সংখ্যার সংকেতগুলি বাইনারী কোডিং-এ যে লিখিতরূপ গ্রহণ করে তা চিত্রে তৃতীয় স্তম্ভে (।।।) দেখানো হয়েছে। দশমিক চিহ্নে যেরূপ দশক স্থানে বিরতি, দ্বিমাত্রিক প্রণালিতে সেরূপ '২' এর স্থানে বিরতি। সেজন্য দশমিকের $১০^১$, $১০^২$, $১০^৩$ ইত্যাদি চিহ্নগুলি দ্বিমাত্রিক প্রণালিতে $২^১$, $২^২$, $২^৩$ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দ্বিমাত্রিক প্রণালিতে সকল সংখ্যার জন্য কেবলমাত্র দুটি চিহ্নই (অর্থাৎ '০' ও '১') প্রয়োজন হয়েছে।

চিত্রে বাতির সংখ্যা চারটি এবং লিখিত বাইনারী কোডিংএ স্থানিক যতি বা বীটের (Bits) সংখ্যাও চারটি (প্রথম সংখ্যা '০০০০' এবং শেষ সংখ্যা '১১১১')। বীটের সংখ্যা বাড়ালে সংকেতের সংখ্যাও বাড়ানো যায়। 'x' সংখ্যক বীট থাকলে ২^x সংখ্যক সংকেত ('০' বা সংকেতের অনুপস্থিতিতেকেও একটি সংকেত গণনা করে) প্রকাশ করা সম্ভব। চিত্রে বীট সংখ্যা চারটি বলে প্রকাশিতব্য সংকেতর সংখ্যা $২^৪$ বা ১৬। কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থায় ৩২টি বীট থাকলে ওতে $২^{৩২}$ বা ৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৬ টি ভিন্ন ভিন্ন সংকেত প্রকাশ করা সম্ভব।

চারটি একক মানের সহজ ও সমভারযুক্ত বৈদ্যুতিক উত্তেজনার চিহ্ন পরপর বীটরূপে সাজিয়ে কিভাবে ১৬টি বিভিন্ন বার্তা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা যায় তা চিত্রে চতুর্থ স্তম্ভে (IV) দেখানো হয়েছে। এখানেও সংকেত চিহ্ন কেবল দুটি, যথা : (১) সমভাববিশিষ্ট বৈদ্যুতিক উত্তেজনাটির নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে উপস্থিতি ও (২) নির্দিষ্ট স্থানে বা সময়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তেজনাটির অনুপস্থিতি। প্রাপকস্থানে সারিবদ্ধ ও পরপর উত্তেজনাগুলিকে লক্ষ্য করলেই সংবাদের তাৎপর্য ধরা পড়ে।

যে-কোনো সংবাদ বা বার্তাকেই প্রণালিবদ্ধ সংখ্যামালারূপে প্রকাশ করা যায়। সংখ্যাগুলির চিহ্নমান ও সংকেতমান (অর্থাৎ তুলনীয় মান) জানা থাকলে সংখ্যাভিত্তিক বার্তাটির পূর্ণ তাৎপর্য প্রাপকস্থানে উদ্ধার করা সহজ। গোপন বার্তা প্রেরণের জন্য গোপন সংখ্যাভিত্তিক সংকেত প্রণালি বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রচলিত। কেবল গোপন নয়, সাধারণ টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রে সব বার্তাই দ্বিমাত্রিক সংখ্যাভিত্তিক প্রণালিতে লিপিবদ্ধ ও সঞ্চালিত হয়ে থাকে। টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রে পাঁচটি বীটযুক্ত বৈদ্যুতিক দ্বিমাত্রিক সংকেত একটি চলমান কাগজের ফিতার উপরে ছোট ছোট ছিদ্র করে ইংরেজী (অথবা অন্য যে কোন) ভাষায় লিখিত যে কোন বার্তাকে লিপিবদ্ধ করতে পারে। টেলিগ্রাফ বা বেতার যন্ত্রে প্রাপ্ত দ্বিমাত্রিক সংকেত টেলিপ্রিন্টারের ফিতায় প্রণালিবদ্ধ ছিদ্র সৃষ্টি করে। একটি সংকেত উদ্ধারকারী (বা ডিকোডিং) টাইপরাইটিং যন্ত্রে ফিতার বার্তাটি পরিচিত ভাষার আকারে মুদ্রিত হয়ে বের হয় এবং সেটিই টেলিগ্রাম বা তারবার্তা হিসাবে বিলি করা হয়। ১১.২ নং চিত্রে পঞ্চম স্তম্ভে (V) টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রের ফিতায় ১৮টি বিভিন্ন সংকেত লিপিবদ্ধ দেখানো হয়েছে। এরা বর্ণমালার ১৮টি বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। পাঁচটি ছিদ্রের ব্যবস্থা থাকলে ৩২টি ভিন্ন ভিন্ন

সংকেত বা সব বর্ণগুলোকেই প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা সম্ভব। (প্রকৃত টেলিপ্রিন্টার ফিতায় পাঁচটি ছিদ্রের মাঝামাঝি অতি ছোট ছোট অবিরাম ছিদ্রের সারিটি, যন্ত্রে ফিতাটিকে চালন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।)

বর্তমান কালের ছোট বড় নানা কম্পিউটার বা হিসাবযন্ত্রে সংকেত প্রণালি বাইনারী কোডিং ভিত্তিক। কম্পিউটারকে 'ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। ডিজিটেল কম্পিউটার যন্ত্রে সব বার্তাকে দ্বিমাত্রিক উপায়ে সংখ্যাবদ্ধ করে ওদের মধ্যে হিসাবের কাজ বা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। দ্বিমাত্রিক সংকেত বৈদ্যুতিক উপায়ে কম্পিউটার যন্ত্রে সঞ্চালিত হয় বলে এরূপ যন্ত্রে গণনা বা বিশ্লেষণ অতিদ্রুত সম্পন্ন হয়।

কিন্তু সব কম্পিউটার সংখ্যাভিত্তিক নয়। এনালগ কম্পিউটার যন্ত্রে বার্তাগুলিকে সংখ্যাবদ্ধ না করেও জটিল বিশ্লেষণ বা গোনার কাজ কার যায়। এরূপ যন্ত্রে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পরিমাণের অনুপাতকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কবদ্ধ করে বিশ্লেষণ বা তুলনা করা হয় এবং ফলাফল নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এনালগ কম্পিউটার যন্ত্রে প্রতীকভিত্তিক নানা সিমুলেটর যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

প্রতীকভিত্তিক সিমুলেটর : কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পরিবর্তনশীল পরিমাণগুলোর জন্য সমানুপাতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। প্রক্রিয়াটিতে কার্যরত শক্তিগুলি যেরূপই হোক না কেন, শক্তি হস্তান্তরকারী যন্ত্রের সাহায্যে ওদের পরিমাণের তারতম্য সংক্রান্ত সব সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। সংবাদগুলি বৈদ্যুতিক উত্তেজনা বা সংকেতরূপে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। এরা ঘটনাপ্রবাহের প্রতীকভিত্তিক মৌলিক সংবাদ।

ঘটনাটিতে প্রাথমিক শক্তিগুলি যে যে সম্পর্কে সম্পর্কবদ্ধ, সিমুলেটর যন্ত্রেও প্রতীকভিত্তিক সংকেতগুলি ঠিক সেই সম্পর্কে সম্পর্কবদ্ধ হয়। ফলে সিমুলেটর যন্ত্রটি প্রকৃত ঘটনার একটি ক্ষুদ্রাকার মডেল বা প্রতিরূপের মতো কাজ করে। প্রক্রিয়াগুলোর সামান্য ব্যতিক্রম হলেই সিমুলেটর যন্ত্রে এর অভিক্ষেপ নিক্ষিপ্ত হয় এবং ওদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সিমুলেটর যন্ত্রে সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আদর্শ সিমুলেটর যন্ত্র ঘটনার একটি নিখুঁত ও গতিময় প্রতিরূপ।

প্রতীকধর্মী সংকেতগুলি সংখ্যাভিত্তিক হলে (যথা : দ্বিমাত্রিক বৈদ্যুতিক উত্তেজনা), ওদের সমন্বয়ে যে সিমুলেটর সৃষ্টি করা যায়, তাও সংখ্যাভিত্তিক হতে পারে। তখন সিমুলেটর পারস্পরিক ক্রিয়ার যে ফলাফল নির্দেশ করে বা নির্গমন করে তাও সংখ্যাভিত্তিক হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণের কাজটি সংখ্যাভিত্তিক গোনার সমতুল্য। ডিজিটাল কম্পিউটার যন্ত্রে এরূপ বহু সংখ্যাভিত্তিক সিমুলেটর থাকে। কম্পিউটারের গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের অংশে (Arithmetical Logic Unit) প্রয়োজনীয় গাণিতিক প্রক্রিয়া (যথা : যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি) চালনা করা যায়।

ট্রানজিস্টার, রেসিস্টার, কনডেনসার, কয়েল ইত্যাদি সাধারণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমন্বয়ে বিভিন্ন সিমুলেটর যন্ত্র নির্মাণ করা যায় এবং এদের সাহায্যে যে কোন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রতিরূপ সৃষ্টি করা যায়। প্রতীকভিত্তিক সংকেতগুলি

পরিমাণজ্ঞাপক হলে (যথা : বৈদ্যুতিক তারে ভোল্টেজের তারতম্য) এনালগ বা পরিমাণভিত্তিক সিমুলেটরের সৃষ্টি করা যায়। এনালগ সিমুলেটরের সাহায্যেও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়াগুলির সমাকলন ও অন্তরফলনমূলক (ইনটিগ্রেল ও ডিফারেন্সিয়েল) বিশ্লেষণ করা যায়। প্রক্রিয়া বা সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল হলে, সংখ্যাভিত্তিক সিমুলেটর অপেক্ষা পরিমাণভিত্তিক সিমুলেটরই বাস্তবে অধিকতর কার্যকরী ও প্রযোজ্য।

মোটরগাড়ীর গতি নির্দেশক যন্ত্রটি (স্পিডোমিটার) সিমুলেটরের একটি সহজ উদাহরণ। ঘূর্ণায়মান চাকার ঘূর্ণনের গতি বা মাত্রা থেকে প্রতীকধর্মী বৈদ্যুতিক সংকেত সংগ্রহ করা হয়। এই সংকেত প্রতিমুহূর্তে স্পিডোমিটারের কাঁটার অবস্থান নির্ধারণ করে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল গতির প্রতিরূপ নির্দেশ করে। অন্যদিকে একটি সমাকলনমূলক সিমুলেটর প্রতিমুহূর্তে গতির সমাকলন মান নির্ধারণ করে অপর একটি মিটারযন্ত্রে তা যোগফলরূপে প্রকাশ করে।

প্রাণীদেহে সংকেত প্রণালি : প্রাণীদেহে মূলত দুই প্রকার সংকেত প্রণালির প্রচলন আছে। এদের একটি স্নায়বিক সংকেত প্রণালি ও অপরটি রাসায়নিক সংকেত প্রণালি। নিকট দূরত্বে রাসায়নিক সংকেত প্রণালি একটি সহজ ব্যবস্থা ; বিবর্তনের দিক থেকে এটাই প্রাচীনতর। দূরত্ব অধিক হলে রাসায়নিক সংকেত প্রণালি সহজসাধ্য নয় এবং এর ফলাফলও সুনির্দিষ্ট নয়। রাসায়নিক ব্যবস্থায় সংবাদবাহী বস্তুটির বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণের উপরে বার্তার অন্তর্নিহিত অর্থ বা তাৎপর্য নির্ভর করে। রক্তস্রোতের সাথে প্রবাহিত হয়ে কোনো রাসায়নিক বস্তু দ্রুত দেহের একস্থান থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন বার্তাবহ রাসায়নিক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হতে হবে। বিভিন্নস্থান ও বিভিন্ন সময়ের বার্তা একই রাসায়নিক বস্তু হলে প্রাপকস্থানে ওদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে না। কমপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাপকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক সংকেত-বস্তু থাকতে হবে, নতুবা রক্তে মিশ্রিত সংকেত-বস্তুটি দেহের সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে সব প্রাপকের কাছে একই বার্তা নিয়ে আসবে। যখন বিভিন্ন শ্রেণীর বার্তার জন্য সংকেত-বস্তুর প্রচলন হয়, তখন গ্রহণস্থানেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গ্রাহীযন্ত্র থাকতে হবে। এ অবস্থায় গোলযোগের সম্ভাবনা অধিক ও যোগাযোগের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং এর ফলাফলও অনেকটা অনিশ্চিত।

দেহের হরমোনগুলি (বিভিন্ন নালীহীন গ্রন্থির রস) ঠিক এইভাবে কাজ করে। এরা ভিন্ন ভিন্ন সংকেত-বস্তুর সমতুল্য। সংকেত-বস্তুর পরিমাণের উপরে রাসায়নিক বার্তার তাৎপর্য নির্ভর করলে ব্যবস্থাটি এনালগ প্রণালির সাথে তুলনীয় ; হরমোনগুলির ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। উন্নত প্রাণীদের দেহের মতো জটিল বহুবিভক্ত যন্ত্রে আভ্যন্তরিক স্থিরাবস্থা ও প্রতিবেশের সাথে গতিময় সাম্যাবস্থা রাখার কাজ কেবল রাসায়নিক সংকেত প্রণালি দ্বারা সম্ভব নয়। সে কারণেই বিবর্তনের মাধ্যমে স্নায়বিক সংকেত প্রণালির উদ্ভব হয়েছে। তবে স্থায়ী বার্তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, সমগ্র জীবজগতে রাসায়নিক সংকেত প্রণালিই অন্যতম। বংশ পরম্পরা জটিল প্রজনন-সংকেত (Genetic Code) সঞ্চালনের ব্যবস্থাটি রাসায়নিক সংকেত প্রণালির উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। মস্তিষ্কের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্মৃতিধারণ ক্ষমতাও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রাসায়নিক সংকেত প্রণালির উপরে নির্ভর করে বলে অনেকে মনে করেন।

রাসায়নিক সংকেত সঞ্চালনের যে সকল অসুবিধা উপরে আলোচনা করা হয়েছে, স্থির সংকেত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এরা প্রযোজ্য নয়।

স্নায়বিক সংকেত মূলত চলমান বৈদ্যুতিক সংকেত। স্নায়ুতন্ত্রে বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে গতিময় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সব অসুবিধা দূর হয়েছে। স্নায়বিক বৈদ্যুতিক সংকেত দ্বিমাত্রিকও বটে। কতকগুলি একক মানের সহজ ও সমভারযুক্ত বৈদ্যুতিক উত্তেজনার সংকেত-চিহ্ন পর পর সাজিয়ে স্নায়ুবার্তা গঠিত হয়। সক্রিয় বিভবের 'সর্বমান অথবা কিছুই নয়' (৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এই নীতি স্নায়বিক সংকেতের দ্বিমাত্রিকতা নিশ্চিত করে। স্নায়ুতন্তুর মধ্যে মৌলিক সংকেত চিহ্ন কেবলমাত্র দুটি—(১) সমভার বিশিষ্ট সক্রিয় বিভবটির উপস্থিতি এবং (২) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভবটির অনুপস্থিতি। কম্পিউটার যন্ত্রের মূল আবিষ্কারকগণ (যথা : উইনার, নিউম্যান, শ্যানন, ইত্যাদি) স্নায়বিক যোগাযোগে দ্বিমাত্রিক সংকেত প্রণালিটি গভীরভাবে অবলোকন করেন এবং ওর থেকে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্নায়বিক সংকেত চিহ্ন মূলত দ্বিমাত্রিক হলেও স্নায়ুতন্ত্রের সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি বিস্তারিত বা প্রণালিবদ্ধ দ্বিমাত্রিক সংকেত ব্যবস্থা নয়। সীনাপ্‌স্‌স্থানে রাসায়নিক সঞ্চালন একটি প্রধান ব্যতিক্রম। আরোও একটি ব্যতিক্রম এই যে স্নায়ু-সংকেতের (বিশেষত সংবেদী অংশে) পুনঃ পুনঃ সংঘটনের মাত্রা বা ফ্রিকোয়েন্সীর তারতম্য (বা মডুলেশান) স্নায়বিক বার্তা সঞ্চালনে একটি নিশ্চিত তৃতীয় মাত্রা আনে।

একই যোগাযোগ পথে বার্তা উভয়দিকে বাহিত হলে যোগাযোগের বিশ্বস্ততা কমে যায়। বহু সংকেতবিশিষ্ট দুমুখী বার্তা একই পথে বাহিত হলে যোগাযোগ যন্ত্রে বার্তার তুলনায় 'শব্দবিভ্রম' (বা 'নয়েজ') বেড়ে যায়। সংক্ষিপ্ততম দ্বিমাত্রিক সংকেত চিহ্ন ও এক লক্ষ্য বিশিষ্ট সঞ্চালন পথের প্রবর্তনের ফলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কাজে অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণের স্তর বিভাগ : প্রতিবেশের সাথে প্রতিযোজনের জন্য দেহযন্ত্রগুলির কাজের ক্ষমতা ও সীমা মোটামুটিভাবে পূর্বনির্ধারিত। দেহযন্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বস্তুগত ও রাসায়নিক সংগঠনের উপর ওদের ক্ষমতা ও কাজের সীমা নির্ভর করে। যতক্ষণ দেহযন্ত্রগুলির কাজ নির্ধারিত সীমার মধ্যে ওঠানামা করে ততক্ষণ অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থাটি বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু কোন কারণে এই সীমা ছাড়িয়ে গেলে স্থিরাবস্থাটি বিঘ্নিত হয় ও কালক্রমে রোগের চিহ্ন ধরা পড়ে। প্রজনন সংক্রান্ত রাসায়নিক সংকেত ব্যবস্থা দেহযন্ত্রগুলির সংগঠন ও তাদের কাজে সীমা নির্ধারণের জন্য দায়ী। এর ফলে যে স্থূল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব তাই দেহের প্রথম স্তরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ; বাস্তবক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল প্রতিবেশের মধ্যে জীবন সংগ্রামে এটা মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

জীবনকালে মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিবেশের মধ্যে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার বার্তা ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নির্ধারক যন্ত্রে (অর্থাৎ মস্তিষ্কে) আসে ও সেখানে সংকলিত হয়। এসব বার্তা দেহের সংবেদী উদ্দীপনারূপে পরিচিত হলেও এদেরকে একদিক থেকে উপাবৃত্ত বার্তা বলে ধরা যায়। কারণ, পুরো দেহটি প্রতিবেশের সাথে যোজিত হয়ে একটি বৃহত্তর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সৃষ্টি করে (চিত্র ১১.১ দ্র:)। এই সমগ্র ব্যবস্থাটির দুটি প্রধান অংশ—দেহ

এবং এর প্রতিবেশিক পরিমণ্ডল—পরস্পরের সাথে সম্পর্কবদ্ধ ও পরস্পরকে নিয়ত প্রভাবিত করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপনাগুলি এই সামগ্রিক ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণীর উপাবৃত্ত বার্তা এবং এদের মাধ্যমে দেহে দ্বিতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয়। এর ফলে পূর্বনির্ধারিত কার্যক্ষমতা ও সীমানার মধ্যে দেহযন্ত্রগুলির কাজের মাত্রা সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়। দেহযন্ত্রগুলির কাজ, প্রতিবেশের প্রভাবের ফলাফল, পূর্ববর্তী আদেশ নির্দেশের ফলাফল ও দেহের অভ্যন্তরীণ গতিময় পরিস্থিতির বিস্তারিত সংবাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাবৃত্ত বার্তা হিসাবে পুনরায় কেন্দ্রীয় নির্ধারক যন্ত্রে আসে। এদের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণ আরোও সংশোধিত হয়ে তৃতীয় স্তরের অতি সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর করে তোলে। সুতরাং বলা যায় যে প্রাণী ও এর প্রতিবেশ মিলিতভাবে যে ব্যবস্থাটি সৃষ্টি করেছে, তাতে পূর্বনির্ধারিত (অর্থাৎ জন্মগত) সংগঠনের উপরে নির্ভর করে প্রথম স্তরের মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাবৃত্ত বার্তার উপরে নির্ভর করে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠে। পুরো ব্যবস্থাটির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের জন্য উপাবৃত্ত বার্তার চক্র দুটি অপরিহার্য। অন্য কথায়, উপাবৃত্ত বার্তার এই চক্র দুটির উপরে নির্ভর করেই পুরো ব্যবস্থাটির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন সিমুলেটর ও নির্ধারক যন্ত্রের জন্য উভয় চক্রের উপাবৃত্ত বার্তাই ইনপুট্ (input) এর কাজ করে। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, সকল সংবেদী বা উপাবৃত্ত বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছায় না ; পথে ধাপে ধাপে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে ছেঁকে ছেঁকে অনেক অপ্রয়োজনীয় বার্তাকে বাদ দেয়া হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের নিম্নস্তরেই নিয়ন্ত্রণের কাজটি সমাধা হয়ে যায়।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ও মস্তিষ্ক : স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার যন্ত্রের কাজ অনেকটা মস্তিষ্কের মতো। এসব যন্ত্রে জটিল বিশ্লেষণ, ও বহুমুখী গোনার কাজ তড়িৎ বেগে সম্পন্ন করা যায়। এরা পূর্বনির্ধারিত নির্দেশ অনুসারে ধাপে ধাপে দীর্ঘ হিসাবের কাজ করতে পারে। বহুবিধ গতিময় প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কাজও এদের দ্বারা সম্ভব। কম্পিউটার যন্ত্রে স্মৃতিভান্ডার রয়েছে। সেখানে পূর্বস্মৃতি ও নূতন অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজনবোধে যন্ত্র তার স্মৃতিভান্ডার থেকে যে কোনো তথ্য তাৎক্ষণিক উদ্ধারও করতে পারে। এসব গুণের অধিকারী বলেই স্বয়ংক্রিয় ইলেট্রনিক কম্পিউটারকে 'ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আধুনিক কোন কোন কম্পিটউার যন্ত্র ওদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দাবা খেলার কম্পিটউারের কথা ধরা যাক। প্রথম প্রথম যন্ত্রটি এর পূর্বনির্ধারিত নির্দেশ ও যুক্তির উপরে নির্ভর করেই চাল দেয়। কিন্তু কয়েকটি খেলা শেষ হবার পর যন্ত্রটি ঐ খেলাগুলোতে প্রদত্ত বিভিন্ন চালের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে। যে সকল চালে পরবর্তী ফলাফল ভাল হয়নি, সে সকল চাল পরিত্যাগ করা হয় অথবা ওদের মূল্য কমানো হয়। যে সব চালের ফলাফল উত্তম হয়েছিল (জয়লাভ অথবা প্রতিপক্ষের পরবর্তী বিপর্যয়), ওদের অধিক মূল্য প্রদান করা হয়। এভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে যন্ত্রটি এর পূর্বনির্ধারিত নির্দেশাবলী নিজেই সংশোধন করে এবং ক্রমে ক্রমে

খেলায় অধিকতর পারদর্শী হয়ে উঠে। নীতিগত দিক থেকে এভাবে অপরাজেয় যন্ত্রও সৃষ্টি হতে পারে, যা কোন ব্যক্তির নিকটই পরাজিত হবে না। তবে বাস্তবে এখনও তা সম্ভব হয় নি। দাবায় বিশ্বশিরোপাজয়ী সোভিয়েত ইউয়িননের গ্যারী ক্যাসপারভের সাথে অনুষ্ঠিত এক দাবা খেলায় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধুনিক কম্পিটউার দাবা যন্ত্রটি হেরে যায়।

স্বয়ংক্রিয় কম্পিটউারের কার্যপ্রণালি দেখলে এ প্রশ্ন সহজেই মনে আসে—তবে কি মানবমস্তিষ্ক একটি জটিল কম্পিটউার? প্রশ্নটি অবান্তর নয়। কম্পিটউার যন্ত্রের সংকেত প্রণালি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সংকেত প্রবাহের ধারা, ইলেকট্রনিক ছাঁকুনি, মডুলেটর, সিমুলেটর, ইত্যাদির সাথে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের সমতুল্য উপাদানগুলির কার্যগত দিক থেকে যথেষ্ট মিল রয়েছে। কম্পিটউারের ডাইনামিক পাল্‌স ইউনিট (D.P.U) এককগুলোর ক্রিয়া অনেকটা স্নায়ুকোষের মতো। একটি D.P.U. আগত স্পন্দন গ্রহণ করে এবং সংক্ষিপ্ত বিরতির পর এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্পন্দন সামনে প্রেরণ করে। মস্তিষ্কের মতো কম্পিটউার যন্ত্রেরও একটি গতিময়, উদ্‌বায়ী বা তাৎক্ষণিক স্মৃতি প্রক্রিয়া ও অপর একটি স্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডার রয়েছে।

যন্ত্রের সাথে মস্তিষ্কের তুলনা করলে কতগুলি বিশেষত্ব ধরা পড়ে। মস্তিষ্কের মৌলিক উপাদান একটি নিউরন, কম্পিটার যন্ত্রের মৌলিক উপাদানগুলোর তুলনায় কয়েক লক্ষগুণ ক্ষুদ্রতর। এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, স্নায়বিক বস্তু, যন্ত্রের অজৈব বস্তুর তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ও মিতব্যয়ী। সে কারণে একটি ক্ষুদ্র কম্পিটউারও মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক বড়। শুধু আয়তনেই নয়, সমতুল্য কাজের জন্য মস্তিষ্কে বহিরাগত শক্তির প্রয়োজন যন্ত্র অপেক্ষা অনেক কম। জাগ্রত অবস্থায় একটি মস্তিষ্ক যে শক্তি ব্যয় করে, তার পরিমাণ মাত্র একটি ২.৫ ওয়াটের বাতি জ্বেলে রাখার মতো। অথচ ট্রানজিসটার জাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত আধুনিক কম্পিটউার যন্ত্রেও কয়েক শত বা সহস্র ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হয়। মানবমস্তিষ্কের আর একটি বিশেষত্ব এর সুবিশাল স্মৃতিভাণ্ডার। একটি আধুনিক বড় কম্পিটউার যন্ত্রে ১০০ কোটি স্মৃতির বীট থাকতে পারে। অথচ মোটামুটিভাবে হিসাব করলেও দেখা যায় যে মানবমস্তিষ্কে কমপক্ষে দশলক্ষ কোটি ($১০^{১৩}$) বীট ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। স্মৃতিশক্তির তুলনা করলে মস্তিষ্কের বিপরীতে যন্ত্র এখনও নগণ্য।

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক অপেক্ষা যন্ত্রের অনেক বেশী ক্ষমতা রয়েছে। যন্ত্রের স্মৃতি সঠিক ও অমলিন। বহুদিন পরেও তা অম্লান থাকে। মানুষ তার জানা অনেক তথ্যই তাৎক্ষণিক স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু কম্পিটউার তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে। যন্ত্রের হিসাব কাজ একদিকে যেমন সবসময় নির্ভুল, অন্যদিকে তেমনি দ্রুত। প্রশ্ন জটিল ও বহুমুখী হলে মানবমস্তিষ্কে তা সমাধান করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। কোনো কোনো গতিময় ক্ষেত্রে প্রশ্ন সমাধান করতে মস্তিষ্কের এতো সময় ব্যয় হয় যে, কার্যত তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। রকেটের মধ্যপথে দিকসংশোধন, ক্ষেপনাস্ত্রের সাহায্যে দ্রুত-চলমান বিমান ধ্বংসকরণ, বিরাট ও জটিল অঙ্কের নির্ভুল সমাধান—এজাতীয় মানসিক কাজে যন্ত্রের কাছে মানবমস্তিষ্ককে হার মানতে হয়। বহুমুখী জটিল সমস্যার দ্রুত নির্ভুল সমাধান—এটাই কম্পিউটার যন্ত্রের প্রধান সুবিধা। একটি কম্পিউটারের ক্ষমতা নির্ভর করে, সেটি কি পরিমাণ এবং কি গতিতে তথ্য (বা ডাটা) সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও নির্গমন করতে পারে।

কম্পিউটার যন্ত্র মানবমস্তিষ্ককে একঘেয়ে মানসিক কাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে। কেবল মানুষ দ্বারা হিসাবরক্ষণ কাজ পরিচালনা করলে একটি বড় ব্যাংকে বহু সংখ্যক হিসাবরক্ষণ কর্মচারীর প্রয়োজন। অথচ শতাধিক হিসাবরক্ষকের কাজ একটি মাঝারী কম্পিউটার যন্ত্র দ্বারাই সমাধা করা যায়। অনুরূপে একটি বৃহৎ কারখানার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের কাজে কম্পিউটার যন্ত্র স্থাপন করে সমগ্র কারখানাটিকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলা যায়। প্রাচীন ও সনাতন বলবান যন্ত্রগুলি যেরূপ মানুষের হাতের কাজে সহায়তা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সমাজে একটি শিল্প-বিপ্লব সাধন করেছিলো, আধুনিক কম্পিউটারগুলোও সেরূপ মানুষের মানসিক কাজে সহায়তা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এক দ্বিতীয় 'কারিগরি বিপ্লব' এনেছে। এই নব বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন শক্তি অত্যন্ত বেশি এবং এর প্রভাব প্রথম শিল্প-বিপ্লব অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী হবার সম্ভাবনা। যেসব মানবগোষ্ঠী এই নব বিপ্লবের সদ্ব্যবহার করতে পারবে, তাদের সামগ্রিক শক্তি ও প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এই বিপ্লব সুনিয়ন্ত্রিত হলে, তা মানুষের স্বার্থ ও মানবিকতাকে কোনো অংশেই খর্ব করবে না, বরং ভবিষ্যতে মানুষের মানসিক কাজের মান আরোও উন্নত ও সমৃদ্ধ করবে। প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার মানব-মস্তিষ্কেরই একটি যান্ত্রিক বিস্তার। হয়তো যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সমস্যাগুলি সমাধান করতে করতে কালক্রমে মানুষ তার মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালিগুলোও অধিকতর সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করতে পারবে।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মেরামতের সমস্যা : যে-কোনো বৃহৎ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে একটি অংশের কাজ অপর অংশগুলোর কাজে প্রভাব বিস্তার করে। পরস্পর সম্পর্কবদ্ধ স্বয়ংক্রিয় অংশগুলোর কোনো একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ বিকল হয়ে গেলে, সমগ্র যন্ত্রটিও অচল হয়ে যেতে পারে। সেজন্যই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মেরামতের সমস্যাটি একটি বড় সমস্যা।

কম্পিটউার যন্ত্রের কোন একটি অংশ বিকল হলে তা পরিবর্তন করে দেয়া সহজ। কিন্তু প্রাণবান মানবদেহ বা মানবমস্তিষ্কে কোন বিকল অংশের পুনস্থাপন করা সহজ নয়, বরং তা অনেক সময় অসম্ভব। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতম অংশ ধ্বংস হলেও এর পুনস্থাপন বা একে নূতন করে নির্মাণ করা অসম্ভব। তবে মস্তিষ্কে বহু প্রতিরূপ বা অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। কোন অংশ অচল থাকলে প্রতিরূপ অন্য অংশগুলো অস্থায়ীভাবে এর কাজ চালিয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কে বহুমুখী কার্যকারিতা অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও পুরো দেহটিকে মোটামুটি চালিয়ে রাখতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত হেলেন কেলার ১৯ মাস বয়সের সময় এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে যান। এর ফলে কিছুদিন পরে তিনি বাক্‌শক্তিহীনও হয়ে পড়েন। কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি কেবল উচ্চ শিক্ষাই লাভ করেননি, বরং নিজকে এক বিশ্ববরেণ্য মনীষী ও সমাজ সেবিকায় উন্নীত করতে সক্ষম হন। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের এবং বিশেষ করে মস্তিষ্কের ক্ষতিপূরণ করার ক্ষমতা লক্ষ্য করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

কিন্তু তবুও কোন না কোন দিন প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়। স্বাভাবিক বার্ধক্যজনিত মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেহের কোন একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র বা প্রক্রিয়া বিকল হয়েই মৃত্যু আসে। চূড়ান্ত মৃত্যুর আগে বার্ধক্যের ফলে দেহের ও

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কার্যদক্ষতা কমতে থাকে। মস্তিষ্কের নিউরনগুলি অল্পবিস্তর ধ্বংস হয় এবং তাদের স্থান অপূরণীয় থেকে যায়। মৃত নিউরনের স্থানে নূতন নিউরন সৃষ্টি হলেও তেমন উপকারী হতো না, কারণ নিউরনগুলোর ধ্বংসের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন মুছে যায়।

নীতিগত দিক থেকে দেখতে গেলে, কোন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অটুট থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে যন্ত্রের বিভিন্ন বিকল অংশ নিয়ত মেরামতের জন্য যন্ত্রটিতে একটি স্বয়ংক্রিয় মেরামত বিভাগ থাকতে হবে। মেরামত বিভাগের কাজ একস্থানে সীমাবদ্ধ হলে চলবে না, কারণ যন্ত্রের যে কোন অংশই বিকল হতে পারে। সুতরাং মেরামতের কাজ সর্বত্র চলমান বা বিরাজমান হতে হবে। এটাও যথেষ্ট নয় ; মেরামতের বিভাগটি বা প্রক্রিয়াটি বিকল হয়ে পড়লে একে মেরামতের জন্য অন্য দ্বিতীয় স্বয়ংক্রিয় মেরামতের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একইভাবে মেরামতের জন্য এক অন্তহীন বিভক্তি ও বিন্যাসের সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি সম্ভব নয় বলে, চিরস্থায়িত্ব অর্জন করাও সম্ভব নয়।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মেরামতের এই মূল সমস্যা জীবজগতে অন্য উপায়ে সমাধান করা হয়েছে। কালের প্রকোপে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটিকে যখন চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করা যায় না, তখন নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে পুরাতন যন্ত্রটিকে পরিত্যাগ করে এর স্থলে অনুরূপ নূতন যন্ত্র প্রণয়ন করার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নূতন যন্ত্রটির মৌলিক গঠন সংক্রান্ত সকল বার্তা ও নির্দেশাবলী রাসায়নিক প্রজনন-সংকেত প্রণালির মাধ্যমে নূতন অস্তিত্বটির মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এই সংকেত প্রণালির মধ্যে উপযুক্ত সময়ে অস্তিত্বটির জীবন অবসানের সংকেতও অন্তর্নিবিষ্ট।

বংশপরম্পরা এই সংকেত সঞ্চালন ব্যবস্থাটিকে যৌন-বিভক্তি আরও সম্ভাবনাপূর্ণ করেছে। যৌন-বিভক্তি ও মিউটেশন প্রক্রিয়ার ফলে নূতন অস্তিত্বটি হুবহু পূর্ববর্তী অস্তিত্বটির মতো না হয়ে সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন বা তারতম্য (Variation) ধারণ করে। কোন কোন পরিবর্তন জীবন সংগ্রামে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে ও প্রজাতিটির সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে জীবনশক্তি কালজয়ী ; 'মৃত্যু' উন্নত জীবগণকে কালজয় করতে ও তাদের অস্তিত্বে ক্রমাগত উন্নতি বিধান করতে সহায়তা করে মাত্র। 'ব্যক্তিগত মৃত্যু' সম্পর্কে এটা একটি গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গী। 'ব্যক্তিগত মৃত্যু' প্রাণীদেহরূপ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে অন্তহীন মেরামতের সমস্যাও সমাধান করেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মস্তিষ্কের বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতা

কোনো যন্ত্রের মূল্যায়ন প্রধানত এর বিশ্বস্ততার উপরেই নির্ভর করে। বিশ্বস্ত না হলে হাতযন্ত্রই হোক আর দেহযন্ত্রই হোক, এর অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বড় বড় কম্পিউটার যন্ত্রে হঠাৎ একটি অংশ বা সংযোগ বিফল হলে সমস্ত যন্ত্রটিই অচল হয়ে পড়ে বা ভুল ফলাফল দিতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি একটি প্রধান প্রশ্ন।

মস্তিষ্কের বিশ্বস্ততা : মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি প্রকৃতি অতি সুন্দর করে সমাধান করেছে। মস্তিষ্কের নিউরনগুলি সমগ্র জীবনকাল প্রায় নিখুঁতভাবে কাজ করে যায়। বহু ক্ষতিকর ও বিনাশকারী পরিস্থিতির প্রকোপে পড়লেও মস্তিষ্ক বিশ্বস্তরূপে তার কাজ করে চলে। আংশিক বিনষ্ট হলেও মস্তিষ্ক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যাবশ্যক দেহ যন্ত্রগুলির নিয়ন্ত্রণ কাজ করে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ করতেও সক্ষম হয়। কখন কখন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক নিজেই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়ে ; আঘাত, অপঘাত, রক্তক্ষরণ বা সংক্রামক ব্যাধি মস্তিষ্কের অংশ বিশেষকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু এরূপ আকস্মিক বিপর্যয়ের মধ্যেও মস্তিষ্ক অত্যাবশ্যক দেহযন্ত্রগুলির কাজ নিশ্চিত করে এবং কিছুকালের মধ্যে বিকল অংশগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সচল হয়ে উঠে। কোনো কারণে দেহের গতিময় স্থিরাবস্থাটি পুনরায় সংস্থাপন করা মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব না হলে, নতুন পরিস্থিতিতে সক্রিয় অংশগুলির কাজে নতুনভাবে সমন্বয় সাধন করে মস্তিষ্ক নতুনভাবে কাজে লিপ্ত হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যন্ত্রের এরূপ বিশ্বস্ততা ও সৃজনশীলতা সত্যই অতুলনীয়।

স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংগঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাই মস্তিষ্কের কাজে বিশ্বস্ততা এনেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন অংশের মোটামুটি কতকটা স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা ও স্বশাসন ব্যতীত কোনো স্বয়ংক্রিয় জটিল যন্ত্রই বিশ্বস্তরূপে কাজ করতে পারে না। যদি যন্ত্রটির সকল অংশ, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্যগত দিক থেকে এরূপ দৃঢ়ভাবে সংযোজিত থাকে যে, এদের সকল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা একই স্থানে কেন্দ্রীভূত, তবে যন্ত্রটি সর্বদা গতিময় ও চলমান থাকা প্রায় অসম্ভব। তখন যে কোনো একটি অংশে সামান্য ভুলত্রুটি হলেই সমগ্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং পুরো যন্ত্রটিও অচল হয়ে পড়তে পারে। অন্য দিক থেকে এটাও সত্য যে, বিভিন্ন অংশের কাজে সমন্বয় সাধন ও সামগ্রিক একতা অর্জনের জন্য একটি দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এই দ্বিমুখী প্রশ্নের (অর্থাৎ, অংশের স্বশাসন ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ) সুন্দর সমাধান দেহে বিদ্যমান। দেহের অন্তরযন্ত্রগুলি,

এমনকি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলিও মোটামুটিভাবে 'স্বাধীন' বা স্বায়ত্তশাসিত। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা একই স্থানে বা একই স্তরে কুক্ষিগত না করে একে বিভিন্ন স্তরে ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি উর্ধ্বস্থিত স্তর, নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুনতর ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতা আনে। নিম্নস্তরের নিয়ন্ত্রণকারীগণ উর্ধ্বস্তরের নিয়ন্ত্রণকারীগণের অবর্তমানেও নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে মোটামুটি কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে উপরিস্থ স্তরের ব্যাপক নিয়ন্ত্রণকারীগণ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজসমূহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। যতক্ষণ নিম্নস্থ স্তরে কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবে চলছে, ততক্ষণ উপরিস্থ নিয়ন্ত্রণকারী নিম্নস্থ নিয়ন্ত্রণকারীর স্বাভাবিক কাজে হস্তক্ষেপ করবে না, কিন্তু কাজ স্বাভাবিক চলছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবে। যখনই কোনো অস্বাভাবিকতা বা ত্রুটির লক্ষণ দেখা দেয়, কেবল তখনই উপরিস্থ নিয়ন্ত্রণকারী তার ব্যাপকতর নিয়ন্ত্রণশক্তি প্রয়োগ করে এবং নিম্নস্থ নিয়ন্ত্রণকারীদের কাজে পরিবর্তন এনে প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে সহায়তা করে।

রাজনীতি বা রাষ্ট্রচালন নীতির সাথে তুলনা করলে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যগত শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রও নয় আবার একনায়কত্বও নয়। ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভক্ত এটা এক বিশেষ প্রকারের যাজকতন্ত্র বা হাইয়ারার্কি (hierarchy)। এটাই হয়তো সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও স্থিতিশীল অথচ নমনীয় শাসনব্যবস্থা। কার্যগত দিক থেকে এটা একটি গতিময় ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও বটে। নিয়ন্ত্রণের স্তরগুলি এমন করে সাজানো যে প্রতিটি উর্ধ্বতন স্তরের কার্যপরিধি এক বা একাধিক নিম্নবর্তী স্তরের কার্য পরিধিকে আবৃত করে অথচ প্রতিটি স্তরেই সীমিত গণ্ডীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন রয়েছে। যতক্ষণ নিম্নবর্তী স্তরে স্থিরাবস্থা মোটামুটি রক্ষিত হয়, ততক্ষণ উর্ধ্বতন স্তরে কোনো উপাবৃত্ত বার্তা (বা ফিড্‌ব্যাক) পৌঁছায় না—উর্ধ্বতন স্তরকে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নিম্নবর্তী স্তরে কোনো নিয়ামক প্রভাবও খাটাতে হয় না। যখন নিম্নস্তরে স্থিরাবস্থা ব্যাহত হয়, কেবল তখনই উর্ধ্বতন স্তরকে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উর্ধ্বস্থিত নিয়ন্ত্রণকারীর বিশেষ কতকগুলি গুণ থাকতে হবে। যথা : (১) বিভিন্ন নিম্নস্থ অংশে ও তাদের কাজে যে কোনো সীমানা অতিক্রান্ত বা ব্যতিক্রম হলে, এর বিশ্বস্ত সংবাদ উর্ধ্বস্থিত স্তরে সুষ্ঠুরূপে পৌঁছাতে হবে এবং উর্ধ্বস্থিত নিয়ন্ত্রণকারীকে এরূপ পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে ; (২) উর্ধ্বস্থিত স্তরে স্বাভাবিকতার (অর্থাৎ, গতিময় স্থিরাবস্থার) মাপকাঠি থাকতে হবে, যার উপরে নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণ কাজ সংঘটিত হবে ; (৩) নিম্নস্থ স্তরের পরিবর্তনের বার্তাকে উপবৃত্ত বার্তা রূপে ব্যবহার করে উর্ধ্বস্থিত স্তরের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াটি যথাসম্ভব স্বয়ংক্রিয় হতে হবে ; এবং (৪) উর্ধ্বস্থিত স্তরের কাজে বিশ্বস্ততা ও সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে, কারণ এই স্তরের কাজের বা নির্দেশের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া বহু অংশের কাজ নির্ধারণ করে বলে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মানবমস্তিক এই চারটি গুণেরই অধিকারী।

মস্তিষ্ক একটি বিশ্বস্ত আয়নার মতো বস্তুজগতের গুণাগুণ আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত করে। প্রতিফলনে ভুল থাকলে বা ভুল ধরা পড়লে আমরা পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে তা সংশোধন করতে পারি। আমরা অনুমান করে একটি প্রকল্প রচনা করতে পারি এবং আমাদের পুরাতন বিশ্বস্ত আয়নার অন্য সকল প্রতিফলনের সাথে একে মিলিয়ে দেখতে পারি। তবে এটা স্বীকার্য যে, বস্তুজগতের গুণাগুণসমূহ বহুধাপে রূপান্তরণের পরেই কেবল আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়। রূপান্তরণ হয়েছে বলেই

গুণাগুণের সত্যতা অসিদ্ধ বা অকার্যকর, তেমন কথা যুক্তিযুক্ত নয়। আয়না যেমন বস্তুর প্রতিকৃতি ধারণ করে, টেলিভিশনের পর্দা যেমন ব্যক্তির প্রতিমূর্তিকে প্রকাশ করে, মস্তিষ্কও তেমন বস্তুজগতের গুণাগুণসমূহ বিশ্বস্তরূপেই আমাদের চেতনায় প্রতিফলন করে। বুদ্ধিচর্চা, বিজ্ঞানসাধনা ও সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে এই বিশ্বস্ত প্রতিফলনগুলিই আমাদের সম্বল।

মস্তিষ্কের দুর্বলতা : অত্যন্ত বিশ্বস্ত হলেও মস্তিষ্কের কতগুলি বিশেষ বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। দেহের অন্যত্র বহুক্ষেত্রে কোনো জীবকোষ ধ্বংস হলে, এর স্থলে নতুন জীবকোষ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের নিউরনগুলির এই গুণ নেই। জন্মের সময় মানবমস্তিষ্ক যে স্নায়ুকোষগুলো ধারণ করে, তাই এর সারা জীবনের সম্বল। কোনো অংশ ধ্বংস হয়ে গেলে তা বদলিয়ে তার স্থলে নতুন অংশ সংযোজন করার ব্যবস্থা মস্তিষ্কে নেই।

সবসময় কম বেশি উত্তেজনা ক্লিষ্ট থাকে বলে ও কর্মরত থাকতে হয় বলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর অতিমাত্রায় শক্তিদায়ক খাদ্য বা জ্বালানির প্রয়োজন। গ্লুকোজ ও অক্সিজেন স্নায়ুকোষগুলোর শক্তির প্রধান উৎস; রক্তপ্রবাহের সাথে তারা মস্তিষ্কে আসে। স্নায়ুকোষগুলোকে প্রাণবন্ত ও সক্রিয় রাখার জন্য সবসময় যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন ও গ্লুকোজ মস্তিষ্কে সরবরাহ করতে হয়, কারণ এই অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য ও জ্বালানি গুদামজাত করার কোনো ব্যবস্থা মস্তিষ্কে নেই। রক্তের মধ্যে অক্সিজেন বা গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো অতি দ্রুত অচল হয়ে পড়ে। কেবল অচলই নয়, সরবরাহ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকলেই স্নায়ুকোষগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং ওদের ক্ষতি অপূরণীয় হয়ে দাঁড়ায়। দেহের অন্য কোনো অঙ্গ বা পেশী মস্তিষ্কের মতো এতো অধিক অক্সিজেনকাতর নয়; অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো যতো তাড়াতাড়ি স্থায়ীভাবে ধ্বংস হয়, দেহের অন্য কোনো উপাদান ততো তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয় না। গ্লুকোজের অভাব হলেও স্নায়ুকোষগুলো দ্রুত অচল হয়ে পড়ে এবং মারাত্মক অচেতন অবস্থার (যথা : ইনসুলীন শক্ ও কোমা) সৃষ্টি হয়।

মস্তিষ্কের আর একটি দুর্বলতা এর উপরে বহিরাগত রাসায়নিক বস্তুর প্রতিকূল প্রভাব। সাধারণত মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে বহিরাগত রাসায়নিক বস্তু প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি যে রক্ত অত্যাবশ্যকীয় গ্লুকোজ ও অক্সিজেন সরবরাহ করে, তাও স্নায়ুকোষগুলোর অতি নিকটে বা প্রত্যক্ষ সংযোগে আসতে পারে না। রক্তে মিশ্রিত বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু যাতে স্নায়ুকোষগুলেরা মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে, সেজন্য রক্ত ও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে একটি নির্বাচনমূলক বাধার প্রাচীর (blood-brain barrier) রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ওষুধ ও মাদকদ্রব্য (যথা : ঘুমের ওষুধ, অজ্ঞানকারক ওষুধ, আফিম, মদ, গাঁজা ইত্যাদি) এই বাধার প্রাচীর কম বেশী অতিক্রম করে যায়। কোনো কোনো সংক্রামক ব্যধিতে জীবাণুসৃষ্ট বিষাক্ত জৈব–রাসায়নিক বস্তুও মস্তিষ্কের বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে। ম্যানিন্‌জাইটিস, পলিওমায়েলাইটিস, টাইফয়েড জ্বর, হাম, সিফিলিস, ইত্যাদি ব্যাধিতে মস্তিষ্কে সীমিত অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বহু স্নায়ুকোষ স্থায়ীভাবে ধ্বংস হতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে এবং রোগী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্থ, মূক, বধির বা অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

মস্তিষ্কের রাসায়নিক পরিবেশ এর স্বাভাবিক কার্যকলাপের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। নিউরো হরমোন বা রাসায়নিক সঞ্চালকগুলির সাথে জড়িত প্রক্রিয়াদি ছাড়াও মস্তিষ্কে সর্বদাই অন্য বহু রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া ও বিপাক ক্রিয়া চলছে। স্বাভাবিক রাসায়নিক পরিবেশটি বিঘ্নিত হলে নানা ব্যতিক্রম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এন্‌ডরফীণ্ (endorphins) নামক কতিপয় ক্ষুদ্র আমিষ অণু মস্তিষ্কে স্বভাবতই বিদ্যমান; এদের প্রভাবে নানা মানসিক পরিবর্তন হতে পারে। এ,সি,টি,এইস্ (ACTH) ও ভেজোপ্রেসীন্ (Vesopressin) নামক হরমোনগুলি লিম্‌বিক্ তন্ত্রের উপরে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও স্মৃতি রক্ষা ও স্মৃতি উদ্ধারের কাজে সহায়তা করে। বিভিন্ন রাসায়নিক ও হরমোনের উপস্থিতি ও পরিমাণের সাথে হাইপোথ্যালামাসের কার্যকলাপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে। এ সকল উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক রাসায়নিক পরিবেশটি সংরক্ষণ করা এর স্বাভাবিক কার্যকলাপ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।

মাদকাসক্তির সমস্যা : রাসায়নিক প্রভাবে মস্তিষ্কের আর একটি ক্ষতি হতে পারে এবং তাহলো মাদকাশক্তি। কতগুলো বিশেষ বিশেষ ওষুধ ও রাসায়নিক মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর উত্তেজনার তারতম্য সৃষ্টি করে দৈহিক ও চেতনার স্তরে কৃত্রিম সুখানুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। প্রথমে এরূপ অনুভূতিগুলি অস্থায়ী থাকে এবং বিশেষ ওষুধটি গ্রহণ করে সাময়িকভাবে কিছুক্ষণ আনন্দ অনুভব করা ব্যক্তিটির ইচ্ছাধীন থাকে। কিন্তু পুনঃপুনঃ গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো এরূপ অবস্থায় উপনীত হয় যে বিশেষ রাসায়নিক বস্তুটির অভাবে এরা অস্থির হয়ে পড়ে বা কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ব্যক্তিটি তখন বিশেষ মাদক দ্রব্যটির প্রতি কেবল আসক্তই নয়, বরং সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মাদকতার প্রভাবে ব্যক্তিটির চিন্তাধারা, ন্যায়–অন্যায় বোধ ও চরিত্র সম্পূর্ণ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি ও নির্ভরশীলতার মাত্রা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। চা (ক্যাফেইন), তামাক (নিকোটিন), ইত্যাদি দ্রব্যের প্রতি আসক্তি ও নির্ভরশীলতা কতকটা নমনীয়; এদের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করাও সহজতর। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান (ইথাইল এলকোহল), অথবা আফিম (মরফিন, নারকোটিন, কডিন), হিরোইন, কোকেন, ইত্যাদি নিয়মিত কিছুদিন গ্রহণ করলে, যে কোনো ব্যক্তিই অত্যন্ত নেশাগ্রস্ত ও মাদক দ্রব্যটির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মরফিন (আফিমের শক্তিশালী সক্রিয় অংশ) দেহের ব্যথা দূর করে এবং মনে প্রবল আনন্দের (euphoria) সৃষ্টি করে। মস্তিষ্কে ও মেরুরজ্জুতে বিশেষ বিশেষ গ্রাহীস্থান আছে, যেখানে মরফিন নিজেকে বন্ধন করে। এ সকল গ্রাহীস্থানে দেহে স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত পেপটাইড জাতীয় পদার্থ (যথা : এ্যানকেফালিন, বিটা এনডর্‌ফিন, ইত্যাদি) কাজ করে। মরফিন গ্রাহীস্থানগুলোকে আবদ্ধ রাখে বলে, স্বাভাবিক বস্তুগুলি তাদের কাজ করতে পারে না। এছাড়াও মরফিন পরোক্ষভাবে প্রাথমিক সংবেদী স্নায়ুর উত্তেজনা অবনমন করে।

গাঁজা (বা মারিজুয়ানা) এবং এল,এস,ডি (LSD বা lysergic acid diethylamide) অন্য একপ্রকার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এরা অলীক ও বিভ্রান্তিকর অনুভূতি বা উপলব্ধির সৃষ্টি করতে পারে। এদের প্রভাবে ব্যক্তিটি কতক্ষণের জন্য অলীক জগতে বিচরণ করে এবং মানসিক সুখানুভূতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এদের মাদকতা প্রভাব (অর্থাৎ আসক্ত ব্যক্তির এদের উপরে নির্ভরশীলতা) মরফিন বা হিরোইনের তুলনায় কম হলেও, পুনঃপুনঃ গ্রহণে দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তিরা এদের উপরে মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এল,এস,ডি, একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিভ্রান্তিকারক বস্তু। এর প্রভাবে মস্তিষ্কের সংবেদন শক্তি (বিশেষত দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি) অস্থায়ীভাবে অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠে।

মস্তিষ্কের দুর্বলতাই মাদকতার কারণ। তবে কোনো ব্যক্তির মাদকদ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ ও কালক্রমে আসক্তি, তার চরিত্র, মনোবল, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের উপরে বহুলাংশে নির্ভর করে। মস্তিষ্কের এই রাসায়নিক দুর্বলতা নানা মানবিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা : মানুষের মস্তিষ্কে স্মৃতিভান্ডার অত্যন্ত বৃহৎ, বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। কিন্তু কোনো কোনো দিক থেকে তা দুর্বল ও সীমাবদ্ধ। কিছুদিনের অনভ্যাসে বহু স্মৃতি মলিন হয়ে যায় এবং বহুদিনের অনভ্যাসে তা সম্পূর্ণ মুছে যেতে পারে। তখন অনেক স্মৃতি তাৎক্ষণিকভাবে স্মরণ বা উদ্ধার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বহু স্মৃতি মুছে যায় না, তবে এদের উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে অথবা সম্মোহনের মাধ্যমে অনেক 'লুপ্ত' স্মৃতিও পুনরায় চেতনাপ্রাপ্ত হতে পারে। তবে কৃত্রিক স্মৃতিধারক যন্ত্রে (যথা : গ্রামোফোন রেকর্ড, ম্যাগনেটিক ফিতা, ছবির ফিল্ম বা ভিডিও, কম্পিউটারের স্মৃতিধারক ডিস্ক, কম্পেক্ট ডিস্ক ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্মৃতি যেমন নিখুঁতভাবে বহুকাল সংরক্ষণ করা যায়, মস্তিষ্কে তা সম্ভব নয়।

মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে স্মৃতি আংশিকভাবে মুছে যাওয়াই হয়তো মঙ্গলকর। অন্যথায় অসংখ্য সম্পূর্ণ ও নিখুঁত স্মৃতির সম্মিলিত চাপে মস্তিষ্ক ও চেতনা বিব্রত হয়ে পড়তো। সে কারণেই হয়তো সচেতন স্মৃতিকে বারে বারে মুছে মস্তিষ্কে নতুন করে রেকর্ড করা হয়। তবে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করা হলে যে কোনো অর্জিত স্মৃতিই দীর্ঘকাল অমলিন থাকে। মস্তিষ্কের যে সকল অংশ দেহের আন্তরযন্ত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, এদের জন্মগত 'স্মৃতি' অবচেতন হলেও স্থায়ী। যে স্থায়ী স্মৃতি ও রাসায়নিক সংগঠন এরা জন্মকালে ধারণ করে, সমস্ত জীবন এরই প্রভাবে তারা নির্দিষ্ট কাজ করে যায়। প্রয়োজন হলে মস্তিষ্ক বা এরা এদের স্মৃতিবদ্ধ নির্দেশ অনুসারে এদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মাত্রাভেদও করে থাকে। মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় ও সাহজিক অংশগুলি এদের নিজস্ব সহজাত রাসায়নিক অভিজ্ঞান দ্বারাই চালিত হয়।

ঊর্ধ্বতন চেতনশীল স্তরে সাহজিক অভিজ্ঞান থাকলেও সাহজিক বাধ্যবাধকতা নেই। এর ফলেই চেতনা বহুলাংশে 'স্বাধীন'। একটি বিরাট সীমানার মধ্যে মনোনয়ন ও নির্বাচন করার ক্ষমতা এবং সম্ভাব্য অনেকগুলি কর্মপথের মধ্যে কোনো একটিকে বাছাই করার 'স্বাধীনতা' চেতনার রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে চেতনার এই 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' অত্যন্ত প্রকট। তবে

এই 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' কোনো কোনো সময় 'সাহজিক' মস্তিষ্কের উপরে অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক দায়িত্ব অর্পণ করে একে বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত বা বিপন্ন করে তুলতে পারে। অপরদিকে, মানুষের চেতনার এই 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যই' তার বিপুল সৃষ্টিক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উৎস। ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার করেই মানুষ প্রাণীজগতে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রেষণা

প্রবৃত্তি বলতে সেসব জটিল মানসিক ও দৈহিক সম্পর্কগুলিকে বোঝায়, যার ফলে প্রাণীরা কোনো কোনো বিশেষ কাজের জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উপযুক্ত পরিবেশে কতটা বাধ্যভাবে সে সকল কাজ সম্পন্ন করে। প্রবৃত্তিগুলিকে অনেক সময় ভাবাবেগ বলেও আখ্যায়িত করা হয়। শরীরবৃত্তবিদগণ ভাবাবেগের উৎস ও তার ফলে সংঘটিত শারীরিক পরিবর্তনসমূহের সম্পর্কাবলী অনুসন্ধান করেন। অপরদিকে মনোবিদগণ ভাবাবেগের আচরণিক দিকগুলির প্রতি সরাসরি মনোনিবেশ করেন।

প্রতিটি ভাবাবেগের দুইটি দিক রয়েছে—একটি মানসিক ও অপরটি শারীরিক। একদিকে ভাবাবেগের জন্য অবধারণ (cognition) ও বিশেষ কাজের প্রতি আগ্রহ বা প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে। অপরদিকে ভাবাবেগের ফলে দেহে কতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়, যথা : রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত সঙ্কোচন, যৌন আচরণ ইত্যাদি। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও লিম্‌বিক্ তন্ত্র—এই দুটি অংশ মিলিতভাবে ভাবাবেগ সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রণ ও এর প্রকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। লিম্‌বিক্ তন্ত্র শুধু ঘ্রাণ অনুভূতির কাজই করে না ; খাদ্যগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাণীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণও এটি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। হাইপোথ্যালামাস্ ও লিম্‌বিক্ তন্ত্র সম্মিলিতভাবে প্রাণীর ক্ষুধা, ভয়, ক্ষিপ্ততা, আগ্রাসন, ইত্যাদিসহ অন্যান্য বহু প্রবৃত্তিও নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণের বিশেষত্ব : প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমূহ প্রধানত জন্মগত বা সহজাত। অবশ্য বয়সভেদে ও লিঙ্গভেদে আচরণগুলি ভিন্নভিন্ন প্রকার হতে পারে। খাদ্য সংগ্রহ, আহার গ্রহণের রীতি ও প্রক্রিয়া, দেহের পরিচর্যা, যৌন আচরণ, সামাজিকতা, আবাসস্থল নির্বাচন, ইত্যাদি সম্পর্কে একই প্রজাতির ভিন্নভিন্ন সদস্যদের আচরণ অনুরূপ ও বংশগত। সে কারণেই এসব আচরণ কেমন হবে তা অনেকটা পূর্ব থেকেই বলা যায়। তবে কোনো কোনো আচরণ (যথা : খেলা করা, অন্বেষণ করা বা আবিষ্কারার্থ ভ্রমণ করা) একই প্রজাতির ভিন্নভিন্ন সদস্য বা গোষ্ঠির মধ্যে ভিন্নতর হতে পারে।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণের আর একটি বিশেষত্ব, এদের অন্তর্নিহিত জটিলতা। এটি কোন একটি উত্তেজনার প্রতি একটি সহজ প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়া নয়। বরং এটি একটি জটিল সারিবদ্ধ প্রক্রিয়া যা একটি পূর্ব নির্ধারিত ছকমাফিক ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়। পাখির বাসা নির্মাণের প্রক্রিয়া বা প্রাণীর যৌন আচরণ লক্ষ্য করলে বিভিন্ন প্রকার ঘটনার অনুবর্তিতা বা ধারাবাহিকতা স্পষ্ট চোখে পড়ে। প্রক্রিয়াগুলি সহজ বা তাৎক্ষণিক নয় ; অনেক ক্ষেত্রেই এরা

অসাধারণরূপে জটিল ও সম্প্রসারিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলির অভিযোজনমূলক ভূমিকা রয়েছে এবং এ কারণেই এরা বংশগত। প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমূহ কোনো না কোনো প্রকারে প্রাণীটির ব্যক্তিগত বা প্রজাতিগত সংরক্ষণে সহায়তা করে। এজন্য প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলিকে অভিযোজনমূলকও বলা যায়।

প্রবৃত্তিমূলক কাজ বা আচরণের জন্য কোনো শিক্ষা বা অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। তবে প্রবৃত্তির ধারাবাহিক ক্রিয়াগুলি আরম্ভ হবার জন্য একটি বিশেষ উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। উদ্দীপনাটি প্রবৃত্তিমূলক আচরণের পরবর্তী ঘটনাবলী পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করে না ; এটি কেবল বন্দুকের ঘোড়ার মতো ঘটনাপ্রবাহের সূচনা করে। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রাণীটির স্নায়ুতন্ত্র ও তার দেহের জন্মগত সংকেত প্রণালীর উপরে নির্ভর করে ধাপে ধাপে সংঘটিত হতে থাকে। ফলে মনে হয়, যেন একটি দৃঢ় চালক শক্তি প্রাণীটিকে তার ভিতর থেকেই অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালনা করছে, যার তুলনায় বাইরের উদ্দীপনাটি ছিল একটি ক্ষণস্থায়ী উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রবৃত্তিমূলক স্বয়ংক্রিয় কিছু কিছু আচরণ, প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মতো। এরূপ কতোগুলি প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া পরপর যুক্ত ও সংঘটিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করতে পারে। তবে, তেমন ক্ষেত্রে পর পর সংঘটনের প্রক্রিয়াটি মেরুরজ্জু বা মস্তিষ্কে অবস্থিত বিশেষ বিশেষ স্নায়ুকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। উপাবৃত্ত বার্তার প্রভাব ব্যতীতও এরূপ পর পর সংঘটিত ঘটনাগুলি সমন্বিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ স্তন্যপায়ী প্রাণীর আহার গলাধঃকরণের প্রক্রিয়াটি উল্লেখ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে ১১টি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পেশী পর পর কাজ করে মসৃণ ও সমন্বিতভাবে পুরো কাজটি সম্পন্ন করে। প্রতিটি পেশীর কাজ নির্দিষ্ট এবং তাদের কাজের সময় ও ক্ষণ সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট। তাদের নিয়ন্ত্রণের ভার মেরুরজ্জু ও মস্তিষ্কে। অনেকে মনে করেন, এরূপ নির্দিষ্ট কতোগুলি ক্রিয়ার সমন্বিত ছকসমূহই হয়তো প্রবৃত্তিমূলক আচরণের ভিত্তি।

আহার ও যৌন প্রবৃত্তি সংক্রান্ত এষণামূলক (অর্থাৎ খুঁজে বের করা) আচরণ লিম্‌বিক্ তন্ত্রই নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ কাজের মধ্যে অবধারণ ও নির্বাচন করার মানসিক ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। উন্নত প্রাণীর নিউকর্টেক্স বিস্তার লাভের পরে এর মাধ্যমে অধিকতর ক্ষমতা অর্জনের সাথে সাথে, নিম্নস্থ স্তরের নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ছকগুলি (fixed action patterns) অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষালব্ধ ছকের (learned patterns) নিকট হার মেনেছে। মানুষের ক্ষেত্রে এর জ্বলন্ত উদাহরণ বিদ্যমান। শিক্ষার ফলে মানুষ তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমূহ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। প্রবৃত্তিগুলির ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ বা সংযম একটি মানবিক গুণ ; এটা মানুষের সামাজিকতারও ভিত্তি।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রবৃত্তি : যৌন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত জটিল আচরণের সৃষ্টি করে এবং এর সাথে স্নায়ুতন্ত্রের ভিন্নভিন্ন অনেক অংশ জড়িত। প্রকৃত রতিক্রিয়াটি মেরুরজ্জু ও ব্রেইন-স্টেমে সংঘটিত বহু প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়, কিন্তু এর সাথে জড়িত প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমূহ প্রধানত লিম্‌বিক্ তন্ত্র ও হাইপোথ্যালামাসেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিম্নস্তরের প্রাণীর ক্ষেত্রে সমগ্র যৌন প্রক্রিয়াটি কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ব্যতীতই সম্পন্ন হতে

পারে। কিন্তু বানর জাতীয় প্রাণী ও মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যৌন আচরণ নির্ধারণে বেশ কিছুটা ভূমিকা পালন করে। মানুষের ক্ষেত্রে যৌন আচরণ ও সক্রিয়তার সাথে মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রগুলিও জড়িত এবং মানুষের সামাজিক ও মানসিক উপাদানসমূহ এই আচরণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

যৌন আচরণের সাথে দেহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যৌন হরমোনগুলির উপস্থিতিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নালীহীন যৌনগ্রন্থিগুলি অপসারণ করা হলে, যৌন প্রবৃত্তি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে ও কালক্রমে লুপ্ত হয়। তখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হরমোন সূচি-প্রয়োগ (injection) করা হলে যৌন সক্রিয়তা সাময়িকভাবে ফিরে আসে। পুরুষের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন (testosteron) ও নারীর ক্ষেত্রে এসট্রোজেন (estrogen) ও প্রজেস্টেরন (progesterone) নামক হরমোনগুলি প্রধান ভূমিকা পালন করে। নপুংসককে বিপরীত লিঙ্গের হরমোন অধিক মাত্রায় প্রদান করা হলে, তার নিজের লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যৌন আচরণ সাময়িকভাবে ফিরে আসে।

পুরুষজাতীয় স্তন্যপায়ীদের যৌন-সক্রিয়তা মোটামুটি অবিরাম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর যৌন-সক্রিয়তা একটানা বা সার্বক্ষণিক নয়, বরং সাময়িকভাবে কিছুকাল পরে পরে আবর্তিত হয়। সেক্ষেত্রে স্ত্রীজাতীয় প্রাণীটি সচরাচর পুরুষজাতীয় প্রাণীকে এড়িয়ে চলে এবং পুরুষজাতীয় প্রাণীটির যৌন আবেদন অগ্রাহ্য বা প্রতিহত করে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর স্ত্রীজাতীয় প্রাণীটির আচরণে হঠাৎ মৌলিক পরিবর্তন আসে এবং তখন সে কামোত্তেজিত হয়ে পুরুষজাতীয় প্রাণীর অন্বেষণ করে ও যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। রক্তে এসট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় বলেই স্ত্রীজাতীয় প্রাণীটির আচরণে হঠাৎ করে এমন পরিবর্তনের সূচনা হয়। রক্তে বাহিত হয়ে এসট্রোজেন হাইপোথ্যালামাসে আসে এবং সেখানে অবস্থিত বিশেষ গ্রাহীকোষসমূহকে উত্তেজিত করে। হাইপোথ্যালামাস ও লিম্‌বিক্ তন্ত্রের উত্তেজনার ফলে স্ত্রীজাতীয় প্রাণীটির কামোত্তেজনা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যৌন আচরণের সৃষ্টি হয়। ঘটনাপ্রবাহের এখানেই শেষ নয় ; স্ত্রীজাতীয় প্রাণীটি গর্ভধারণ করলে, গর্ভধারণকালে ও পরে স্তন্যদান কালে নতুন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

মাতৃসুলভ প্রবৃত্তি ও আচরণসমূহ প্রধানত লিম্‌বিক্ তন্ত্রের উপরে নির্ভর করে। এর জন্য কোন বিশেষ হরমোন অত্যাবশ্যক নয়। তবে পিটুইটারী গ্রন্থির প্রোলেকটিন (prolactin) নামক হরমোন (যা স্তন্যদানের সময় প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়) প্রক্রিয়াটিকে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়। লিম্‌বিক্ তন্ত্রের বিশেষ স্থানে ইলেকট্রোড স্থাপন করে উত্তেজনা প্রদান করা হলে, কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে (যথা : বানর) কৃত্রিম মাতৃসুলভ আচরণের সৃষ্টি হয়।

ভয় ও ক্ষিপ্ততার আচরণ দুটি পরস্পর সম্পর্কাবদ্ধ। হাইপোথ্যালামাস ও লিম্‌বিক্ তন্ত্রের অংশবিশেষ (এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস) উত্তেজিত করে ভয়ের প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করা যায়। অপরপক্ষে এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস অপসারণ করা হলে প্রাণীর মধ্যে ভয়ের প্রতিক্রিয়াটি লুপ্ত হয়ে যায়। বানরের মধ্যে এর একটি নাটকীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বানর সাপকে অত্যন্ত ভয় করে ও সাপ দেখলেই পালায়। কিন্তু মস্তিষ্কের দুপাশের পার্শ্বস্থ খণ্ড দুটি (এমিগডালয়েড সহ) অপসারণ করা হলে, একটি বানর নির্ভয়ে একটি সাপের দিকে অগ্রসর হয় এবং এমনকি সেটি ধরে খেয়ে ফেলে।

প্রাণী তার ক্ষিপ্ততা ও আগ্রসনমূলক আচরণের সাথে ধীরস্থির ও শান্তভাবের একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। কোন প্রাণীকে ছোটখাট উপদ্রব করা হলে, সচরাচর প্রাণীটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে না। কিন্তু মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বতন অংশগুলি বিচ্ছিন্ন করা হলে, ছোটখাট উপদ্রবেও প্রাণীটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, একটি বানরের বা বিড়ালের দুপাশের এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস দুটি ধ্বংস করে দেয়া হলে, প্রাণীটি অস্বাভাবিক রকম ধীরস্থির ও শান্ত হয়ে পড়ে। তখন বড় রকম উপদ্রব করা হলেও প্রাণীটি ক্ষিপ্ত হয় না। বিড়ালের এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াসের বিশেষ অংশ প্রোথিত ইলেকট্রোডের সাহায্যে উত্তেজিত করা হলে, বিড়ালটি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। অনুরূপে হাইপোথ্যালামাসের অংশবিশেষকে উত্তেজিত করেও প্রাণীটিকে ক্ষিপ্ত করে তোলা যায়। এরূপ প্রতিক্রিয়া প্রাণীটির জন্য যে আনন্দদায়ক নয়, তারও প্রমাণ আছে। কোনো কোনো ওষুধের (যথা : রেসারপিন) প্রভাবে প্রাণীর (এবং মানুষেরও) ক্ষিপ্ততা ও আগ্রসনমূলক আচরণ কমে যায়।

পুরুষজাতীয় প্রাণীর ক্ষিপ্ততা ও আগ্রাসনমূলক আচরণ যৌন হরমোনের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। একটি স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর সাথে একাধিক পুরুষ জাতীয় প্রাণী রাখা হলে, পুরুষজাতীয় প্রাণীর আগ্রসনমূলক আচরণ অনেক বেড়ে যায় এবং তারা তখন অকারণেও একে অপরকে আক্রমণ করে। অপরপক্ষে, নপুংসক করা হলে, পুরুষজাতীয় প্রাণীর আগ্রসনভাব অনেক কমে যায়। প্রাণীর ও মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিকতার প্রভাবেও আগ্রাসনমূলক আচরণ অনেক কমে যায়। এরূপ পরিবর্তনের জন্য মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বতন স্তরে প্রতিবন্ধনকারী প্রভাবই দায়ী।

প্রাণীর তুলনায় মানুষের ভাবাবেগসমূহ অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও জটিল। এটা মানুষের মস্তিষ্কে ঊর্ধ্বতন স্তরগুলির অধিকতর বিকাশ ও ক্ষমতা অর্জনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। মস্তিষ্কের অপঘাত বা শল্য চিকিৎসার পর, কোনো কোনো মানুষের আগ্রাসনমূলক আচরণ বেড়ে যায়। জটিল মানসিক রোগেও কোনো কোনো সময় রোগী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং আগ্রাসনমূলক আচরণ প্রকাশ করে। একটি পরীক্ষায় (জাপানে) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও আগ্রাসী মানসিক রোগীর এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস দুটি নিষ্ক্রিয় করে দেখা গেছে, তারা অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্ত হয়ে যায়। এরূপ চিকিৎসার পরে অতিরিক্ত যৌন প্রবৃত্তি বা স্মৃতি লোপের কোনো চিহ্ন ধরা পড়ে নি।

প্রেষণা (Motivation) : প্রেষণা সম্পর্কে অনেক ধ্যান-ধারণা থাকলেও তাদের কোনো একটিকেই যথেষ্ট মনে করা যায় না। অদৃশ্য চালকশক্তির মতবাদ (Drive theory) বহুলাংশে বর্জন করা হয়েছে। মনঃসমীক্ষণবিদগণ (Psychoanalysts) অহম্ (ego) এর কার্যকারণ সম্পর্ক সন্ধান করতে গিয়ে, প্রবৃত্তিগুলির শক্তি লক্ষ্য করেন। তবে কেবল প্রবৃত্তির ব্যর্থতা (frustation) ও সংঘাতের (conflict) উপরে ভিত্তি করে যে সব সনাতন মতবাদ রচনা করা হয়েছিল, সেগুলো এখন আর সম্পূর্ণ গ্রহনযোগ্য নয়। বহির্জগতের উপাদানসমূহ (অথবা তাদের প্রতিরূপসমূহ) কিভাবে একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তার উপরে আধুনিকালে অধিক মনোনিবেশ করা হয়েছে। উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিতে প্রাণীর যথেষ্ট নির্বাচনমূলক (স্বয়ংক্রিয় বা সচেতন) ক্ষমতা আছে, এরূপ ধারণা করার মতো বহু

প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। আবার এরূপ ধারণাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আচরণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রেষণা নামক বিষয়টির অবতারণার প্রয়োজনই নাই; সমগ্র বিষয়টি সাধারণ শিক্ষা (learning) ও পুনরপি বলীয়ান (reinforcement) প্রক্রিয়া ব্যতীত অপর কিছুই নয়।

পুনরপি বলীয়ান বলতে এটাই বোঝায় যে, বিশেষ পরিবেশ ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রাণী যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণ প্রকাশ করে, সেটি আচরণটিরই পূর্বাপর ফলাফল ও পরিণতি। পরীক্ষাগারে প্রাণীকে বিভিন্ন গোলক ধাঁধা ও সমস্যা সমাধান করার শিক্ষা দেওয়া যায়; এমন কি তারা বিভিন্ন সংবেদী উত্তেজনার মধ্যে নির্বাচন করার শিক্ষাও লাভ করতে পারে। কিন্তু এরূপ শিক্ষাকালে প্রতিবারই প্রাণীটিকে পুরস্কার (reward) বা পারিতোষিক দিতে হয়। পুরস্কার প্রদান কালক্রমে এষণার সৃষ্টি করে এবং পুনরপি বলীয়ানে সহায়তা করে। পুরস্কারের ধরনটি হতে পারে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দেওয়া, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানি দেওয়া, অথবা তেমন অপর কিছু। স্কিনার বাক্সে রাখা ইঁদুরের, আনন্দ অনুভূতির জন্য পুনঃপুনঃ রড চাপার বিষয়টি পূর্বেই (৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষালাভকেও একটি পুরস্কার বলে গ্রহণ করা যায় এবং মানুষের ক্ষেত্রে একে একটি প্রধান পুনরপি বলীয়ানকারী শক্তি হিসাবেও গণ্য করা যায়।

কেউ কেউ মনে করেন, পুনরপি বলীয়ানকরণের প্রক্রিয়াটি যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলে, প্রেষণা বা উদ্দীপনার বিষয়টি না টেনেও আচরণের উৎস ও নিয়ন্ত্রণের কার্য-কারণ সম্পর্ক উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তবে এখনও এই ধারণা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, পুনরপি বলীয়ানকরণের প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত জটিল এবং তত সহজবোধ্য নয়। আবার, কেউ একথাও বলতে পারেন যে, পুনরপি বলীয়ানকরণের প্রক্রিয়াটির জন্যও প্রাণীটির একটি নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রেষণার প্রয়োজন, যার উপস্থিতি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হতে পারে। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণের জন্য (তা যতই বিস্তারিত হোক না কেন), একটি প্রজাতির সকল প্রাণীর দেহে প্রায় সকল নির্দেশাবলী পূর্ব থেকেই সংরক্ষিত থাকে; তার জন্য কোন শিক্ষা বা পুনরপি বলীয়ানের প্রয়োজন হয় না।

প্রেষণার স্তর বিভাগ : বিখ্যাত মনোবিদ আব্রাহাম মাসলো প্রস্তাব করেন যে, মানুষের প্রেষণার ক্ষেত্রে স্তর বিভাগ রয়েছে। তাঁর মতে, শারীরিক প্রয়োজনসমূহ (যথা : ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা ইত্যাদি) সংক্রান্ত প্রেষণা সবচেয়ে প্রবল ও এরা আছে নীচের স্তরে। তার উপরে আছে নিরাপত্তার প্রয়োজন এবং তারও উপরে প্রয়োজন সহানুভূতি ও ভালবাসার। এর উপরে অবস্থিত অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা বা সম্মান (esteem) লাভের প্রয়োজন। সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর মতে আছে, আত্মপ্রতিষ্ঠা (self-actualization) এবং জ্ঞান ও কান্তি (aesthetic) লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। নিম্নস্তরের প্রবল প্রয়োজনগুলিই সচরাচর মানুষের আচরণের উপর প্রভুত্ব করে। মাসলোর মতে, আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য : তবে ততক্ষণ সেটি অর্জন করা সম্ভব হয় না, যতক্ষণ না মানুষ তার নিম্নস্তরের প্রয়োজনগুলো সন্তোষজনকভাবে মেটাতে পারে বা দৃঢ়চিত্তে সেগুলো সংবরণ করতে পারে।

মাসলোর এই স্তরবিন্যাসে, সার্থকতাকে প্রশংসা বা সম্মান অর্জনের পর্যায়ে ফেলা যায়। মাসলো আগ্রাসনকে মানুষের সহজাত প্রয়োজনরূপে চিহ্নিত করেন নি। তাঁর মতে, মানুষের আগ্রাসী আচরণ, নিরাপত্তার অভাব বা ব্যর্থতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র। নিম্নস্তরে যৌনতা ও উচ্চস্তরে কান্তিলক্ষ্য অর্জনের প্রেষণা ব্যতীতও নূতন কিছু সৃষ্টি করার জন্য মানুষের যে চিরন্তন বাসনা, সেটিও মাসলো আলাদা করে চিহ্নিত করেন নি।

মাসলোর স্তরবিন্যাস মানুষের প্রেষণা ও আচরণ সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় মতবাদ হলেও, এর সমর্থনে সরাসরি প্রমাণাদি যথেষ্ট নয়। সামাজিকতার দাবীতে মানুষের আচরণে যে অনুরূপতা (conformity) এসেছে, মাসলোর মতবাদ মোটামুটি সেটাকেই প্রতিফলন করে। তিনি নিজে অবশ্য অনুরূপতার বিপক্ষেই মতামত রেখেছেন। কারণ, তাঁর মতে, মানুষের নিম্নস্তরের প্রয়োজনগুলো সন্তোষজনকভাবে মিটে গেলে সব মানুষ যার যার ইচ্ছানুসারে নিজনিজ আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধাববান হতে পারবে এবং অনুরূপতার তখন কোন প্রয়োজন থাকবে না।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া

উন্নত প্রাণীর আচরণে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (conditioned reflex action) একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত নয় ; এটা প্রাণীর স্বীয় জীবনকালে অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বা অভ্যাসের ফলে একটি প্রাণী যে তার স্বীয় স্বভাব বহির্ভূত ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে পারে, তার মূলভিত্তি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এর সৃষ্টি ও পরিচালনার কাজে সেরিব্রেল কর্টেক্স ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

সুবিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক পাভলভ সর্বপ্রথম সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করেন। সারাজীবন নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা পাভলভ সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার নানা দিক ও গুণাগুণ উদ্‌ঘাটন করেন। পাভলভের গবেষণার ফলাফল ও তাঁর মতবাদ কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সমগ্র জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ।

প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া (৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) জন্মগত। এর পেছনে যে স্নায়বিক কাঠামো ও সংযোগ রয়েছে তা জন্মগত এবং মোটামুটি স্থায়ী। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার স্নায়ুবিক সংযোগ অর্জিত ও অস্থায়ী। পরিকল্পিত উপায়ে একটি সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রাণীদেহে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, একে উল্টানো যায় এবং এর গুণাগুণ নানা দিক থেকে পরীক্ষা করা যায়। তবে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলাফল কোন একটি (বা একাধিক) প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

একটি সহজ উদাহরণ থেকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে। একটি কুকুরের মুখে খাদ্য স্থাপন করলে, তার মুখ থেকে লালা পড়ে। এটা একটি জন্মগত প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া। বলাবাহুল্য, কোন একটি বিশেষ ঘন্টার শব্দে কুকুরটির মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হয় না। কিন্তু বিশেষ ঘন্টার শব্দটিকে (অথবা অনুরূপ অন্য কোন উত্তেজনাকে) সহজেই প্রাণীটির লালা নিঃসরণের উত্তেজকরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়। পরপর কয়েকবার খাদ্য প্রদানের ঠিক পূর্ববর্তী ক্ষণে ঘন্টাটি বেজে উঠলে ও খাদ্যগ্রহণের সময় বাজতে থাকলে কিছুকাল পরে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, খাদ্য ছাড়া শুধু ঘন্টাটি বেজে উঠলেই কুকুরটির মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে এটা একটি সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে কুকুরটির স্নায়বিক সংযোগের ক্ষেত্রে কী সংঘটিত হচ্ছে? কুকুরটির মস্তিষ্কে শ্রবণ সংক্রান্ত কর্টেক্সের এলাকার সাথে লালা নিঃসরণ করার মোটর এলাকা মূলতঃ সংযোগহীন হলেও, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সুপ্ত যোগপথ ছিল। কয়েকবার সমকালীন উত্তেজনার ফলে এই

সুপ্ত যোগপথে সক্রিয় যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলেই শ্রবণ-সংক্রান্ত এলাকার উত্তেজনা, প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে লালা নিঃসরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে। এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াটি নুতনভাবে অর্জিত এবং পূর্ববর্তী কতগুলো ঘটনাসাপেক্ষ। সে কারণেই এটি একটি সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া।

বহু পরীক্ষার ফলে এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোন একটি প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সংঘটনকালে, এর সাথে পূর্বে সক্রিয় সংযোগ নাই এরূপ একটি সংবেদী উত্তেজনা পরপর কিছুকাল সংঘটিত হলে, সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে, পূর্বে সক্রিয় সংযোগ ছিল না, এরূপ দুটি কেন্দ্রের মধ্যে নুতন সক্রিয় যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। একটি প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলাফল একদিকে যেমন উত্তেজক(যথা: লালা নিঃসরণ) হতে পারে, অপরদিকে তেমনি তা প্রতিবন্ধকও (যথা : লালা নিঃসরণ প্রতিরোধ করা) হতে পারে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলে মূলত যে কোন সংবেদী উত্তেজনাই যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তবে এর পেছনে প্রাণীটির যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা গ্রহণের ইতিহাস থাকতে হবে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মর্মার্থ : অনির্দিষ্ট প্রতিবেশের পরিবর্তনসমূহের সাথে সংযোজনের জন্য সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া একটি মূল্যবান প্রক্রিয়া। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে, উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য অর্জন ও জীবন সংগ্রামে অধিকতর সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়াই শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটির মূল চাবিকাটি। জীবনকালে অর্জিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া, কালক্রমে প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সব প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মূল লক্ষ্যই এক—এরা প্রতিবেশের সাথে অভিযোজন ও সাম্যাবস্থা রক্ষার কাজে প্রাণীকে সক্ষমতা প্রদান করে। তবে অনমনীয় ও একক লক্ষ্যবিশিষ্ট প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ক্ষমতা সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাথে সংযোজিত হবার ফলে, উন্নত প্রাণীর আচরণে ও অস্তিত্বে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ধারণ সম্ভবপর হয়েছে। শিক্ষাগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণীজগতে মানুষের প্রয়াসই শ্রেষ্ঠ।

সংবেদী ও মোটর অংশের মধ্যে যে প্রাথমিক যোগাযোগ ছিল, বিবর্তনের ফলে এর সাথে বহু মধ্যবর্তী ও পরিমেলকারী যোগপথ সংযোজিত হয়েছে। যোগপথটি ছিল একটি বৃত্তচাপের মতো। নূতন নূতন স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুপথের সংযোজনের ফলে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অসংখ্য চক্রপথের (বা Circuit) সৃষ্টি হয়েছে। মস্তিষ্কে নিউরনগুলি কেবল স্নায়ুপথই নয়, চক্রাকৃতির স্নায়ুপথও সৃষ্টি করে। চক্রাকৃতির স্নায়ুপথ মস্তিষ্কে এতই সাধারণ যে, কেউ কেউ 'বিপরীতমুখী সংযোগের আইন'কে মস্তিষ্কের সাধারণ নিয়ম বলে গণ্য করেন। 'বিপরীতমুখী সংযোগ' বলতে চক্রাকৃতির স্নায়ুপথের কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যদি কোন একটি স্নায়ুকেন্দ্র 'A' থেকে অন্য একটি স্নায়ুকেন্দ্র 'B' পর্যন্ত একটি স্নায়ুপথ থাকে, তবে অবশ্যই 'B' থেকে 'A' পর্যন্ত অপর একটি স্নায়ুপথও (সরাসরি বা কোন মধ্যবর্তী নিউরনের মাধ্যমে) সংস্থাপিত রয়েছে (চিত্র ১৪.১ দ্র:)।

বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন করে স্নায়বিক পথ স্থাপন করা সম্ভব নয় এবং এর কোন প্রামাণও নেই। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো ও এদের শাখাপ্রশাখার অবস্থান প্রায় সম্পূর্ণরূপে জন্মগত। সুতরাং একথা বলা যায় যে, পথের কাঠামো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল, কিন্তু পূর্বে সেটি একটি সুপ্ত পথরূপে অবস্থান করতো। সে পথে সচরাচর কোন যোগাযোগ বা বার্তা সঞ্চালন হতো না। কোন একটি প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সাথে সমুত্তেজনার ফলে, দুটি স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে পূর্বে যেখানে সক্রিয় সংযোগ ছিল না, সেখানেই একটি অস্থায়ী ও সক্রিয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুপ্ত পথটি উজ্জীবিত হয়ে উঠলেই এরূপ যোগাযোগ সম্ভব। চক্রাকৃতির স্নায়ুপথে কি করে তা সম্ভব হতে পারে, তারই নমুনা চিত্র ১৪.১–এ দেখানো হয়েছে।

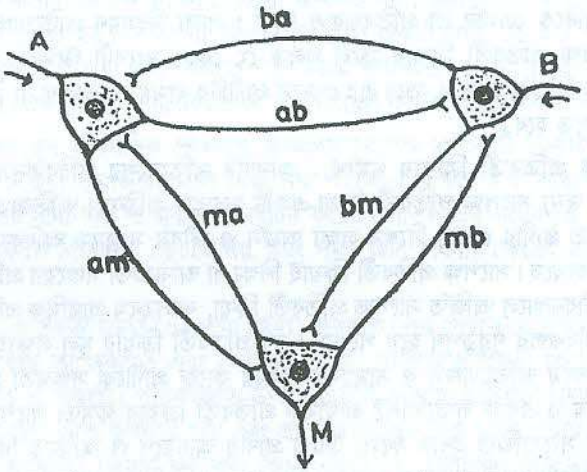

চিত্র ১৪.১ : তিনটি পরস্পর সংযুক্ত নিউরনের মধ্যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। A এর উত্তেজনা am পথে M কে উত্তেজিত করতে সক্ষম। অথচ bm পথে উত্তেজনা জন্মগতভাবে M কে উত্তেজিত করে না। a ও b উভয়পথে যুগপৎ উত্তেজনার ফলে সুপ্ত bm পথ উজ্জীবিত হয়। তখন B এর উত্তেজনা M কে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয়।

নূতন ও অস্থায়ী যোগাযোগটি উপর্যুপরি ব্যবহারের ফলে কালক্রমে মোটামুটি স্থায়ীরূপ ধারণ করতে পারে। তখন প্রাণীটির সামগ্রিক আচরণই পরিবর্তিত বলে লক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে অস্থায়ী সক্রিয় সংযোগ স্থাপনকে কেন্দ্র গুলির 'কাউপলিং' (Coupling) করা বলা যায়। এরূপ 'কাউপলিং' করার ক্ষমতা প্রধানত মস্তিষ্কেই বিদ্যমান ; স্নায়ুতন্ত্রের নিম্নস্তরে প্রক্রিয়াটি অবর্তমান। প্রকৃতপক্ষে 'কাউপলিং' কিভাবে বাস্তবায়িত হয় ও স্থায়ীরূপ গ্রহণ করে, তা এখনও অজ্ঞাত। সুপ্ত স্নায়ুপথটিতে নিশ্চয়ই প্রথমে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল। পুনঃপুনঃ সমুত্তেজনার ফলে সেই প্রতিবন্ধকতা কোন উপায়ে দূরীভূত হচ্ছে। কিন্তু 'কাউপলিং' এর প্রক্রিয়াটি কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে, অর্থাৎ প্রক্রিয়াটির পেছনে পূর্বাপর কি

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বস্তুগত (স্নায়বিক বা রাসায়নিক) পরিবর্তন সাধিত হয়, তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি।

সেরিব্রামের উভয়দিকের কর্টেক্স সরিয়ে ফেললে, সব অর্জিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া লোপ পায় এবং নূতন করে তা আরোপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আপাত দৃষ্টিতে কর্টেক্সের সংযোগহীন অন্য কোন এলাকা সরিয়ে ফেললেও সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া কমবেশী প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এ সব কারণে পূর্বে মনে করা হতো যে, সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে সব নূতন যোগাযোগের সৃষ্টি হয়, এরা শুধু কর্টেক্সেই অবস্থিত। কিন্তু বর্তমানে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে মনে হয়, যদিও কর্টেক্স সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এর কিছু কিছু নূতন সংযোগ কর্টেক্সের নিম্নবর্তী অংশেও স্থাপিত হয়।

পাভলভের পরীক্ষা থেকে একথা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, কোন সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংবেদী উত্তেজনা সমস্থানীয় ও সমকালীনভাবে উপস্থিত থাকতে হবে। যে নতুন উত্তেজনাটি সংযোজনা করা হবে, সেটি প্রথমে প্রয়োগ করতে হবে। পুনঃ পনুঃ সমুত্তেজনা সংঘটনের ফলে সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়াটির শক্তি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং অনভ্যাসে তা লুপ্ত হয়ে যায়। এখানেও পূর্বে আলোচিত (৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পুনরপি বলীয়ানের প্রক্রিয়াটি কার্যকর বলে মনে হয়। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রতিষ্ঠাকালে প্রাণীটির জন্য 'পুরষ্কার' (যা আনন্দদায়ক) অথবা 'শাস্তি' (যা বেদনাদায়ক)— এই পার্থক্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পুরস্কারের ফলে 'ধনাত্মক পুনরপি বলীয়ান' (positive reinforecment) এবং শাস্তির ফলে 'ঋণাত্মক পুনরপি বলীয়ান' (negative reinforcement) লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণাগারে পরীক্ষার সময় যে সব সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রাণীর মধ্যে আরোপ করা হয়, এরা সচরাচর নিশ্চেষ্ট এবং অনৈচ্ছিকভাবে আরোপিত। স্বাভাবিক জীবনে প্রাণীর ও মানুষের প্রকৃত শিক্ষালাভ বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিষয়টি সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল হলেও, এরা অনেক বেশি জটিল এবং স্মরণশক্তির সাথে জড়িত। একারণেই শিক্ষা ও স্মরণশক্তিকে উন্নতর মানসিক ক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপলব্ধি

উপলব্ধি (perception) একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক সংবেদী উত্তেজনা ও মস্তিষ্কে অবস্থিত উপলব্ধি প্রক্রিয়ার মিলিত ফলরূপে উপলব্ধির অভিজ্ঞতাটি মানসে প্রতীয়মান হয়। উপলব্ধির বিষয়টি নিয়ে চিরদিনই দার্শনিকেরা বহু জল্পনা-কল্পনা করেছেন। তাঁদের আগ্রহের বিষয়টি মূলত জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) এর দিক থেকে। তাঁদের অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যই কি মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে একটা বাস্তব জগৎ নিজ থেকে বিদ্যমান? যদি তাই হয়, মানুষ কি করে সেই জগৎটির গুণাগুণ এবং তার সত্যতা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীত নির্ণয় বা বর্ণন করতে পারে? তাঁরা আরো প্রশ্ন করেন, মানুষের সব অভিজ্ঞতাই কি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির সাথে বহির্জগতের মিথষ্ক্রিয়ার ফল, নাকি তা ব্যতীতও স্বনির্ভর ভাব (idea) ও একটি ভাবজগৎ বিরাজমান?

শরীরবিদ্যা বা মনোবিদ্যা সচরাচর এসব প্রশ্ন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে না। বিজ্ঞানীরা জানতে চান, কিভাবে বাইরের জগতের তেজসমূহ (যথা : আলোক, শব্দ, ইত্যাদি) ও ইন্দ্রিয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় উপলব্ধির সৃষ্টি হয় এবং এর প্রক্রিয়াটি কি? তাঁরা আরো জানতে চান, ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবে অবস্থিত বস্তু ও প্রক্রিয়াদির মধ্যে কতটুকু সাদৃশ্য বা কখন কোথায় কতটুকু গরমিল।

বিংশ শতাব্দীতে জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রচলিত গেস্টাল্ট (Gestalt) মতবাদ অনুসারে যে কোনো তাৎক্ষণিক মানবিক অভিজ্ঞতা একটি সুসংবদ্ধ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার ফল—এটা কতোগুলি মৌলিক উপাদানের যোগফল নয়। গেস্টাল্টবাদীরা (যথা : ম্যাক্স ওয়ার্থেমার, কুট কাফ্‌কা, উলফ্‌গেং কোহলার, ইত্যাদি) মনে করেন না যে প্রতিটি উপলব্ধির পশ্চাতে পূর্ববর্তী (বা শিক্ষাপ্রাপ্ত) অভিজ্ঞতাসমূহ রয়েছে এবং তাদের সংযোগের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির সৃষ্টি হয়। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষকরণই প্রতিটি অভিজ্ঞতার মূল উৎস; সুতরাং উপলব্ধির প্রক্রিয়া ও মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া-এই দুটি সমপর্যায়ের (isomorphic)। উপলব্ধি সংক্রান্ত অনেক গবেষণাই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে গবেষণার সমতূল্য।

উপলব্ধির ব্যক্তিগত বর্ণনার উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান গবেষণা বেশীদূর এগুতে পারেনা, কারণ তাতে যথেষ্ট বিষয়মুখতা (objectivity) থাকে না। এরূপ ধারণা থেকেই আচরণবাদ বা বিহেভিয়রিজম (Behaviorism)-এর জন্ম হয়। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের বা প্রাণীদের সকল আচরণই পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং বিশ্লেষণযোগ্য। তেমন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ কার্য-কারণনীতি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। আচরণবাদীরা উপলব্ধির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে নন। তবে তাঁদের মত এই যে, যেহেতু এক

ব্যক্তির উপলব্ধি অপর ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করতে পারেনা, সুতরাং পরীক্ষণযোগ্য আচরণ থেকেই অপরের উপলব্ধি সম্পর্কে ধারণা করতে হবে—অন্য কোনোভাবে নয়।

বিষয়মুখ উত্তেজনা ও মস্তিষ্কে তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অনেকটা বার্তা-বিশ্লেষণ (Information processing) করার সামিল। বার্তা-বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন করে উপলব্ধি সম্পর্কে অনেক নূতন তত্ত্বীয় বিষয় উৎঘাটন করা হয়েছে (যথা : কোনো কোনো উপলব্ধির বিমূর্ত মডেল) এবং এখনো হচ্ছে। কম্পিউটার ভিত্তিক এমন প্রোগ্রাম আবিষ্কৃত হয়েছে, যা দৃশ্যমান নমুনা বা প্যাটার্ণ এর মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারে এবং একটি প্যাটার্ণ এর অনুরূপ অপর একটি তৈরী করতে পারে। অনুরূপে একজন সুরকারের কতিপয় সুর বিশ্লেষণ করে অনুরূপ নূতন সুর তৈরি করাও যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন একজন অন্ধ ব্যক্তি একটি কৃত্রিম যান্ত্রিক চোখের সাহায্যে তার দৃষ্টি ফিরে পাবে।

সংবেদন ও উপলব্ধি : সংবেদন (sensation) ও উপলব্ধির মধ্যে মৌলিক কিছু তফাৎ রয়েছে। সংবেদন কোনো না কোনো ইন্দ্রিয়ের উপরে ভিত্তি করে সরাসরি সৃষ্ট অনুভূতি। ইন্দ্রিয়টি বিকল হলে অনুভূতিটিও আর থাকে না। উপলব্ধির বিষয়টি আরো জটিল ; সেটি ঘটে অনেকগুলি প্রক্রিয়ার সমন্বয় বা পরিমেলের মাধ্যমে। উপযুক্ত অন্তর্দর্শী একটি উপলব্ধি বিশ্লেষণ করে এর সহজতর উপাদানগুলি সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। গেস্টাল্টবাদীরা যাই বলুন না কেন, উপলব্ধির প্রক্রিয়াটির সাথে সংশ্লেষণ (synthesis) করার ক্ষমতা ও পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে : আপাত দৃষ্টিতে সংবেদনের জন্য তেমনটির প্রয়োজন হয়না। একটি বিশেষ ধরনের উত্তেজনা সর্বদা (ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত) একই ধরনের সংবেদন বা অনুভূতির সৃষ্টি করে ; উপলব্ধি বিভিন্ন সময়ে (যথা : শিক্ষার পূর্বে ও পরে) ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে।

শরীরবিদ্যার দিক থেকে বলা যায় : সংবেদন একটি স্নায়বিক প্রক্রিয়া যার শুরু ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহী যন্ত্রে ও তার সাথে সংযুক্ত সংবেদী স্নায়ুতন্তুতে, এবং তার শেষ মস্তিষ্কের সংবেদী কেন্দ্রসমূহে ও সংবেদী এলাকায় (পৃ. ৪৮-৫০)। উপলব্ধির প্রক্রিয়াটি মূলত মানসিক; এর সৃষ্টি মস্তিষ্কের উচ্চস্তরে জটিল স্নায়বিক যোগাযোগ পথসমূহকে ও চেতনাকে ভিত্তি করে।

সংবেদনের অনুভূতি মোটামুটি তাৎক্ষণিক কিন্তু উপলব্ধির বিষয়টি কিছুটা হলেও অধিক সময়সাপেক্ষ। বিভিন্ন পরিমাপের মধ্যে ভেদাভেদ, সময় কটা হতে পারে, ভিড়ের মধ্যে পরিচিত মুখটি চিনে নিতে কিংবা একটি বই-এর শেল্‌ফে মোটামুটি কতটি বই থাকতে পারে—এরূপ সাধারণ বিষয় উপলব্ধি করতেও আমাদের যে বেশ সময় ব্যয় হয় সেটা আমরা সকলেই জানি। পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে ভেদাভেদ বা পরপর সাজানো কয়েকটি সংখ্যার মধ্যে একটি যোগাযোগ নির্ণয় করতে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন সময় লাগে। এমন কতোগুলি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জন্মগত ও সংসর্গ অভ্যাসে লব্ধ বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করা যায়।

বুদ্ধিমত্তা নির্ণয়ের জন্য উপলব্ধি সংক্রান্ত পরীক্ষাদির ফলাফল বিতর্কমূলক হলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় যে সাধারণ উপলব্ধি করার জন্য একটি মানুষের যে সংক্ষিপ্ত

সময় (১০০ থেকে ২০০ মিলি সেকেন্ড) প্রয়োজন, ঐ সময়ে উপলব্ধিটি এলোমেলো হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। উপলব্ধির বিষয়টি জটিলতর হলে প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণ হতে আরো বেশি সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু তেমন ক্ষেত্রে উপলব্ধিটি এলোমেলো হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি না হয়ে বরং কমে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে সময়ের উপলব্ধি বিষয়টি অন্যত্র (পৃষ্ঠা ১১৬–১১৭ দ্র:) আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ ও প্রাণীদের উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পূর্বতন উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাসমূহ একই ধরনের পরবর্তী উপলব্ধি অর্জনে একটি প্রধান ভূমিকার কাজ করে। একই ধরনের উপলব্ধি পুনঃ পুনঃ অর্জিত হলে প্রাণীদেহে সেটা মস্তিষ্কের ওজন ও রাসায়নিক পরিবেশের উপরে প্রভাব বিস্তার করে বলেও প্রমাণ রয়েছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, যেসব শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী বা শিশুকালে মৌলিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বুদ্ধিমত্তা অর্জন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেন তাদের জন্য অধিক সময় ও বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য।

উপলব্ধির নিশ্চয়তা ও ব্যতিক্রম : দৃশ্যমান বস্তুর আকার আকৃতি, উজ্জ্বলতা, রং, দূরত্ব আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। তবে উপলব্ধিটি 'সঠিক' কিনা সেটা অনেক সময়ে অন্যান্যদের উপলব্ধির সাথে যাচাই করে দেখতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপলব্ধির 'নিশ্চয়তা'য় ব্যতিক্রম হয়। দূরত্ব অনেক বেশি হলে বস্তুটি ছোট বলে মনে হয় ; সমান্তরাল রেল পথ দুটি মনে হয় দূরে গিয়ে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। বয়সের সাথে সাথেও উপলব্ধি করার ক্ষমতা কম বেশি হয়—দশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু বার্ধক্যে কমে যায়। আমাদের সময়ের উপলব্ধিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার। চারিদিকে যখন সুখ, মনে হয় যেন সময়ের চাকা দ্রুততর বেগে ঘুরছে। অতীতের কথা যখন স্মরণ করি, তখন ঘটনার কাল-পরিমাণ (duration) সম্পর্কে স্মৃতি এলোমেলো হয়ে যায়। কোনো কোনো মানুষ জন্ম থেকেই বিশেষ এক বা একাধিক রং দেখতে পায়না বা উপলব্ধি করেনা। বিভিন্ন পরিবেশ ও সংস্কৃতি মানুষকে অনেক কিছু ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধি করতে শিক্ষা দেয়। বিশেষ বিশেষ ওষুধের প্রভাবেও উপলব্ধি করার ক্ষমতা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে (যথা : গাঁজা, এল. এস. ডি. ইত্যাদি)।

মনঃসমীক্ষণবিদরা মনে করেন, যে সব উপলব্ধির সাথে প্রেষণা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে—এমন কি সময়ের ব্যবধানে (অর্থাৎ প্রেষণার পূর্বে ও পরে) একই ব্যক্তির উপলব্ধিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হতে পারে। অনেক পরীক্ষায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের ক্ষেত্রে, তার উপলব্ধি করার প্রক্রিয়াটির উপরে তার মনের নির্জ্ঞান স্তরের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

উপলব্ধির বিভ্রান্তি : আত্মমুখ (subjective) উপলব্ধি যখন বিষয়মুখ (objective) বাস্তবতাকে অন্যরূপ বলে ধারণা করে তখন তাকে উপলব্ধির বিভ্রান্তি (illusion) বলা যায়। সকল বিভ্রান্তিই মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, তেমনটি নয়; সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষেরও ক্ষেত্রবিশেষে উপলব্ধির বিভ্রান্তি হতে পারে। বাস্তব জগৎ থেকে উদ্‌গত সংবেদী বার্তাসমূহকে ভিত্তি করে মস্তিষ্কে উপলব্ধির সৃষ্টি হয়। বিভ্রান্তির ফলে বহির্জগতের কোনো বস্তু বা ঘটনা

সম্পর্কে মানসপটে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়, যা 'সঠিক' নয় বলে বিচার বিবেচনা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তেমন ধারণা জন্মাবার কারণটি উপলব্ধিকারকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবেদী যন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কারণেও বিভ্রান্তি হতে পারে। আবার একই বস্তুকে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রকম মনে হতে পারে।

যে কোনো ইন্দ্রিয়কে সংশ্লিষ্ট করেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। একই ওজনের একটি বস্তু হাতে নেবার পরে অপরটি হাতে নিলে সেটা পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা হালকা বা বেশি ভারী মনে হয়। একটি দুর্গন্ধ যা প্রথমে অত্যন্ত প্রকট সেটাই পরে সহনীয় হয়ে যায়। দুটি শব্দ পরপর শোনা গেলে, দ্বিতীয়টি কত জোরাল সেটি প্রথমটির সাথে তুলনা করে আমরা ধারণা করি। চলচ্চিত্র বা সিনেমা একটি বিশেষ ধরনের বিভ্রান্তির উপরে নির্ভরশীল ; পাশাপাশি অবস্থিত অনেকগুলি স্থির ছবির চলমান ছায়া পরপর পর্দায় ফেলে চলচ্চিত্র একটি বিভ্রান্তিকর চলমানতা সৃষ্টি করে।

চিত্র ১৫.১ : 'ছবি ও পটভূমি' এর বিভ্রান্তি (বিবরণ : পাঠ্যাংশে দেখুন)

দৃষ্টিসংক্রান্ত বিভ্রান্তির কয়েকটি সহজ অথচ চমৎকার উদাহরণ চিত্রাকারে এখানে সংযোজন করা হল। ১৫.১ চিত্রটিকে বলা হয় 'ছবি ও পটভূমি' এর বিভ্রান্তি। এই চিত্রে সাদা অংশটির দিকে তাকালে মনে হবে যেন একটি ফুলদানীর ছবি ; পরক্ষণে কালো পটভূমির

দিকে তাকালে মনে হবে পার্শ্ব থেকে দেখা দুটি মানুষের প্রতিকৃতি, যারা মুখোমুখি বসে আছে। যখন ফুলদানীটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন মুখ দুটির অস্তিত্ব ধরাই পড়েনা ; অনুরূপে দৃষ্টি যখন মুখ দুটিতে নিবদ্ধ, তখন ফুলদানীর অস্তিত্ব মানস থেকে বিলীন হয়ে যায়।

দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতার মাপে আমাদের চোখ ও উপলব্ধি কত যে ভুল করতে পারে ১৫.২ চিত্রটি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটিকে বলা হয় উঁচু টুপির বিভ্রান্তি (Top-Hat illusion)। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় টুপিটির উচ্চতা তার ধার বা প্রস্থ থেকে যেন অনেক বেশি ; বাস্তবে এর উচ্চতা ও প্রস্থ সমান। খাড়া অংশটি ধার বা প্রস্থটিকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করে বলে ধারটিকে ছোট মনে হয়। তাছাড়া ছবিতে খাড়া অংশটি আকারে সরু ধারটির তুলনায় অনেক বড় বলেও উচ্চতাটি বড় মনে হয়।

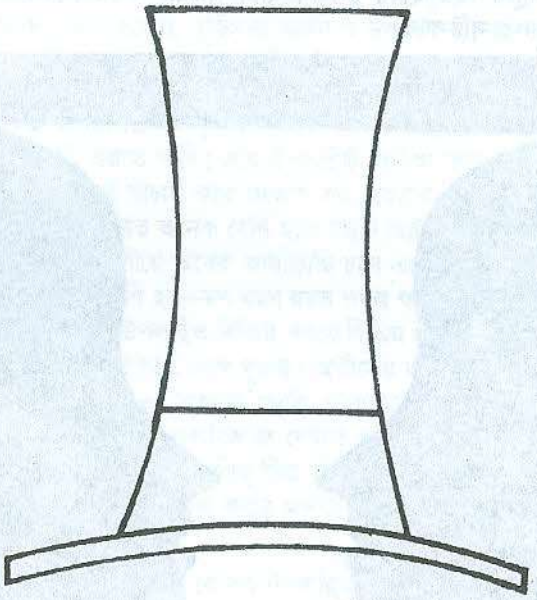

চিত্র ১৫.২ : উঁচু টুপির বিভ্রান্তি (বিবরণ : পাঠ্যাংশে দেখুন)

১৫.৩ চিত্রে দৃষ্টি সংক্রান্ত বেশ কটি ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। (ক) অংশে "নেকার কিউব"টি (Necker cube) দেখে একবার মনে হয় এটি একদিকে মুখ করে, আবার পরক্ষণে মনে হয় অন্যদিকে মুখ করে। (খ) অংশে "মুলার-লাইয়র" (Müller-Lyer) বিভ্রান্তিটি অভিসারী (convergent) ও অপসারী (divergent) রেখার উপলব্ধিকে ভিত্তি করে ; মধ্যের সরল রেখা দুটি ছোট বড় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা সমান। পার্শ্বের ছোট ছোট রেখাগুলি উপলব্ধিকে কেন্দ্রমুখী বা বহির্মুখী করে তুলে। (গ) অংশে "পগেনডর্ফ" (Poggendorff) বিভ্রান্তিটির কারণ ছেদনকারী রেখাটি অতিরিক্ত মাত্রায় খাড়া হবার জন্য ;

মাঝামাঝি আয়তক্ষেত্র ছেদন করা হলে ছেদনকারী রেখাটিকে সরল রেখা বলেই প্রতীয়মান হবে। (ঘ) অংশে "জোলনার" (Zöllner) বিভ্রান্তিটিতে ছোটছোট ভিন্নমুখী রেখা সমান্তরাল রেখাগুলিকে কাটাকাটি করার ফলে উপলব্ধি এলোমেলো হয়। (ঙ) অংশে "প্রনজো" (Pronzo) বিভ্রান্তিতে যে বৃত্তটি অভিসারী রেখাদ্বয়কে স্পর্শ করে আছে সেটিকে মুক্ত অপর বৃত্তটি অপেক্ষা বড় মনে হয়, যদিও দুটি বৃত্তই সমান (চ) অংশে "হেরিং" (Hering) বিভ্রান্তিতে পটভূমিকায় অপসারী রেখাগুলির জন্য মধ্যবর্তী সমান্তরাল রেখা দুটি অসমান্তরাল রূপে প্রতীয়মান হয়।

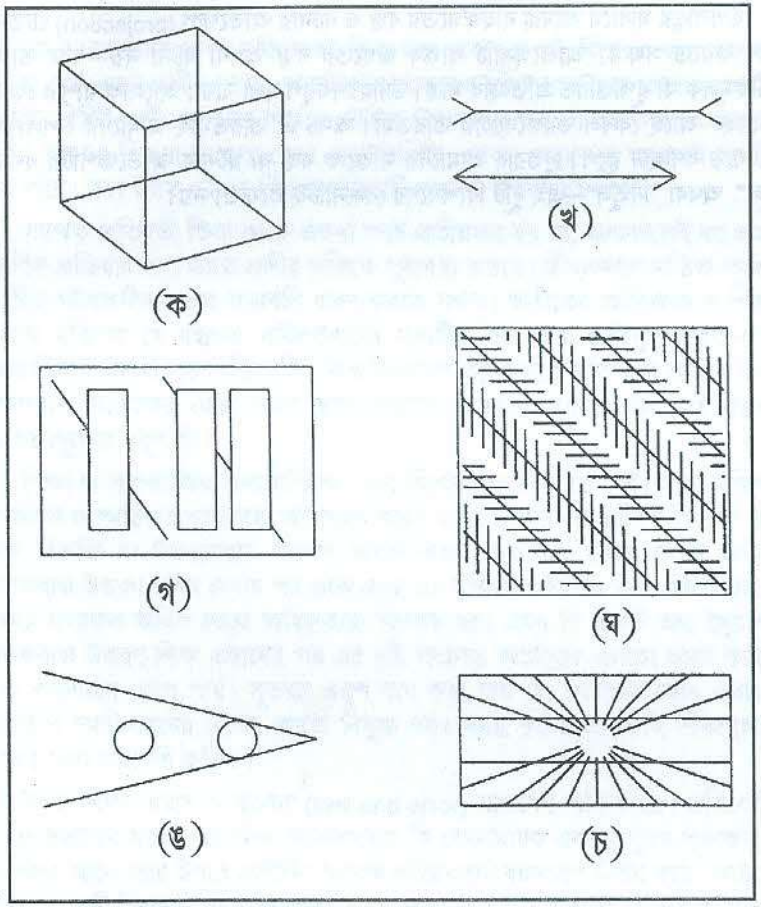

চিত্র ১৫.৩ : দৃষ্টি সংক্রান্ত বিভ্রান্তির কতিপয় উদাহরণ।
(ক) "নেকার কিউব"; (খ) "মুলার-লাইয়র" বিভ্রান্তি ; (গ) "পগেনডর্ফ" বিভ্রান্তি ; (ঘ) "জোলনার" বিভ্রান্তি ; (ঙ) "প্রনজো" বিভ্রান্তি ; (চ) "হেরিং" বিভ্রন্তি।
[বিবরণ: পাঠ্যাংশে দেখুন]

বিভ্রান্তি নিয়ে আর একটি সমস্যা : দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত বিভ্রান্তিগুলি আমাদের মস্তিষ্কের বিচার বিবেচনার "ভুল" এটা মনে করা ঠিক নয়। কারণ সেই যুক্তিতে এটাও তখন বলা চলে যে আমাদের অন্যান্য উপলব্ধিগুলি সবই "নির্ভুল" বা "সঠিক"। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে এতো সহজ নয়। "নির্ভুল" বলতে যদি আমরা মনে করি যে উপলব্ধি আমাদের মনে বহির্জগতের বস্তু ও ঘটনাবলীর "প্রকৃত স্বরূপ" প্রতিফলন করে, তবে অন্য কেহ এটাও বলতে পারে যে সকল উপলব্ধিই বিভ্রান্তের সামিল (কারণ, বিভ্রান্তিগুলিতো সবই খাঁটি উপলব্ধি)।

উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা বহির্জগতের বস্তু ও ঘটনার অভিক্ষেপ (projection) চেতনায় ধারণ করতে সক্ষম। অভিক্ষেপটি বাস্তব জগতের বস্তু অথবা ঘটনা নয়—বরং তাদের প্রতীকমূলক বা রূপান্তরিত প্রতিচ্ছবি মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় : আলোক রশ্মির কোনো রং নেই—আছে কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তারতম্য। অথচ ঐ তারতম্যই আমাদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে বর্ণচ্ছটা রূপে। সুতরাং আমাদের মস্তিষ্কে বস্তু বা ঘটনার অভিক্ষেপটির বর্ণনায় "ভুল" অথবা "নির্ভুল"—এই দুটি বিশেষণের কোনোটিই প্রযোজ্য নয়।

ষোড়শ অধ্যায়

শিক্ষা ও স্মৃতি

শিক্ষাকে অনেক সময় কেবল মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া বলে মনে করা হয়, কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। মস্তিষ্ক নেই, এমন প্রাণীর (যথা : অকটোপাস) ক্ষেত্রেও শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। এমন কি, এককোষবিশিষ্ট প্রাণীর ক্ষেত্রেও শিক্ষার মৌলিক উপাদানগুলো লক্ষ্য করা সম্ভব। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রেও শিক্ষার সমতুল্য কোন কোন প্রক্রিয়া, কেবল মেরুরজ্জুর মাধ্যমেই সংঘটিত হতে পারে। তবে উন্নত ধরনের শিক্ষার প্রক্রিয়াটি প্রধানত মস্তিষ্কেরই কাজ।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জন্মকালেই বহু প্রচ্ছন্ন স্নায়বিক প্রক্রিয়ার জন্য উন্নত প্রাণীর মস্তিষ্কে সুব্যবস্থা রয়েছে। জীবনকালে মস্তিষ্ক পূর্ববর্তী স্নায়বিক ঘটনাবলীর প্রভাব কমবেশি ধারণ করতে সক্ষম। অতীতের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে মস্তিষ্কে যে বস্তুগত পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হয়, তার প্রতিরূপ ধারণ করার ক্ষমতাটিকেই আমরা স্মরণশক্তি বলি। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রশ্ন হলো : অভিজ্ঞতা অর্জনে অথবা শিক্ষালাভে মস্তিষ্কের কোন কোন স্থানে বস্তুগত পরিবর্তন আসে এবং সেই বস্তুগত পরিবর্তনগুলোর স্বরূপ কী?

শিক্ষা বা স্মরণশক্তির জন্য মস্তিষ্কে কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। সমগ্র মস্তিষ্কই শিক্ষালাভ ও স্মৃতিধারণের কাজে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সমগ্র ব্যবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করে কোন বিভক্তি বা উপব্যবস্থার প্রকল্প নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কোন একটি প্রাণীকে গোলকধাঁধা উত্তরণ শিক্ষা দেবার পর একে একে এর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ধ্বংস করলে, শিক্ষার ফলাফল অধিক থেকে অধিকতরো বিপর্যস্ত হয়। এমন কি একটি অন্ধ ইঁদুরকেও গোলকধাঁধা উত্তরণ শিক্ষা প্রদানের পর এর দৃষ্টি সংক্রান্ত কার্টেক্সের এলাকা ধ্বংস করলে, শিক্ষা বহুলাংশে লোপ পায়। সুতরাং এরূপ মনে করা যায় যে, কর্টেক্সের কোন এলাকাই বিচ্ছিরূপে স্মৃতিধারণের বিশেষ কাজে নিযুক্ত নয়। সমগ্র কর্টেক্স এলাকাই শিক্ষাগ্রহণের কাজের সাথে কমবেশি জড়িত।

সহজ শিক্ষা 'প্রয়াস ও ভুলের' (trial and error) মাধ্যমেই অর্জিত হয়। প্রতিবেশিক বিভিন্ন প্রভাবের সাক্ষাৎ ফলাফল, আনন্দদায়ক কি বেদনাদায়ক এবং সেগুলো পুরস্কার না তিরস্কার আনে, তার উপরে প্রাণীটির সাপেক্ষ প্রতিযোজন বহুলাংশে নির্ভর করে। কর্টেক্সের বিভিন্ন সংবেদী বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সাপেক্ষ সংযোগের উপরেই শিক্ষার কাঠামোটি নির্ধারিত হয়। শিক্ষার বিষয়টি গতিসঞ্চালক কাজের সাথে যুক্ত থাকলে (যথা : সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো), সংযোগের ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট মোটর এলাকাগুলোতে বিস্তৃত হয়। সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মতো শিক্ষার মাধ্যমেও সুপ্ত সংযোগপথগুলো উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।

বানরজাতীয় প্রাণী ও মানুষের মস্তিষ্কে পার্শ্ববর্তী খণ্ড দুটি শিক্ষাগ্রহণ ও স্মরণশক্তির সাথে বিশেষরূপে জড়িত বলে মনে করা হয়। পার্শ্ববর্তী খণ্ডে আঘাত পেলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের স্মরণশক্তি (সাক্ষাৎ কিছুকাল পূর্ববর্তীকালীন ঘটনার স্মৃতি) আংশিক বা পূর্ণ লোপ পায়। এটাও লক্ষণীয় যে পার্শ্ববর্তী খণ্ডে বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রয়োগ করলে, কোনো কোনো পুরানো স্মৃতি স্বপ্নের মতো চেতনায় ভেসে উঠে। তবে কর্টেকসের অন্যান্য এলাকাগুলির পরোক্ষ উত্তেজনার জন্যও এরূপ হতে পারে।

শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া ও স্মৃতি মস্তিষ্কে কী পরিবর্তন আনে তা এখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরিবর্তনসমূহ কেবল নিউরনগুলির মূলদেহে না স্নায়ুতন্তুতে, না সিনাপ্‌স্‌গুলিতে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাও অনিশ্চিত। পরিবর্তনের ফলে স্নায়ুকেন্দ্রগুলোর কার্যগত তারতম্য এবং সম্পূর্ণ প্রাণীটির (অথবা মানুষের) আচরণিক প্রতিক্রিয়ার তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু পরিবর্তনগুলোর ভৌত দিকসমূহ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি।

স্মৃতিধারণ প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ : এটা প্রায় নিশ্চিত যে উন্নত প্রাণীর স্মৃতিধারণ প্রক্রিয়াটি কোন একক প্রক্রিয়া নয়। কমপক্ষে তিনটি ভিন্নভিন্ন প্রক্রিয়া এর সাথে জড়িত। এদের প্রথমটি কেবল তাৎক্ষণিক ঘটনার স্মৃতি অস্থায়ীভাবে ধারণ করে ; দ্বিতীয়টি কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত পূর্ববর্তী ঘটনার স্মৃতি ধারণের কাজে নিযুক্ত ; এবং তৃতীয়টি মোটামুটি স্থায়ী সুদুর অতীত ঘটনার স্মৃতি সংরক্ষণ করে।

মস্তিষ্কে হঠাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক শক প্রদান করা হলে, অনেকক্ষেত্রে ঘটনাটির পূর্ববর্তী কিছুকালের স্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ পায় (retrograde amnesia)। এরূপ ক্ষেত্রে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিনের স্মৃতিও লোপ পেতে পারে, কিন্তু স্থায়ী পুরাতন স্মৃতি লোপ পায় না। প্রশিক্ষণকালে প্রতিটি অনুষ্ঠান শেষ হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাণীকে অবেদন (anaesthetize) করা হলে বা এটিকে বৈদ্যুতিক শক্ প্রদান করা হলে, শিক্ষালাভের প্রক্রিয়াটিকে প্রতিহত করা যায়। এসব দৃষ্টান্ত থেকেই মনে করা হয়, বার্তাসমূহকে স্মৃতিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী স্মৃতি ধারণ বা সংরক্ষণের জন্য ভিন্নভিন্ন প্রক্রিয়া দায়ী।

অস্থায়ী স্মৃতি ধারণের প্রক্রিয়াটির সাথে লিম্‌বিক্ তন্ত্রের হিপোকেম্পাস অংশ ঘনিষ্ঠভাবে জঠিত। মস্তিষ্কের দুপাশের হিপোকেম্পাস অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, প্রাণীর ও মানুষের অস্থায়ী স্মৃতিধারণ বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের স্থায়ী স্মৃতি অক্ষত থাকে। এমনকি সে কাজও করতে পারে, কিন্তু কাজের মাঝখানে মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে দিলে, কাজের কথাটি ও কি কাজ করছিলো তা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এরূপ ব্যক্তি নূতন কোন স্থায়ী স্মৃতি সংগ্রহ করতে পারে না।

মস্তিষ্কের উভয় পাশ্ববর্তী খণ্ডে কর্টেক্স ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে দেখা যায়, ব্যক্তিটি সহজ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এর স্মৃতি মাত্র ১৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টা কাল ধারণ করতে পারে। এর পরে সে শিক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে যায়, এমনকি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো, সে কথাও সে ভুলে যায়।

এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে অনেকে মনে করেন যে, প্রথমে সকল স্মৃতিই একটি অস্থায়ী বা উদ্‌বায়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি গতিময় এবং প্রায় এক ঘন্টা কালব্যাপী সক্রিয় থাকে। পরে অন্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্‌বায়ী স্মৃতিকে অধিকতর স্থায়ী স্মৃতিরূপে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য তৃতীয় কোন প্রক্রিয়া আছে এবং তার সাথে কোন রাসায়নিক বা সাংগঠনিক পরিবর্তন জড়িত থাকা অসম্ভব নয়।

স্মৃতিধারণের সম্ভাব্য প্রণালি : স্মৃতিধারণের সম্ভাব্য প্রণালি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুধ্যান ও অনুকল্পের অভাব নেই। সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রণালির কথাই কেউ না কেউ ব্যক্ত করেছেন। সম্ভাব্য প্রণালিগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো। এরূপ আলোচনা খুব অর্থপূর্ণ না হলেও, স্মৃতি সম্পর্কে হয়তো অতিরিক্ত কিছু আলোকপাত করতে পারে।

গতিময় বৈদ্যুতিক প্রণালি? একটি চক্রাকৃত্রির স্নায়ুপথে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুকোষগুলোর প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হলে সংকেত প্রবাহের ধারা স্থায়ীরূপে রক্ষিত হতেও পারে। তবে সেরূপ অবস্থা হবে চক্রপথটির একটি স্থায়ী উত্তেজিত অবস্থা। অনুত্তেজিত অবস্থাটিকে স্থির অবস্থা মনে করা হলে, সক্রিয় উত্তেজিত চক্রপথটির সবসময় স্থির অবস্থায় ফিরে আসার ঝোঁক থাকবে। উত্তেজিত অবস্থাটি কার্যকরভাবে রক্ষা করতে হলে, একটি সক্রিয় ও গতিময় শক্তির প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় একটি নিউরনের উত্তেজনা তার পরবর্তীটিকে এবং এভাবে সমগ্র চক্রপথটিকে উত্তেজিত করে পুনরায় আরম্ভ স্থানে ফিরে আসতে পারে এবং চক্রপথটিকে মোটামুটি স্থায়ীভাবে উত্তেজিত রাখতে পারে। যতক্ষণ পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকবে, ততক্ষণ গতিময় প্রক্রিয়াটিও চলতে থাকবে। উত্তেজনা প্রবাহ সাময়িকভাবে ক্ষান্ত হলেও প্রতিবন্ধকতাহীন চক্রপথটি থেকে যাবে। পুনরায় চক্রপথটির কোন একটি নিউরন উত্তেজিত হলে, সমগ্র চক্রপথটিতে উত্তেজনার প্রবাহ সৃষ্টি হতে পারে এবং তখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।

রাসায়নিক প্রণালিতে স্মৃতি সংরক্ষণ? রাসায়নিক পরিবর্তন একটি ঘটনার সংকেত ধারণ করতে পারে। এরূপ প্রণালিই শক্তির দিক থেকে সর্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী এবং সাংগঠনিক দিক থেকেও সংক্ষিপ্ততম। স্থায়ী স্মৃতি সংরক্ষণের সাথে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া জড়িত থাকতে পারে। কি প্রকার রাসায়নিক বস্তু মস্তিষ্কে সংকেত সংরক্ষণ করতে পারে, তা বিজ্ঞানী পলিং আলোচনা করেছেন। যে অণুতে পরিবর্তন হবে, সেটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র না হবার সম্ভাবনা ; কারণ তা হলে উত্তাপজনিত আন্দোলন স্মৃতিকে বিকৃত করতে পারবে। কেউ কেউ মনে করেন, কোষকেন্দ্রে অবস্থিত ডিএনএ (DNA) পুনঃপুনঃ উত্তেজনার ফলে বিশেষরূপ আরএনএ (RNA) সৃষ্টি হলে পূর্ববর্তী ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঁদুরের মস্তিষ্ক থেকে আরএনএ নির্যাস নিষ্ক্রান্ত করে অন্য ইঁদুরের মস্তিষ্কে স্থাপন করলে শিক্ষার প্রভাব কতকাংশে দ্বিতীয় ইঁদুরটির মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত করা যায় বলে দাবী করা হয়েছে। এরূপ পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের প্রভাব সংশ্লিষ্ট হতে পারে এবং এর ফলাফলও খুব নির্দিষ্ট নয়। স্থায়ী স্মৃতি বৈদ্যুতিক শক্ দেবার পরেও লোপ পায় না—এ কারণেও অনেকে মনে করেন, এটি কোন না কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত

হতে পারে। প্রজাতির জৈবিক অস্তিত্বের সংকেত যদি প্রজনন-সংক্রান্ত রাসায়নিক সংকেত প্রণালির মাধ্যমে সংরক্ষিত ও সঞ্চালিত হতে পারে, তবে একটি প্রাণীর জীবনকালের অভিজ্ঞতার সংকেতও রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

সিনাপ্‌স্ স্থানে বাধা উত্তোলন? এরূপ হতে পারে যে মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্ স্থানগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় স্নায়বিক যোগাযোগের পথে বাধাস্বরূপ এবং বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বৈদ্যুতিক অথবা রাসায়নিক) সিনাপ্‌স্ স্থানের বাধা উত্তোলন করা সম্ভব। শিক্ষার কালে হয়তো এই প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠে ও বাধা দূর হয়। 'পারস্পরিক সুযোগ' বা 'ফ্যাসিলিটেশান' এর ফলেও (৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) হয়তো বা বাধা দূর হতে পারে। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্‌গুলির স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার যে ভিড় দেখা যায় (৮.২ নং চিত্র) সেখানে সংযোগ সক্রিয় বা ঘনিষ্ঠতর হতে পারে।

নূতন স্নায়ুপথ স্থাপন? নিউরনগুলি যদি এমিবার মতো সংকুচিত বা প্রসারিত হয়ে অন্য নিউরনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, তবে নূতন যোগপথের সৃষ্টি হতে পারে। মোটর স্নায়ুর শেষপ্রান্ত কেটে গেলে, ওর নিকটবর্তী অন্য স্নায়ু থেকে নূতন শাখা নির্গত হয়ে মৃত স্নায়ুটির স্থানে বিস্তার লাভ করতে পারে। তাছাড়াও, জটিল শিক্ষার ফলে ইঁদুরের মস্তিষ্কে কর্টেক্সের ওজন ও আয়তন বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। এসব দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, শিক্ষার ফলে মস্তিষ্কে নূতন স্নায়ুতন্তু বা স্নায়ুপথের সৃষ্টি হয়, এমনটি মনে করার কোনো প্রমাণ নেই।

গ্লিয়াকোষগুলো কি স্মৃতির সাথে জড়িত? কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, শিক্ষাগ্রহণ ও স্মৃতিধারণের সাথে গ্লিয়াকোষগুলো হয়তো কোনভাবে জড়িত। মস্তিষ্কে অসংখ্য গ্লিয়াকোষ রয়েছে, কিন্তু ওদের কাজ বা প্রয়োজনীয়তা অজ্ঞাত। এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষগুলি এত অধিকসংখ্যায় কেন মস্তিষ্কে অবস্থান করছে? শিক্ষাগ্রহণ ও স্মৃতিধারণের প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অন্যান্য অনুকল্পের সাথে এটাও একটা অনুকল্প যে, গ্লিয়াকোষগুলো হয়তো স্মৃতিধারণের কাজে নিযুক্ত। তবে এরূপ মনে করার মতো সরাসরি কোন প্রমাণ নেই।

শিক্ষা ও আচরণ : মস্তিষ্কে অসংখ্য প্রচ্ছন্ন স্নায়বিক যোগপথ রয়েছে। পুনঃপুনঃ ব্যবহারের ফলে এসব পথের জন্মগত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হতে পারে। প্রতিবন্ধনমুক্ত পথগুলো প্রতিবন্ধনযুক্ত (বা সুপ্ত) পথগুলো অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় ও কার্যকরী হয়ে উঠে। শৈশবকালে অধিকাংশ যোগপথই যখন সুপ্ত, তখন অনেক সংকেতই অর্থহীন অথবা ওরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সে কারণে আচরণও অনেকটা সহজাত ও স্বয়ংক্রিয়। বংশগতভাবে প্রাপ্ত সংকেতমালা ও প্রতিবন্ধনমুক্ত যোগপথগুলোর উপরেই তখন সহজাত প্রবৃত্তি ও আচরণ নির্ভর করে।

শিক্ষার ফলে অধিক থেকে অধিকতর সুপ্ত যোগপথে যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠে। ফলে কেবল কার্যক্ষমতাই সুসংবদ্ধ হয়ে উঠে না, সমগ্র আচরণও ক্রমে ক্রমে সংযত হয়ে উঠে। অধিকাংশ প্রাণী তাদের সমগ্র জীবন কেবল সহজাত প্রবৃত্তির উপরে নির্ভর করেই যাপন করতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাদের জীবনধারণ ও কাজের সীমানা হবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবনে ও আচরণে তার শিক্ষা, অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সামাজিকতা, তার

সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে মানুষের আচরণ প্রায় সম্পূর্ণই অর্জিত আচরণ।

মানুষের প্রচ্ছন্ন গুণাগুণগুলোর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে সকল ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে তার শিক্ষাব্যবস্থাই অন্যতম। মানুষের সামাজিক জীবন যে জটিল বিভক্তিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার সংরক্ষণ উত্তম শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত সম্ভব নয়। সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, মানবিক শক্তির সর্বোত্তম বিকাশসাধনই মানবিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। দুটি মানবগোষ্ঠির আচরণে যদি মৌলিক কোন তারতম্য থাকে, তবে সেটি প্রধানত তাদের যার যার শিক্ষাব্যবস্থার জন্যই হয়ে থাকে।

ব্যক্তিত্ব মানুষের একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু মানুষ বহুকাল পূর্ব থেকেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এক বৃহত্তর সামাজিক অস্তিত্বের অংশীদার হয়েছে। কালক্রমে মানুষের শিক্ষাব্যবস্থাও একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সার্বজননীন কল্যাণের ভিত্তিতেও প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের যথাসম্ভব বিকাশ ও পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত কোন মানুষই তার প্রচ্ছন্ন মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তবে শিক্ষাব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়; এ ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত প্রেষণা ও প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা উন্নতমানের হলে সামাজিক বিধিনিষেধের সংখ্যা ও বাধ্যবাধকতা অনেকটা কমে যায়। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিমূলক আচরণ সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তখন ব্যক্তিগত প্রেষণার স্থলে একটি সামাজিক প্রেষণার সৃষ্টি হয়। ফলে, অসামাজিক কাজে অনুপ্রাণিত করে, এরূপ ব্যক্তিগত প্রেষণা অবনমিত ও শৃঙ্খলিত হয়ে যায়। সমাজের জন্য বা আদর্শের জন্য মানুষের জীবন বিসর্জন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। উপযুক্ত শিক্ষার ফলে যে নূতনতর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে, সেটিই মানুষের সামাজিক জীবনে তার সামগ্রিক আচরন ও অস্তিত্ব নিরূপণ করে।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রতীক নির্মাণ ও যুক্তি

মানুষের মধ্যে কতগুলি বিমূর্ত ধ্যানধারণা অর্জন করার লক্ষণ দেখা যায়, যা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়। অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লেষণ ও বিমূর্ত করে, মানুষ তার ধ্যানধারণা ও নীতি প্রণয়ন করতে পারে। এসবের উপর ভিত্তি করে মানুষ অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে উপায় নির্ধারণ করে এবং নূতন সমস্যা সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। কেবল প্রয়াস ও ভুলের মাধ্যমে জটিল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় ; অনেক সময় তা বিপজ্জনকও বটে। সমস্যাটির তাৎক্ষণিক সংবেদী ও মোটর উপাদানগুলির উপরে কেবলমাত্র নির্ভর না করে, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সেটি সমাধান করা হলে, সমাধানটি অনেকক্ষেত্রেই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও ফলপ্রদ হয়।

প্রতীক নির্মাণের ফলেই মানুষ বিভিন্ন জটিল ঘটনার সংক্ষিপ্ত অভিক্ষেপ অনির্দিষ্টকাল মস্তিষ্কে ধারণ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন বস্তু ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর তারতম্যমূলক গুণাগুণসমূহ বিশ্লেষণ করে কতগুলি মৌলিক ও সাধারণ গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। এরূপ সামান্যীকরণ (generalization) ব্যতীত প্রতীক নির্মাণ ও যুক্তিক্রিয়া সম্ভব নয়। বিমূর্ত করে মৌলিক উপাদানগুলির যে সহজতর প্রতীক সৃষ্টি হয়, এদের ইচ্ছামতো সাজিয়ে মানুষ তার চেতনায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনার বহুপ্রকার সম্ভাব্য অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে।

উপলব্ধি সংক্রান্ত চেতনা প্রথমত বহিরাগত সংবেদী সংকেত দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনার ফলেই বাস্তবায়িত হয়ে উঠে। সে ক্ষেত্রে সংবেদী বার্তা ও উপলব্ধির উপস্থিতি সমকালীন। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যখন সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়, তখন বহিরাগত সংকেতের অবর্তমানেও মানুষ তার মস্তিষ্কে অন্তর্নিহিত ঐচ্ছিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। কেন্দ্রগুলিতে ঐচ্ছিক উত্তেজনা সৃষ্টি ও প্রতিবন্ধনহীন যোগপথে পুনরায় উত্তেজনা সঞ্চালন করার ক্ষমতা, মানুষের মস্তিষ্কের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সময়ের উপলব্ধি : নিম্নস্তরে সংবেদী উত্তেজনা কেবল বর্তমানেই সংরেদী উপলব্ধি প্রদান করতে পারে। মানুষের স্তরে, মস্তিষ্ক ঐচ্ছিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম বলে, অতীত অভিজ্ঞতার একটি পরোক্ষ অভিক্ষেপও মস্তিষ্ক ধারণ করতে সক্ষম। এরূপ অভিক্ষেপকে মানুষ অতীতের অভিক্ষেপ বলে শনাক্ত করতেও সক্ষম। প্রতীকভিত্তিক ধ্যানধারণা মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সচেতন করেছে। সে ভবিষ্যৎ ঘটনার ফলাফলও কল্পনা করে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য প্রকল্প নির্মাণ করে ; ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপরে

নির্ভর করে সে কর্মপথ গ্রহণ করে। মানুষের চেতনায় অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের অভিক্ষেপগুলো সমন্বিত হয়ে সময়ের উপলব্ধি সৃষ্টি হয়।

মানুষের চেতনার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথেই তার সময়ের উপলব্ধি জড়িত। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের উপলব্ধি ও ভবিষ্যতের প্রকল্প—এই তিনটিই মানুষের চেতনার প্রধান উপকরণ। একথা বলা খুব ভুল হবে না যে, সময়ের উপলব্ধিই মানুষকে তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনশক্তি প্রদান করেছে। অবশ্য অপরপক্ষে একথাও বলা যায় যে, মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনশক্তিই তাকে তার সময়ের উপলব্ধি প্রদান করেছে। তবে সময়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে দার্শনিকগণের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, সেই প্রসঙ্গ না টেনেও একথা বলা যায়—মানুষের চেতনায় যে উপলব্ধিমূলক সময় (perceptual time) ধরা পড়ে, সেটি এবং বিষয়মুখ সময় (objective time) যা বস্তুজগতের প্রক্রিয়াসমূহের ও পরিবর্তনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এই দুটি একরূপ বা অভিন্নরূপ নয়।

শব্দভিত্তিক প্রতীক ও যুক্তি : সংবেদী উপলব্ধি বা তার বিমূর্ত অবধারণা থেকেই প্রাথমিক প্রতীকটি মস্তিষ্কে মূলত সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু মানুষ তার মস্তিষ্কে সকল প্রতীককেই নিজস্ব শব্দভিত্তিক (বা বাচনিক) প্রতীকে রূপান্তরিত করে এবং সেভাবেই তা সংরক্ষণ করে। শব্দভিত্তিক প্রতীকগুলোই মানুষের বিশ্লেষণমূলক ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার প্রধান উপাদান। তবে অনেক জটিল বিশ্লেষণমূলক চিন্তাধারা (যথা : গাণিতিক) শব্দভিত্তিক প্রতীক ব্যবহার না করেও সম্ভব। এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মানুষের যুক্তির ক্ষমতা প্রধানত একটি অর্জিত ক্ষমতা। যুক্তি প্রয়োগ করার জন্য জন্মগত কাঠামোটি সকলের থাকলেও, এটির সঠিক ব্যবহার ব্যক্তিগতভাবেই অর্জন করতে হয়।

যুক্তি ও স্বজ্ঞা : উপলব্ধি ও অবধারনের ক্ষমতা মানবমস্তিষ্কে অত্যন্ত অধিক। এর ফলে, শব্দভিত্তিক প্রতীক ও যুক্তির বেড়াজালকে পাশ কাটিয়েও মানুষ তার চেতনায় জটিল সমস্যা সমাধানের অভিক্ষেপ ধারণ করতে পারে। একে স্বজ্ঞা (intuition) বলার অর্থ এই নয় যে, প্রক্রিয়াটি একটি সহজাত প্রতিক্রিয়া। স্বজ্ঞার ক্ষমতাটি সহজাত হলেও, এর উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য বিপুল অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শত শত লোকের মধ্য থেকে পরিচিত লোকটির মুখ খুঁজে নিতে কেউ যুক্তিসহকারে প্রতিটি অন্য মুখ বাতিল করে না ; স্বজ্ঞা তাকে হঠাৎ করেই পরিচিত মুখটি শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এ যেন কম্পিউটার যন্ত্রের এনালগ্ প্রক্রিয়ার (৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মতো। তুলনামূলকভাবে যুক্তিকে বলা যায়, যেন একটি সংখ্যাভিত্তিক বা ডিজিটেল প্রক্রিয়া।

মানুষের মস্তিষ্কে যুক্তি ও স্বজ্ঞা, এই দুটি প্রক্রিয়াই তাকে নানা উপলব্ধি ও জ্ঞান সঞ্চয় করতে সহায়তা করে। এদের কোন একটি ভাল ও অন্যটি খারাপ, এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। বিবর্তনের দিক থেকে, স্বজ্ঞাই প্রাচীনতর ; যুক্তি তুলনামূলকভাবে একটি নূতনতর অর্জিত শক্তি এবং এর সাথে ভাষার ব্যাপক ব্যবহার বহুলাংশে জড়িত। ইদানীংকালে কিছু কিছু প্রমাণাদি সংগ্রহ হয়েছে, যার ফলে মনে হয়, মানুষের মস্তিষ্কে বামদিকের অর্ধাংশটি প্রধানত বিশ্লেষণমূলক যুক্তির প্রক্রিয়াটির সাথে এবং ডান দিকের

অর্ধাংশটি প্রধানত স্বজ্ঞার প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িত। সেরিব্রামের বাম অর্ধাংশটি কঠিন আঘাত পেলে বা রক্তক্ষরণের ফলে ধ্বংস হয়ে গেলে, পড়ালেখা করা, কথা বলা ও অঙ্ক কষার কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হয়। তুলনামূলকভাবে, ডান অর্ধাংশটি ধ্বংস হলে, ত্রিমাত্রিক দৃষ্টি, নকশা চেনার ক্ষমতা, গান বাজনায় দক্ষতা ও মানুষের মুখ চেনার ক্ষমতা বেশী ব্যহত হয়।

যুক্তি মানুষের মেধাকে তীক্ষ্ণ করে, অঙ্ক শাস্ত্রে, ন্যায়শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী করে এবং অন্যান্য বহু দিক থেকে, জীবন সংগ্রামে সফলতা অর্জন করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, স্বজ্ঞা তাকে সৌন্দর্য ও গীতবাদ্য উপভোগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করে, তার মানসে ন্যায়-অন্যায় বোধের সৃষ্টি করে, ধর্মকর্মে তার চেতনা ও প্রচেষ্টাকে নিবিষ্ট করে, আরো কত কি। যুক্তি ও স্বজ্ঞা—মস্তিষ্কের এই দুটি প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেই, মানুষ তার কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে। এদের কোন একটিকে বাদ দিলে বা অবহেলা করলে সভ্যতাও টেকে না, মানবিকতাও থাকে না।

মানুষের সৃজনশীলতা : যুক্তি ও স্বজ্ঞাকে ব্যবহার করে মানুষ তার প্রতিবেশের সাথে নূতন করে অভিযোজন করতে সচেষ্ট। এই অভিযোজন কেবল নিশ্চেষ্ট, স্বয়ংক্রিয় বা বিনীত অভিযোজন নয়, বরং তা একটা ঐচ্ছিক ও সৃজনশীল প্রয়াস। মানুষ তার সৃজনশীল প্রয়াসের দ্বারা তার প্রতিবেশিক শক্তিসমূহকে বহুলাংশে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এভাবে সে তার সার্বিক অস্তিত্বের মধ্যেও স্বেচ্ছায় বা পরিকল্পিত উপায়ে পরিবর্তন আনতে পারে।

মানুষের সৃজনশীলতা স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতাকে অস্বীকার করে। অস্তিত্বের গতিময়তা উপলব্ধি না হলে, মানুষ সৃষ্টিবিমুখ হয়ে পড়ে। এই উপলব্ধি সুদৃঢ় হলে, মানুষ অধিকতরো আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এবং সৃজনশীল হয়ে উঠে। মানুষের সৃজনশীলতার মধ্যেই তার প্রগতি ও অগ্রগতির সকল সম্ভাবনা সুনিবিষ্ট। কালক্রমে উন্নত মানুষ একদিন হয়তো তার নিজের বিবর্তন ধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বৃহত্তর যোগাযোগ

মস্তিষ্ক যোগাযোগের একটি প্রধান কেন্দ্র। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও প্রতিবেশের সাথে যোগাযোগ—এই উভয় মিলে মানুষকে তার প্রতিবেশের সাথে অভিযোজন করতে ও গতিময় সাম্যাবস্থা রক্ষা করতে সক্ষম করে। কিন্তু এছাড়াও মানুষের যোগাযোগের আর একটি প্রধান ক্ষেত্র, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ। বাক্‌শক্তির উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ফলে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ তার প্রথম ও প্রধান বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। একটি মানুষের সাথে অন্য একটি মানুষের মানসিক যোগাযোগ, সাক্ষাৎ স্নায়বিক সংযোগ দ্বারা সম্ভবপর নয় ; সংকেতমালার প্রতীকভিত্তিক রূপান্তর করে এবং তাকে শব্দরূপ প্রদান করে তা সম্ভব হয়েছে।

ভাষাভিত্তিক যোগাযোগ : প্রথমে কেবল সহজ শব্দপ্রতীকের ব্যবহারই সম্ভবপর হয়। শব্দপ্রতীককে সংকেতরূপে ব্যবহার করে মানুষ তার সমকালীন ও নিকটবর্তী অন্যান্য মানুষের সাথে ভাব আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়। কালক্রমে শব্দপ্রতীকগুলোকে একটি সাধারণ নিয়মের অধীনে এনে মানুষ ভাষার সৃষ্টি করে। বিধিবদ্ধ ভাষা মোটামুটিভাবে বার্তার নির্দিষ্টতা নিশ্চিত করে। প্রথমত শব্দভিত্তিক বার্তা স্থায়ী সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে লিখিত ভাষা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরোও এক স্তর ঊর্ধ্বে উন্নীত করে। লিখিত ভাষায় শব্দপ্রতীকগুলো দর্শনসাধ্য প্রতীকে রূপান্তরিক হয় এবং তাদের সংরক্ষণ করাও সহজ হয়। ফলে এক সুদূরপ্রসারী ও বংশপরম্পরা কালজয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা মানব প্রজাতির আয়ত্তে আসে।

প্রজনন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র দেহের ও মস্তিষ্কের মৌলিক কাঠমোটিই হস্তান্তর করা যায়; জীবনকালে অর্জিত মানসিক অভিজ্ঞতাসমূহ এই পন্থায় সঞ্চালিত হয় না। তদুপরি এই ব্যবস্থাটি নিশ্চেষ্ট। অথচ, লিখিত ভাষার মাধ্যমে মূল্যবান মানসিক অভিজ্ঞতাসমূহ মোটামুটিভাবে সহজেই বংশপরম্পরা হস্তান্তর করা যায়। অতীতের সব মানুষের লিখিত সব অভিজ্ঞতা বা ধ্যানধারণা প্রতিটি মানুষের অতি মূল্যবান উত্তরাধিকার। লিখিত ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার দূরবর্তী সহজীবী অন্য মানুষের সাথেও যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। এসকল কারণে লিখিত ভাষায় প্রয়োজন ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিবেশের সাথে অভিযোজন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনে এর মূল্যমান অত্যন্ত অধিক হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে লিখিত ভাষা যেরূপ মানসিক অস্তিত্বের সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে তা তেমনি তার চেতনশক্তির নূতনতর সংবাহক হিসাবে তার চেতনার বিস্তৃতি আনে। এসব দিক বিচার করেই হয়তো উপনিষদে বাক্‌শক্তিকে চেতনার প্রধান অধিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

লিখিত ভাষার সাহায্যে মানুষের অভিজ্ঞতা, ধ্যানধারণা ও কল্পনাসমূহ সংকলিত, সংরক্ষিত ও ক্রমাগত উন্নীত হয়েছে। এর প্রভাবে মানবিক শক্তি বিস্তৃতি লাভ করে এক কালজয়ীরূপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিককালে দ্রুত মুদ্রণ ব্যবস্থা, রঙিন ছবি, চলচ্চিত্র, অডিও রেকর্ড ও টেইপ, ভিডিও টেইপ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতারযন্ত্র, টেলেক্স, ফেক্স, কমপেক্ট ডিস্ক ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক মঙ্গলকর 'বিস্ফোরণ' সংঘটিত হয়েছে। ফলে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষমতা স্থানিক ও কালিক—এই উভয় দিক থেকেই বিস্তার লাভ করেছে। আধুনিক উপগ্রহ ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমগ্র মানবজাতিকে একটি বিশেষ সময়ে, একই মানসিক যোগসূত্রে বন্ধন করা যায়। অন্যদিকে, ভাষা-ভিত্তিক, শব্দভিত্তিক ও আলোকভিত্তিক বার্তার স্থির অথবা চলমান রেকর্ড প্রায় নিখুঁতভাবে অনির্দিষ্টকাল সংরক্ষণ করা যায়।

তবে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এখনও সম্পূর্ণ বলা যায় না। একটি প্রধান বাধা, বিশ্বে সার্বজনীন শিক্ষার অভাব। আর একটি বাধা মানবজাতির মধ্যে বহু ভাষার প্রচলন। এই দুটি ছাড়াও আর একটি মৌলিক বাধা রয়েছে, যা অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব। অলঙ্ঘনীয় এই বাধাটি হলো, প্রতীকভিত্তিক সংকেত প্রণালির মৌলিক সীমাবদ্ধতা। মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ভাষা, শব্দ, ছক বা চিত্রের উপরেই নির্ভরশীল। অনেক জটিল মানসিক উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বা চিত্রে ধরা পড়ে না; প্রকাশ করলেও মূল মানসিক অভিজ্ঞতাটির মর্মার্থ রেকর্ডে বিকৃত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বাস্তবে সমুদ্র দেখা আর কোনদিন সমুদ্র না দেখে শুধু তার রঙিন চলচ্চিত্র দেখা, মানুষের মনে একই অভিজ্ঞতা প্রদান করে না। একটি মানুষের মস্তিষ্ক থেকে অপর একটি মানুষের মস্তিষ্ক পর্যন্ত দীর্ঘ যোগপথে সংকেতমালা বহুবার রূপান্তরিত হয় বলেই পারস্পরিক যোগাযোগে এরূপ বাধার সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা : অঙ্ক বা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সংযোগ তুলনামূলকভাবে অধিকতর কার্যকর হলেও, সেখানেও সম্পূর্ণ মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হয় না; কারণ সেখানেও যোগাযোগ প্রধানত ভাষাভিত্তিক।

সমাজব্যবস্থা : প্রতিবেশের সাথে সুষ্ঠু থেকে সুষ্ঠুতর অভিযোজনের প্রচেষ্টায় মানুষ ক্রমাগত বৃহত্তর সংগঠন বা সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। দৈহিক বলে বলীয়ান নয় বলে শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য আদিম মানুষ প্রথম দল বাঁধতে শুরু করে। পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে, সামাজিক বিধিনিষেধ ও বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়। মানুষের সার্বিক আচরণও ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। বৃহৎ হতে বৃহত্তর সমাজে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন লাভ করে।

কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য অনেক প্রজাতির মধ্যে সমাজবদ্ধ হবার সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থা নমনীয় নয় বা দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। সমাজবদ্ধ হওয়া মানুষের কোন সহজাত প্রবৃত্তি নয়; পরস্পর অচেনা লোকদের মধ্যে সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন, মানুষের প্রজাতির ইতিহাসে একটি অনেক পরের ঘটনা। মানুষের লুপ্ত ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাগুলোর দিকে তাকালে, এদের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসব পরিবর্তন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এদের মধ্যে একটি বিবর্তনের ধারা স্পষ্ট লক্ষণীয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের ফলে মানুষের সমাজব্যবস্থা জটিলতর রূপ ধারণ করতে থাকে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হবার ফলে এক প্রশস্থ সামাজিক বিভক্তিকরণ বা পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বলবৎ হয়। এতে মানুষে মানুষে কিছু ভেদাভেদ দেখা দিতে আরম্ভ করে। ব্যক্তিগত বিষয়সম্পত্তি এবং তার পারিবারিক উত্তরাধিকার ভেদাভেদগুলোকে আরো প্রকট করে তোলে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, কঠোর শাসন এবং নানা প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সমাজব্যবস্থাকে কিছুটা রদবদল করে সাময়িকভাবে এসব দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রশমন করা হলেও, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব হয়, যখন মানুষের কর্মসংস্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নূতন ফলাফল ব্যাপকভাবে সংযোজিত হয়। সুদূর অতীতে কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনকে ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিশ্বে দ্রুত শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাজব্যবস্থায় দুটি মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। তবে শিল্প বিপ্লবের সুফল বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছে এখনো পুরাপুরি পৌঁছাতে পারেনি।

প্রতিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্যই সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং সেটাই সমাজব্যবস্থার মৌল দায়িত্ব। মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও গোষ্ঠিবন্ধনের প্রবণতা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রূপে সমাজকে এর মৌল দায়িত্ব পালন করা থেকে প্রতিহত করে। অনেকে মনে করেন, মানুষ কোন একদিন এসব দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অমূলক ভেদাভেদ থেকে মুক্তি পাবে এবং কেবল তখনই মানুষের নতুন এক সমাজব্যবস্থা এর মৌল দায়িত্ব যথাযথ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে।

উনবিংশতি অধ্যায়

মানবঅস্তিত্ব ও মানবচেতনা

বস্তু অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য : সাংগঠনিক তারতম্য ও অন্তর্নিহিত শক্তি বস্তুকে বিভিন্ন অস্তিত্ব প্রদান করে। পারিপার্শ্বিকতার প্রকোপে অত্যন্ত স্থিতিশীল অস্তিত্বও অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী থাকে না। ক্রমবর্ধমান পরিমাণগত পরিবর্তন ও কালক্রমে গুণগত রূপান্তর, বস্তু জগতের একটি সার্বজনীন রীতি। রূপান্তর যখন অস্তিত্বের সাংগঠনিক জটিলতা ও অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি করে নূতনতর গুণাগুণধারী অপর এক অস্তিত্ব সৃষ্টি করে, তখন একে বলা যায় বস্তুর 'বিবর্তন' (বা 'অভিব্যক্তি')। অপরপক্ষে, রূপান্তর যখন জটিলতর বস্তুর সংগঠনে তুলনামূলক সহজতা আনে ও কিছু কিছু গুণাগুণের লোপ সাধন করে অন্তর্নিহিত পূর্বতন গুণাগুণ পুনঃপ্রকাশ করে, তখন একে বলা যায় বস্তুর 'উদ্ঘাতন' বা 'প্রত্যাবৃত্তি'।

সুতরাং যে-কোনো অবস্থায় একটি বস্তুর অস্তিত্বে পরিবর্তনের দ্বৈতমুখী সম্ভাবনা থাকে—একটি এর অগ্রগামী 'বিবর্তন' ও অন্যটি এর পশ্চাদগমন বা 'প্রত্যাবৃত্তি'; একটি সৃষ্টির পুরোভূমি, অন্যটি অস্তিত্বের পশ্চাদ্‌ভূমি। অস্তিত্বের এই দ্বৈতমুখী নমনীয়তা জগতে অসংখ্য বস্তুসত্তা ও অস্তিত্বরূপের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে সব সময় নূতনতর অস্তিত্বরূপ বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও রয়েছে। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ও অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের ভারসাম্য, অস্তিত্বটির স্থিতিশীলতা বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নির্ধারণ করে। বস্তুজগতের এই রীতি ত্যজরশ্মি, ত্যজকণিকা, পরমাণু, অণু, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, ইত্যাদি অজৈব বস্তুসত্তার ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, সেরূপ জীবজগৎ ও মানবঅস্তিত্বের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

রহস্যময় এনট্রপি : 'অগ্রগামী বিবর্তন' বস্তুর সংগঠনে অধিকতর জটিলতা ও নূতনতর শৃঙ্খলা আনে। 'প্রত্যাবৃত্তিতে' কতিপয় শৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বা লোপ পায়। বিভিন্ন বস্তুর অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। থার্মোডাইনামিক্স (তাপজনিত চালন) বিদ্যায় বস্তুর বিশৃঙ্খলার মাত্রাকে এনট্রপি (entropy) বলা হয়। বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রযোজ্য। 'অগ্রগামী বিবর্তনে' 'এনট্রপির' মাত্রা কমে যায়; 'প্রত্যাবৃত্তিতে' এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিশৃঙ্খলাই বস্তুর স্বাভাবিকতা এবং 'প্রত্যাবৃত্তির' দিকে গতিই বস্তুর স্বাভাবিক গতি। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 'প্রত্যাবৃত্তির' পথ রুদ্ধ হয়। নিয়ন্ত্রণের অভাবে তাপ গরম বস্তু থেকে ঠাণ্ডা বস্তুতে প্রবাহিত হয়; যান্ত্রিক শক্তি সহজেই তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একইভাবে নিয়ন্ত্রণ ঊন হলে বা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে প্রাণবন্ত জীবদেহ মৃতদেহে রূপান্তরিত হয় ; সমাজব্যবস্থা বিচূর্ণ হয়ে অরাজকতার সৃষ্টি হয়—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

অগ্রগামী বিবর্তনে এনট্রপির বাধা অতিক্রম করতে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে বিবর্তনমুখী বস্তুর এনট্রপি হ্রাসপ্রাপ্তি, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বস্তুর এনট্রপি বৃদ্ধির দ্বারা

ক্ষতিপূরণ পায়। সামগ্রিকভাবে এনট্রপির বৃদ্ধিপ্রাপ্তিই হয়ে থাকে এবং এতে বস্তুর স্বভাবধর্ম রক্ষিত হয়। অগ্রগামী বিবর্তনে এনট্রপির বাধা অতিক্রম করতে যে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় হয়, তার কতকাংশ নূতনতর অস্তিত্বে অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে অবস্থান করে। নূতন অস্তিত্বে নূতনতর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। তবে নূতন অস্তিত্বে অন্তর্নিহিত শক্তি নূতনরূপ ধারণ করতে পারে ; কখনও বা তা শক্তিরূপে পরিলক্ষিতও হয় না বা তা পরিমাপন করাও সম্ভব হয় না। অণু যে শক্তিরূপ ধারণ করে বা প্রকাশ করে, পরমাণু তা ধারণ করে না বা প্রকাশও করে না। আবার পরমাণু যে শক্তিরূপ ধারণ করে, ত্যজ-অস্তিত্ব বা 'মৌলিক কণা' তা ধারণ করে না। বিবর্তনের ধাপে ধাপে, বস্তু নূতনতর গুণাগুণ, নূতনতর শৃঙ্খলা ও নূতনতর শক্তিরূপ আয়ত্ত করে। এখানে এটাও লক্ষণীয় যে, বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে শক্তিরূপের সংজ্ঞা ও মাপকাঠি এক নয়।

প্রাণবন্ত বসুন্ধরা : প্রাণবান জীবসত্তা নিজকে নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে পৃথক করে স্বীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে। পদার্থবিদ স্রোডিঞ্জার (Schrödinger) লক্ষ্য করেন, জীবনের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য যে তা ধাপে ধাপে শৃঙ্খলা আত্মগত করে এমন এক অদ্ভুত বিন্যাসের সৃষ্টি করেছে যা সহজ ও বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। এটি সম্ভবপর হয়েছে জীবন স্বনিয়ন্ত্রণের উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত বলেই। জীবনের প্রতি স্তরেই এনট্রপির নিম্নমান সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়। জটিল ও সুসংবদ্ধ অস্তিত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য জীবসত্তা তার পরিবেশ থেকে নিয়ত সহজতর যৌগিক পদার্থ ও শক্তি (যথা : খাদ্য, সৌরালোক, ইত্যাদি) সঞ্চয় করে। আপাতদৃষ্টিতে জীবসত্তাসমূহকে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে জীবনের সমগ্র ধারাটিই একক ও একান্তভাবে সংযুক্ত।

জীবনের এই ধারাটিকে ধারণ ও পালন করে এই পৃথিবী গ্রহটি নিজেই যেন অনেকদিক থেকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবজগৎ ও পৃথিবীর পরিবেশ মিলে অসংখ্য বহুমুখী ফিড্‌ব্যাক্ ভিত্তিক এমন এক জটিল স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা অনির্দিষ্টকাল নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীটিকে একটি প্রাণবন্ত সত্তারূপে অবলোকন করে বিজ্ঞানী জেমস্ লাভ্‌লক (James Lovelock) তাঁর অভিনব 'গায়া অনুকল্প' (Gaia Hypothesis) উপস্থাপন করেছেন।

মানবঅস্তিত্বের বিশেষত্ব : নিশ্চেষ্ট জৈবিক বিবর্তন মানুষকে তার মৌল অস্তিত্ব দিয়েছে। জীবজগতে মানুষ দৈহিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর প্রাণী না হলেও, তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনার বলে সে নিজকে প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর বলে প্রমিত করেছে। সমাজব্যবস্থা মানুষের বিবর্তনে একটি নূতন ধারা সংযোজন করেছে। জৈবিক বিবর্তনের ধারাটি অপেক্ষা মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ধারাটি অনেক বেশি গুণে দ্রুততর। এই সামাজিক বিবর্তনই মানুষের সাক্ষাৎ পরিবর্তনাদি নির্ধারণ করে। মনীষী টেল্‌হার্ড (Teilhard de Chardin) মনে করেন, সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমেই সার্বিক মানবিক শক্তি ও অস্তিত্ব বিভিন্ন অভিসারী পথ বেয়ে এক নূতনতর অস্তিত্ব ও পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মানুষের প্রজনন-ভিত্তিক জন্মগত পরিবর্তনও সম্ভব, তবে তা অনির্দিষ্ট ও কালসাপেক্ষ। অথচ, মনঃসামাজিক (psycho-social) বিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ঐচ্ছিক শক্তি প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সমাজবদ্ধ চেতনশীল মানুষ তার জৈবিক অস্তিত্বকে প্রতিবেশিক পরিবর্তনকারী প্রভাব থেকে বহুলাংশে রক্ষা করতেও সচেষ্ট। সে কারণে, জৈবিক বিবর্তনের প্রভাব অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো বা অনেকটা কম। মানুষ স্বেচ্ছায় তার সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারে এবং তার মাধ্যমে তার অস্তিত্বের বিশৃঙ্খলাসমূহ নিবারণ করতে পারে। দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, ধর্ম ও মানবিকতার বিকাশ, বৃহৎ হতে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়াস, ইত্যাদি বহু প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রতিবেশিক শক্তি, মানুষকে তার সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে নূতনভাবে প্রতিবেশের সাথে অভিযোজন করতে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সার্বিক অস্তিত্বও রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মনঃসামাজিক বিবর্তনের ফলে মানুষের সার্বিক আচরণে ও জৈবিক অস্তিত্বেও নানা পরিবর্তন এসেছে। মানুষের সাক্ষাৎ পূর্ব পুরুষগণের মস্তিষ্কের সাথে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্ক তুলনা করলে দেখা যায়, বিগত পাঁচ লক্ষ বছরে মস্তিষ্কের বেশকিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, পারস্পরিক যোগাযোগের বিকাশ ও সামাজিক বিবর্তনের সাথে, মানুষের মস্তিষ্কের এসব পরিবর্তন হয়তো সম্পর্কিত। অথচ জীবজগতে মানুষ একটি অত্যন্ত নবীন প্রজাতি। আধুনিক মানুষ কেবলমাত্র দেড় থেকে দুই লক্ষ বছর আগে প্রথম আবির্ভূত হয়। এতো অল্পসময়ের মধ্যে ও এতো দ্রুত, মানুষের মতো বিপুল শক্তি সঞ্চয় করা অন্য কোনো প্রজাতির পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এটি প্রমাণ করে যে, মানুষ অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় অগ্রগামী বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একটি ভিন্নতা নয়, বরং মানুষের স্তরে বিবর্তনের একটি বিরাট লম্ফ সংঘটিত হয়েছে। যে অতিরিক্ত শক্তি মানুষকে এই লম্ফ প্রদানে সহায়তা করেছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনশক্তিরূপে।

মানবচেতনা : মানবচেতনা একটি মহাশক্তি, যা বস্তু জগতের অন্যান্য বহু শক্তিকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এই মহাশক্তি কোনো শূন্যে অবস্থান করে না। এর পেছনে লক্ষ লক্ষ বছরের অগ্রগামী বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। বিবর্তনের আবহমান ধারায়, বিশেষ স্তর থেকে বস্তু যে নূতনতর শক্তি অর্জন করেছে তারই এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপকে মানুষ 'চেতনা' বলে উপলব্ধি করে এবং 'চেতনা' বলে নামকরণ করেছে।

বিজ্ঞানবিষয়ক এই পুস্তকে চেতনা সম্পর্কে আলোচনা কেউ কেউ অপ্রাসঙ্গিক মনে করতে পারেন। চেতনার প্রসঙ্গ না টেনেও, মস্তিষ্কের অভিযোজনমূলক কাজগুলোকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় বলা যায়। তাই বলে এই ধারণা ঠিক নয় যে, 'চেতনা' বলে কিছুই নেই। যে চেতনার বলে কেউ এ ধারণা করেন, তা নিশ্চয়ই তার ধারণাটির চেয়ে কম বাস্তব নয়। চেতনার বাস্তবতাই সকল প্রকার জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ এবং সব ধ্যানধারণার উৎস। এস্‌বির পুস্তক থেকে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। "আমি যদি আমার সামনে একটি চেয়ারের উপস্থিতি সম্যক্ উপলব্ধি করি এবং সেটি সম্পর্কে সচেতন হই, পরে

অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে আমার মনে প্রত্যয় জন্মাতে পারে যে, চেয়ারের দৃশ্যটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আলোর একটি খেলা; আমার মনে এরূপ প্রত্যয়ও জন্মাতে পারে যে, সেটি ছিল আমার একটি স্বপ্ন বা মায়া বা ভ্রম। কিন্তু এরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ অস্তিত্বহীন, যা আমার মনে প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারে যে—মূলত চেয়ারটি সম্পর্কে আমার কোনো উপলব্ধি বা চেতনা ছিলই না। সুতরাং ব্যক্তিগত অবগতির জ্ঞানটিই অন্য সব রকম জ্ঞানের ভিত্তি ও আদি।"

যদি চেতনাই সকল জ্ঞানের (সত্য বা মিথ্যা) ভিত্তি হয়, তবে চেতনা সম্পর্কে কোনো স্বতন্ত্র 'বিজ্ঞান' নেই কেন? এই প্রশ্নের জবাব হলো, বিষয়মুখ বিজ্ঞান কেবল সেসব বিষয় নিয়েই কাজ করে বা করতে পারে, যা একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কাছে প্রদর্শন করতে পারে। যে ব্যক্তি সম্বিৎ বা চেতনা ধারণ করে, তার কাছে সেটি অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং দেদীপ্যমান হলেও, এমন কোনো পন্থা নেই যা দিয়ে সে তার অভিজ্ঞতাটি সাক্ষাৎ বা সরাসরিভাবে অন্য ব্যক্তির চেতনায় প্রতিপাদন করতে পারে। হস্তান্তরের তেমন কোনো পন্থা মানুষের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত চেতনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহজ নয়। বিজ্ঞান চেতনা সম্পর্কে নীরব—এর অর্থ এই না যে চেতনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা উদাসীন। এই নীরবতার কারণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা।

সব তত্ত্বজ্ঞানের পেছনে চেতনার অবস্থান ও অস্তিত্ব মৌলিক ও প্রাথমিক। মানুষের আচরণাদি, কাজকর্ম ও ইতিহাস লক্ষ্য করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনশক্তিই মানবিক শক্তির প্রধান উৎস ও সংবাহক। মানুষ তার চেতনার সাহায্যে বস্তুর গুণাগুণ ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলির কার্য-কারণ সম্পর্ক বহুলাংশে নিরূপণ করতে পারে। মানুষ তার চেতনার সাহায্যে নির্বাচন ও 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' প্রয়োগ করে তার প্রতিবেশকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। অথচ, এত ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান এই চেতনার বিস্তারিত প্রক্রিয়াটি এখনো মানুষের অজানা। এটা একদিকে যেমন চেতনাসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলোর জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা প্রমাণ করে, অন্যদিকে তেমনই মানবচেতনার দৈন্যদশা নির্দেশ করে।

চেতনা বহির্জগতের বিস্তারিত অভিক্ষেপ ধারণ করতে সক্ষম, কিন্তু তা একটি রূপান্তরিত অভিক্ষেপ মাত্র। যা উপলব্ধি হচ্ছে, তা বস্তুটির প্রত্যক্ষ গুণাগুণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও, এটি বস্তুটির একটি মানসিক প্রতিরূপ মাত্র। প্রশ্ন থাকতে পারে—প্রতিরূপটি কতখানি বিশ্বস্ত? আমরা সবকিছু উপলব্ধি করি একটি অস্পষ্টতার আবরণের ভিতর দিয়ে। এই আবরণ ঘন কুয়াশার মতো। সহজবোধে অনেককিছুই উপলব্ধি করা যায় না; আবার অনেককিছুই উপলব্ধি হয়ে থাকে বিকৃত রূপে। শক্তিহস্তান্তরকারী স্নায়বিক প্রক্রিয়াগুলির মৌলিক সীমাবদ্ধতা প্রতিরূপটির বিশ্বস্ততাকে বহুলাংশে আপেক্ষিক ও পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। তাই সহজবোধে মূল প্রকৃতির যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তা অধিকাংশ সময় আংশিক, বিকৃত বা পক্ষপাতদুষ্ট। কেবল পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণ, বাস্তবপ্রয়োগ ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধিগুলোকে সংশোধন করা সম্ভব। এভাবেই মানুষের চেতনা প্রখরতা ও প্রসারতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তাতেও জ্ঞান পরিপূর্ণতা অর্জন করে না ; নূতনতর জ্ঞানের সম্ভাবনা চিরদিনই থেকে যায়।

মানবচেতনার সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে 'পরিপূর্ণ মহাচেতনা' বিমূর্ত করা হয়েছে। অজ্ঞাত মহাচেতনার সাথে যুক্ত করলেই মানুষের সীমিত চেতনা সম্পর্কে তার জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে

উঠে না। অনুমান ও অবরোহ করে অনেক অনুকল্প রচনা হতে পারে, কিন্তু যা প্রমাণসাপেক্ষ নয়, তা সকল মানুষের কাছে 'সত্য' বলে গ্রহণযোগ্যও নয়।

জৈবিক কারণবশত মানুষ তার ঘটনাসাপেক্ষ চেতনার অধিকারী। চেতনা মানুষকে তার প্রতিবেশ ও তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নির্বাচন ক্ষমতা দিয়েছে। মানুষ তার নির্বাচন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে 'ভালো-মন্দ', 'কল্যাণকর-অকল্যাণকর', 'ন্যায়-অন্যায়', 'সুন্দর-অসুন্দর'—এসব কিছুর মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারে। এটাই মানুষের 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য'; এটাই মানুষের জন্য তার চেতনার সবচেয়ে বড় অবদান। মানুষের এই 'ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য' অপরিসীম না হলেও, এটিকে আশ্রয় করেই মানুষ তার 'অগ্রগামী' বিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে পারে এবং পশ্চাদগতি বা 'প্রত্যাবৃত্তি' প্রতিরোধ করতে পারে।

বিংশতি অধ্যায়

মস্তিষ্ক গবেষণায় সাম্প্রতিক ধারা

বিজ্ঞানের অজ্ঞাত রহস্যগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মানবমস্তিষ্ক। মস্তিষ্কে চেতনা বাস্তবায়িত হবার মৌলিক প্রক্রিয়াটি এখনও বোধগম্য নয়। বিংশ শতাব্দীতে এটমের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, প্রজনন-সংকেতনের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের প্রক্রিয়াও মোটামুটি উন্মোচিত হয়েছে। প্রজ্ঞা ও চেতনা কি করে বাস্তবায়িত হয় সেটি উদ্‌ঘাটিত হলে, জ্ঞানের জগতে মানুষ এক অপূর্ব বিজয় অর্জন করবে। তবে অচিরেই তেমটি হবার সম্ভাবনা খুব কম। মস্তিষ্ক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের অবস্থান খুব বেশি হলে পদার্থবিদ্যায় ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ডের অবস্থানের সমতুল্য, যখন তিনি এটমের গঠনটি আবিষ্কার করেন ; অথবা আনবিক জীববিদ্যায় ১৯৪৪ সালে অস্‌ওয়াল্ড এভেরীর অবস্থানের সমতুল্য, যখন তিনি প্রমাণ করেন যে ডি, এন, এ, অণুটির (তখনও যার গঠন অজ্ঞাত) মধ্যেই প্রজননের রহস্যাবলী লুক্কায়িত। উভয়ক্ষেত্রেই তখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানকল্পে গবেষণার জন্য নূতন দিক নির্দেশনার সন্ধান মেলে, এবং কালক্রমে বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ অর্জিত হয়।

মস্তিষ্ক গবেষণায় কোন প্রশ্নটি কতখানি প্রাসঙ্গিক সেটিই এখনো সঠিকভাবে বোধগম্য নয়। প্রপঞ্চবাদ (Phenomenology) অনুসরণ করে এতদিনে যেসব মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মূল প্রশ্নগুলির সাথে সেগুলিকে সম্পৃক্ত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। প্রপঞ্চবাদের সমস্যা হলো তাতে বর্ণনামূলক বহু অভিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু কার্য-কারণ সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না। কোথায় আঘাত পেলে বাক্‌শক্তি লোপ পায় ; কোথায় টিউমার হলে দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়; সিজোফ্রেনিয়া রোগে মস্তিষ্কে ডোপামিন বেড়ে যায় এবং পার্কিনসনের অসুখে সেটা কমে যায় ; ঘুমের সময় এন্‌কেফালোগ্রাফে আলফা তরঙ্গ প্রকট হয়ে উঠে ; শিক্ষার পরে সংশ্লিষ্ট সিনাপ্‌স্ স্থানে আয়ন প্রবাহ বদলে যায়—এসব কিছুই বর্ণনামূলক তথ্য। এগুলি সত্য হলেও এরা মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত কার্যপ্রণালী সম্পর্কে মূল বিষয়টি উদ্‌ঘাটনে তেমন সহায়তা করে না। এক্ষেত্রে মূল বিষয়টি অবশ্যই হলো মস্তিষ্কের উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও মানুষের চেতনশক্তি।

কেউ কেউ মনে করেন রসায়ন শাস্ত্রে ম্যানডেলিফের আবিষ্কৃত 'পিরিয়ডিক টেবল' (Periodic Table) বা জীববিদ্যায় ওটাটসন্ ও ক্রিকের আবিষ্কৃত প্রজনন-সংকেতনের পদ্ধতিটির মতো একটি সহজ ও সরল মূলসূত্র হয়তো মস্তিষ্কের জন্যও কোনোদিন আবিষ্কৃত হবে এবং তখন সবকিছুই সহজে বোধগম্য হয়ে যাবে। তবে এখানে সমস্যাটির একটি মানগত ও একটি গুণগত দিক রয়েছে। একক নিউরনে স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি ও প্রবাহের পদ্ধতি সহজেই বোধগম্য ; বিপুল সংখ্যক নিউরনের সমন্বয়ে কি করে ভাবাবেগ,

উপলব্ধি বা চেতনা বাস্তবায়িত হয়ে উঠে কিংবা কি করে স্মৃতিধারণ সম্ভবপর হয়—সেটাই মূল প্রশ্ন। অন্যকথায়, মানগত পরিবর্তন কি করে একটি নূতন ধরনের গুণগত পরিবর্তনের সৃষ্টি করে, সেটাই অন্বেষণ করতে হবে। তবে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে চেতনার প্রক্রিয়াটি বোধগম্য হবার জন্য হয়তো সম্পূর্ণ নতুন কোনো পথে ধ্যান-ধারণা পরিচালিত হতে হবে, যেমনটি পদার্থবিদ্যায় হয়েছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা উদ্ভাবনের মাধ্যমে।

কোন্ দিক থেকে অগ্রসর হলে মস্তিষ্কের রহস্যাবলী উন্মোচিত হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেটি এখনও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেন না। অতীতে শরীরবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করে এবং মস্তিষ্কের গঠন ও কোষস্থাপত্য যথাযম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইকেলস্ ও হজকীন্ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় স্নায়বিক উত্তেজনার প্রবাহ স্নায়ুপথ বেয়ে কিভাবে সঞ্চালিত হয়, সেটি বোধগম্য হয়। অতঃপর ষাট ও সত্তুরের দশকে নিউরো-হরমোনগুলি ও নিউরো-পেপটাইডগুলি আবিষ্কারের পরে, কিছুকাল রাসায়নিক পটভূমিকাটির উপরে অত্যন্ত জোর দেয়া হয়। রাসায়নিক পন্থায় মস্তিষ্ক সম্পর্কে বহু তথ্য সংকলিত হয়েছে এবং ভাবাবেগ ও মানসিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অনেক ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু নিউ-কর্টেক্স বা সেরিব্রেল কর্টেক্সের মূল কার্যপ্রণালীর সাথে বা চেতনা বাস্তবায়িত হবার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা প্রক্রিয়া এখনও চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়নি।

কৌলতত্ত্ববিদরা (geneticists) নূতন করে মস্তিষ্ক সংক্রান্ত জিন্গুলি পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। অন্যান্য যে কোনো দেহযন্ত্র অপেক্ষা মস্তিষ্ক সংশ্লিষ্ট জিনের সংখ্যা অধিক। ইঁদুরের দেহে বিশেষ বিশেষ মিউটেশন সংযোজন করে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ অবরোধ বা বিকৃত করা যায়। এই ধরনের পন্থা অবলম্বন করে মস্তিষ্কের বিবর্তন সম্পর্কে নূতন তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হচ্ছে। মস্তিষ্কে যোগাযোগ স্থাপন ও তার সুরক্ষার জন্য যেসব 'রাসায়নিক পরিচিতি' (molecular recognition) এর প্রয়োজন তাদের বিষয়টিও কৌলতত্ত্ববিদরা ও আণবিক জীববিদরা (molecular biologists) নূতন করে তলিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। তবে এক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে মস্তিষ্কের মূল সমস্যাটি থেকে অনেক দূরে দূরে।

মস্তিষ্কের হলোগ্রাম মডেল : সংবেদী স্নায়ুতন্তুর মধ্যে বার্তা সঞ্চালনের সাথে উত্তেজনার কম্পাঙ্ক তারতম্য বা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ৬০-৬১)। এ ব্যাপারে দৃষ্টির মানসিক প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একটি নূতন আবিষ্কার সম্প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করার সাথে সাথে মস্তিষ্কের বিস্তৃত এলাকায় বহু নিউরোনের দেহে একযোগে একটি সমকালীন স্পন্দন (semi-synchronized oscillation) সৃষ্টি হয়, যার কম্পাঙ্ক মোটামুটি চল্লিশ হার্য (40 hertz)। এতে মনে হয় দৃষ্টির উপলব্ধির সাথে একযোগে স্নায়বিক উত্তেজনার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কম্পাঙ্কটির সম্পর্ক রয়েছে। বহু নিউরনের মধ্যে একযোগে একই কম্পাঙ্কের যে নকশা সৃষ্টি হয়, সেটি যদি উপলব্ধির ভিত্তি হয়, তবে সেটির পুনরুদ্ধার বা পুনরাবৃত্তির সাথে স্মৃতিরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

উপলব্ধির সাথে সমকালীন স্পন্দনের সম্ভাব্য সম্পর্ক লক্ষ্য করে কার্ল প্রিব্রাম (Karl Pribram) মস্তিষ্কের কার্যকলাপ ব্যাখ্যার জন্য হলোগ্রাম মডেল (Hologram model) প্রস্তাব করেন। লেজার হলোগ্রাফী প্রক্রিয়ায় সমকম্পাঙ্কবিশিষ্ট সমকালীন আলোক (synchronized light) ব্যবহার করে কোনো বস্তুর নিখুঁত ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি সৃষ্টি করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় মূলবস্তুর যে প্রতিকৃতি সৃষ্টি হয়, সেখানে প্রতিটি অংশই বিশেষ বিবেচনায় সম্পূর্ণ বস্তুটির অভিক্ষেপ ধারণ করে। প্রিব্রামের মতে, দৃশ্যমান বস্তুর সংবেদন বার্তাও সমকালীন কম্পাঙ্কের নকশারূপে মস্তিষ্কে বিরাট এলাকায় (বা সর্বত্র) রেখাপাত করে, যার সংশ্লেষণই উপলব্ধিরূপে বাস্তবায়িত হয় ; পরবর্তী পর্যায়ে সেটি হয়তো স্মৃতিরূপেও উদ্ধারযোগ্য হয়। এ কারণেই হয়তো কোনো স্মৃতিই মস্তিষ্কে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অধিষ্ঠিত বলে চিহ্নিত করা যায় না ; বরং হলোগ্রাফের মতো এখানেও প্রত্যেকটি অংশই সমগ্রটির অভিক্ষেপ কমবেশি ধারণ করে।

মস্তিষ্কের হলোগ্রাম মডেলটি এখনো সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে মস্তিষ্ক কোনো বার্তাই কেবলমাত্র এক স্থানে গচ্ছিত রাখে না ; সকল বার্তার অভিক্ষেপই বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা ও যুক্তির বিষয়টি (প্রতীকভিত্তিক ধ্বনি বা শব্দরূপ) বিরাট এলাকা জুড়ে অবস্থিত বাক্শক্তির স্নায়বিক ও মানসিক কেন্দ্রগুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপলব্ধি ও স্মৃতির সাথে সময়ের মাপমাত্রাটিও জড়িত বলে তাদের প্রক্রিয়াগুলি কোনো স্থৈতিক কাঠামোগত অবস্থান অপেক্ষা কম্পাঙ্ক বা অনুরূপ কোনো গতিময় অবস্থানেরই ইঙ্গিত করে।

মস্তিষ্কের কম্পিউটার মডেল : স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার যন্ত্রের সাথে মস্তিষ্কের কার্যগত দিক থেকে যথেষ্ট মিল আছে, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ৮২)। কম্পিউটার যন্ত্রের মূল আবিষ্কারকগণও স্নায়বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে তাদের যান্ত্রিক রূপ প্রদান করেন। এসব কারণেই কম্পিউটার যন্ত্রকে "ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিগত চার-পাঁচ দশকে কম্পিউটার যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সাধারণ কম্পিউটার যন্ত্রে পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশ অনুসারে দীর্ঘ হিসাবের কাজ তড়িৎ বেগে সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ কম্পিউটারে হিসাবের কাজটি কঠোর ধারাবাহিক বা অনুক্রমিক (sequential) প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। তেমন প্রক্রিয়ায় বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের কোনো স্থান নাই। মস্তিষ্কে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও সমগ্র ব্যবস্থাটি কঠোরভাবে সংযুক্ত নয়। সে কারণে, অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যোগাযোগ ব্যবস্থাটি যেমন নমনীয়, ফলাফলও তেমনই অনিশ্চিত। এসব বিষয় চিন্তা করে, বহুমুখী সমান্তরাল পরিগণনা (Parallel computing) করতে সক্ষম কম্পিউটার যন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে সমান্তরাল পরিগণনার মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আর একটি লক্ষ্য হলো, এমন যন্ত্রের সৃষ্টি করা যেটি পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারে ও নিজের কাজে উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের মডেলরূপে পরিচিতি লাভ করছে।

অন্যদিকে স্নায়বিক জালির মতো বহু স্থানাঙ্ক বিশিষ্ট যান্ত্রিক জালি নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে অন্তবর্তী সংযোগস্থলে সংবাদ সঞ্চালনের মাত্রা কমবেশী হয়ে সমস্যা সমাধানকল্পে যন্ত্র নিজেই 'শিক্ষা গ্রহণ' করতে সক্ষম। স্নায়বিক জালির সমতুল্য যান্ত্রিক জালি ব্যবহার করে বহু সমান্তরাল পথে পরিগণনার কাজ সম্পন্ন হলে প্রক্রিয়াটি অনুক্রমিক কম্পিউটার যন্ত্রের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাইবার নেটিক্স (স্বয়ংক্রিয়তা সংক্রান্ত গণিত) ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি প্রচেষ্টাগুলির সাথে মস্তিষ্ক গবেষণার সম্পর্ক দিন দিন বাড়ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে গবেষণা এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে যে, মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী টুরিং (Alen Mathison Turing) এর ভবিষ্যৎবাণী সফল হবে ; তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীটি ছিল, কালক্রমে মানুষ এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্র নির্মাণ করবে যার সাথে ভাব আদান প্রদান করে কেউ বুঝতে পারবে না যে তার বুদ্ধিমত্তা কৃত্রিম।

পেনরোজের প্রস্তাব : এমনটি মোটেই অসম্ভব নয় যে মস্তিষ্কের মূল কার্যপ্রণালী ও চেতনার বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বোধগম্য হবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, সেটি এখনও বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন না হলে, মৌলিক স্তরে বস্তুর ও বাস্তবতার সম্পর্কে অনেক কিছুই হয়তো আবিষ্কার হতো না। রজার পেনরোজ (Roger Penrose) যুক্তি প্রমাণাদি দিয়ে প্রস্তাব করেছেন যে চেতনার বিষয়টি বোধগম্য হবার জন্য পদার্থবিদ্যায় নতুন ধরনের কোনো মূলসূত্র উদ্ভাবনের হয়তো প্রয়োজন রয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন, কেবল পদার্থবিদ্যা কিংবা বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ একটি শাখার পক্ষেই চেতনার সমস্যাটি সমাধান করা হয়তো সম্ভব হবে না ; এর জন্য সার্বিক বা হলিষ্টিক (holistic) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দার্শনিকগণকেই হয়তো এগিয়ে এসে বিজ্ঞানীদের পথনির্দেশ করতে হবে। পেনারোজের মতে, যেহেতু উপলব্ধি বা চেতনা বাস্তবায়নের পশ্চাতে কোনো স্পষ্ট অনুক্রমিক প্রক্রিয়া ধরা পড়ে না, সেহেতু মস্তিষ্কের কম্পিউটার মডেলটিও যথার্থ নয়।

বহম-এর হলোকম্পন : পদার্থবিদ ডেভিড বহম (David Bohm) একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রস্তাবনা করেছেন। তাঁর মতে সকল স্তরেই অস্তিত্বের দুটি দিক রয়েছে—একটি এর কাঠামোগত রূপ, যা সচরাচর বস্তু বা তেজ রূপে প্রতীয়মান হয় ; অপরটি এর চেতনরূপ, যা তার গতিময়তার শক্তি জোগায়। এই দুটি রূপের সমন্বয়ে বাস্তবতা গতিময় হয়ে উঠে। সার্বিক রূপটিকে তিনি 'হলোকম্পন' (Holomovement) নামে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মনে করেন, হলোকম্পনের বিন্যাস উন্মোচনকল্পে বস্তুর কাঠামোগত দিকটির উপরে একমাত্র নির্ভর না করে বরং এর গতিময়তার সংজ্ঞাটি নির্ণয়ের উপরেই অধিক মনোনিবেশ করতে হবে। তেমনটি করা হলে বিশ্বব্রহ্মান্ড ও তার গতিময়তার এককত্ব স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। বহম উপলব্ধি করেন যে মানব চেতনা হলোকম্পনেরই অংশ বিশেষ, যা মানুষের জন্য একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর মতে, এমনটিও হতে পারে যে, অস্তিত্বের দুটি রূপ সার্বিক বাস্তবতারই দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিচ্ছেদকারী অভিক্ষেপ ;

হয়তো সার্বিক বাস্তবতা কেবল বস্তুসর্বস্বত্ত নয়, কিংবা কেবল চেতনসর্বস্বও নয়। বহমের দৃষ্টিভঙ্গী সনাতন অতীন্দ্রিয় সর্বাস্তিবাদীদের চিন্তাধারা বহুলাংশে প্রতিফলন করে।

উপসংহার : মস্তিষ্ক গবেষণার একটি প্রধান সমস্যা হলো—বহু তথ্য রয়েছে, বহু নূতন নূতন তত্ত্বও উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয়ের বড়ই অভাব। মূলনীতি বা সাধারণ সংজ্ঞার অভাবে এখনও অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে উপমা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। একদা টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের সাথে তুলনা করা হতো। কালক্রমে থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র ; তাড়িত-রাসায়নিক বার্তা সঞ্চালন, অনুক্রমিক কম্পিউটার, সমান্তরাল কম্পিউটার, লেজার হলোগ্রাম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপমা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব ও অনুকল্প এটাই ইঙ্গিত করে যে মস্তিষ্ক গবেষণার জন্য অত্যাবশ্যকীয় মূলনীতিটি এখনও অনাবিষ্কৃত।

বিজ্ঞান ও দর্শন জগৎকে এ্যালগোরিদম (algorithm) বা সহজ কথায়, ব্যাকরণের প্রণালীতে সংক্ষিপ্তভাবে চেতনায় অবধারণ করতে চেষ্টাবান। ঘটনাবলী একটি সাধারণ সংজ্ঞা বা সংক্ষিপ্ত মতবাদের অন্তর্গত হলেই তেমনটি সম্ভবপর ; তবে সেটি সকলের বোধগম্য ও প্রমাণ সাপেক্ষ হতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন সংক্ষিপ্তকরণ সম্ভবপর হয়েছে। যে কতিপয় ক্ষেত্র এখনও সংক্ষিপ্তকরণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করছে, মস্তিষ্ক তাদের মধ্যে অন্যতম। এর প্রধান কারণ হয়তো মস্তিষ্কের জটিলতা। এটা সর্বত্রই লক্ষণীয় যে, জটিলতা যতই বৃদ্ধি পায়, ঘটনাপ্রবাহ ততই অরৈখিক (non-linear) ও অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। হ্যালীর ধুমকেতুটি পুনরায় কখন পৃথিবীর আকাশে দেখা যাবে সেটি বলা যতো সহজ, এক মাস পরে কোনো স্থানে আবহাওয়া কেমন হবে, সেটি বলা ততো সহজ নয়।

বস্তুর রূপান্তরের প্রতিটি স্তরেই দেখা যায়—যেসব রীতিনীতি একটি স্তরে প্রযোজ্য সেগুলি ভিন্ন স্তরে অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বিজ্ঞানের যেসব সূত্র মৌলিক কণা (fundamental particles) এর আচরণ বর্ণনা করে, পরমাণু বা অণুর ক্ষেত্রে তা করেনা। চেতনার অস্তিত্বটিকে যদি গুণগত দিক থেকে বাস্তবতার নূতন একটি স্তর বলে গণ্য করা হয়, তবে এটাই স্বাভাবিক যে, যে নিম্নবর্তী স্তর থেকে চেতনার উদ্ভব হয়েছে, সেটির রীতিনীতি বা বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলী চেতনার বাস্তবতাটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। সে কারণেই চেতনার উপযুক্ত সংজ্ঞা ও চেতনস্তরে নূতন রীতিনীতি সন্ধানের জন্য নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মান্ডের সর্বত্রই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে—সেটি সকল প্রকার অস্তিত্বধারণের প্রাথমিক শর্ত। আপাতদৃষ্টিতে যা অত্যন্ত জটিল বা অনির্দিষ্ট তার পশ্চাতেও যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে, সেটি সন্ধান করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। মস্তিষ্কের কথা বাদ দিয়েও এটা বলা যায় যে, জটিলতা, অনির্দিষ্টতা বা অস্থৈর্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের এখনো জানবার অনেক বাকী। জটিলতা ও শৃঙ্খলার নূতনতর সংজ্ঞা ও গাণিতিক সূত্র ব্যতীত, মস্তিষ্ক গবেষণার ক্ষেত্রে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া হয়তো দুষ্কর। মস্তিষ্ক ও চেতনার পশ্চাতে যে সংক্ষিপ্ত শৃঙ্খলা বা এ্যালগোরিদম রয়েছে, তার স্বরূপ কি? সেটাই একবিংশ শতাব্দীতে মস্তিষ্ক গবেষণার সম্মুখে অন্যতম জিজ্ঞাসা। চেতনার বলে বলীয়ান মানুষ একদিন না একদিন এই প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

Adrian, E. D. *The physical background of perception.* London, 1947.

Ashby, W. R. *Design for a brain.* London, 1952.

Bohm, David *Wholeness and the Implicate order.* London, 1980.

Cajal, S. R. *Histologie du systeme nerveux.* London, 1932.

Cannon, W. B. *The wisdom of the body.* London, 1932.

Cohen, M. M. and Snider, R. S. *Morphological and biochemical correlates of neural activity.* New York, 1964.

Dethier. V. G. and Stellar, E. *Animal behavior.* New Jersey, 1961.

Eccles, J. C. *The neurophysiological basis of mind.* Oxford, 1953.

The physiology of nerve cells. Baltimore, 1957.

The physiology of synapses. New York, 1964.

Ganong, W. F. *Review of Medical physiology.* Los Altos (Calif.), 1983.

Gray, E. G. *Anatomical Society Symphosium on Electron Microscopy.* London, 1961.

Hodgkin, A. L. *The conduction of the nervous impulse.* Livepool, 1964.

Huxley, J. S. *The Uniqueness of Man.* London (Chatto and Windus), 1941.

Lerner, A. Y. *Fundamentals of cybernetics* (Eng. Tr.) London, 1972.

Lovelock, James *The Ages of Gaia : A Biography of our Living Earth. London, 1988.*

Gaia: A New Look at Life on Earth. London, 1979.

Mc Lennan. H. *Synaptic transmission.* Philadelphia, 1963.

Neumann, J. Von. *The computer and the brain.* New Haven, 1958.

Parker, G. H. *The elementary nervous system.* Philadelphia, 1919.

The evolution of man. Chicago, 1958.

Pavlov, I. P. *Conditioned relexes* (Eng. Tr.) Oxford, 1927.

Selected works (Eng. Tr.) Moscow.

Penrose, Roger *The Emperor's New Mind.* Oxford, 1989.

Pribram, K. H. Holonomy and Structure in the organization of Perception. In *Images, Perception and Knowledge.* Ed. J. M. Nicholas. Reidel: Dordreent. Holland, 1977.

Sagan, C. *The dragons of eden.* New York, 1977.

Schrodinger, Erwin *What is Life?* Cambridge, 1944.

Scott. J. P. *Animal behavior.* Chicago, 1958.

Sherrington, C. S. *The integrative action of the nervous system.* New Haven, 1906.

Teilhard de Chardin *Phenomenon of Man* (Eng. Tr.) London, 1959.

Human Energy (Eng. Tr.). London, 1969.

Turing, A. M. Computing machinery and intelligence. In *The Mind's I.* Ed. D. R. Hofstadter and D. C. Dennett : Penguin Books, 1981.

Wiener, N. *Cybernetics.* New York, 1948.

Young, J. Z. *A model of the brain.* London, 1964.

পরিভাষা

Action Potential	সক্রিয় বিভব
Adaptation	অভিযোজন
Afferent nerve	অন্তর্বাহী স্নায়ু
Association	সহযোগ/পরিমেল
Behavior	আচরণ
Bipolar neuron	দ্বিমেরুবিশিষ্ট স্নায়ুকোষ
Blind spot	অন্ধ-বিন্দু
Central nervous system	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র
Conditioned Reflex	সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া
Consciousness	চেতনা
Cornea	কর্ণিয়া
Cranium	করোটি
Degeneration	আপজাত্য
Dendrite	ডেনড্রাইট
Differentiation	পৃথকীকরণ
Ductless gland	নালীহীন গ্রন্থি
Efferent nerve	বহির্বাহী স্নায়ু
Electric Potential	বৈদ্যুতিক বিভব
Electrode	ইলেকট্রোড
Electron Microscope	ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্র
Encephalization	এনকেফেলাইজেশন
Encephalograph	এনকেফালোগ্রাফ
Energy	শক্তি
Enzyme	এনজাইম
Evolution	বিবর্তন
Feed-back	উপাবৃত্ত বার্তা
Final motor neuron	অন্তিম মোটর নিউরন
Illusion	বিভ্রান্তি
Inhibition	অবনমন
Inhibitory	অবনমনকারী
Ion	আয়ন
Islets of Langerhans	অগ্ন্যাশয়ের আইলেট অংশ
Learning	শিক্ষা/শিক্ষা গ্রহণ
Limbic system (Limbic lobe)	লিম্‌বিক্ তন্ত্র
Membrane	আবরণী/গাত্রাবরণী
Metazoa	মেটাজোয়া/বহুকোষবিশিষ্ট প্রাণী
Motivation	প্রেষণা
Nerve	স্নায়ু
Nervous system	স্নায়ুতন্ত্র
'Noise'	'গোলযোগ'
Objective	বিষয়মুখ
Olfactory lobe	অলফ্যাকটরি লোব
Perception	উপলব্ধি
Projection	অভিক্ষেপ
Receptor Cell	গ্রাহীকোষ
Receptor organ	গ্রাহীযন্ত্র
Reflex action	প্রতিবর্তী ক্রিয়া
Rods and cones	রড ও কোন
Semicircular Canal	অর্ধচক্রাকৃতি নালিকা
Sensation	সংবেদন
Sensory	সংবেদী
Sensory nerve	সংবেদী স্নায়ু
Spinal nerve	মেরুজাত স্নায়ু
Spinal cord	মেরুরজ্জু
Subcellular Structure	অবর কোষস্থাপত্য
Subconscious/Preconscious	অবচেতন
Subjective	আত্মমুখ
Transducer	শক্তি হস্তান্তরকারী যন্ত্র
Tympanic membnance	কর্ণপটহ
Unicellular organism	এককোষবিশিষ্ট প্রাণী
Vertebra	কশেরুকা

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

অ
অক্টোপাস, ১৩
অক্টোপাসের মস্তিষ্ক, ১৩
অক্ষিপট, ২৪
অক্ষিপটের কোষবিন্যাস, ২৭
অগ্রগামী বিবর্তন, ১২২
অঙ্গচালন, ৩৫, ৩৬
অবচেতন স্তর, ১৭
অর্ধ-দৃষ্টির কেন্দ্র, ৫০
অর্ধচক্রাকৃতির নালিকার, ২৯
অনুকল্প ও মতবাদ, ৫
অনুরূপতা, ৯৯
অন্তঃকর্ণ, ২৮
অন্তর্বাহী (afferent), ২১
অন্তিম মোটর স্নায়ুকোষ, ৩৪
অপটিক স্নায়ু, ২৬, ৪৩
অবধারণ, ৪৬, ৯৪
অবস্থান জ্ঞান, ২৯
অবস্থান-সংক্রান্ত গ্রাহীকোষ, ২৯
অভিক্ষেপ, ১১০
অভিযোজন, ৭২
অভ্যন্তরীণ স্থিরাবস্থা, ৭১
অলফেক্টরি লোব, ২৪, ৪৫, ৪৬
অলফেক্টরি স্নায়ু, ৪৩
অস্ওয়াল্ড এভেরী, ১২৭
অস্থায়ী স্মৃতি, ১১২

আ
আচরণবাদ, ১০৪
আত্মমুখ, ১০৬
আপজাত্য, ৩৯
আব্রাহাম মাসলো, ৯৮
আরএনএ, ১১৩
আলফা (α) তরঙ্গ, ৬৯

ই
ইউট্রিকল্ ও স্যাকিউল, ২৯
ইকেলস্, ১২৮
ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য, ১২৬
ইন্দ্রিয়যন্ত্র, ২২, ২৪
ইন্দ্রিয় স্থান, ২২
ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক, ৮২
ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাফ, ৬৯

উ
উঁচু টুপির বিভ্রান্তি, ১০৮
উত্তেজনা সঞ্চালন, ৫৭, ৫৮, ৬২, ৬৮
উপরের কলিকিউলাস, ৪০, ৪১
উপলব্ধি, ১৭, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০
উপলব্ধির নিশ্চয়তা ও ব্যতিক্রম, ১০৬
উপলব্ধির বিভ্রান্তি, ১০৬
উপাবৃত্ত বার্তা বা ফিড-ব্যাক, ৭২
উন্মুক্ত ও খণ্ড-বিশ্লেষণ পদ্ধতি, ৬

ঋ
ঋণাত্মক পুনরপি বলীয়ান (negative reinforcement), ১০৩

এ
একটোডার্ম, ১৬
এন্টিসাইকোটিক্, ৫১
এড্রিনেলীন, ৬৩, ৬৫
এড্রিনারজিক্ স্নায়ু, ৬৩
এড্রিনারজিক্, ৬৫
এনকেফালোগ্রাফ, ৬৯, ৭০
এন্ডরফীণ, ৮৯
এন্কেফালাইজেশন, ১৪
এনট্রপি, ১২২
এনালগ কম্পিউটার, ৭৯
এমিগডালয়েড নিউক্লিয়াস, ৪৬
এল,এস,ডি, ৯০
এসট্রোজেন, ৯৬
এসিটাইলকোলীন, ৬৩
এক্সন, ১৯
এক্সনের গাত্রাবরণী, ১৯
এ্যালগোরিদম, ১৩১

ও
ওটাটসন্ ও ক্রিক, ১২৭

ক
কক্লিয়া, ২৮
কনডেনসার, ৭৯
কম্পাঙ্ক মডুলেশন, ৬১
কম্পিউটার, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪
কম্পিটউার যন্ত্রের সংকেত প্রণালি, ৮৩
কয়েল, ৭৯
করোটিজাত স্নায়ু, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫
কর্টিওগ্রাফ, ৬৯
'কর্টির' যন্ত্র, ২৮
কর্টেক্স, ৪৬, ১১২
কর্ণপটহ, ২৮
কাউপলিং, ১০২
কাজ্যাল, ৬
কাল-পরিমাণ, ১০৬
কার্ল প্রিব্রাম, ১২৯
কেন্দ্রীয় এড্রিনারজিক্, ৬৫
কেন্দ্রীয় গ্যাংলিয়া, ১২
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ১২৯
'কোন', ২৬
কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, ১২৮
কোলীনএসিটাইলেজ, ৬৩
কোলীনএস্টাইরেজ, ৬৩
কোলীনারজিক স্নায়ু, ৬৩
কোষস্থাপত্য, ৪৬
কৌলতত্ত্ববিদ, ১২৮
ক্রুজের কণিকা, ২৩

গ
গতি নির্দেশক যন্ত্র, ৮০
গতিময় সাম্যাবস্থা, ৭১
গতিময় স্থিরাবস্থা, ৭১
গাঁজা, ৯০
গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগের অংশ, ৭৯
গাবা (GABA), ৬৬
গায়া অনুকল্প (Gaia Hypothesis), ১২৩
গেস্টাল্ট (Gestalt) মতবাদ, ১০৪
গুরুমস্তিষ্ক, ৪৬
গ্যাংলিয়া, ৩২, ৩৮, ৬৪
গ্লিয়াকোষ, ২২
γ-এমাইনোবুটাইরিক এসিড, ৬৫

ঘ
ঘনবীক্ষণ, ২৬
ঘ্রাণের গ্রাহীকোষ, ২৪

চ
চক্রাকৃতির স্নায়ুপথ, ১০১
চালকশক্তির মতবাদ, ৯৭
চুলের স্নায়ুপ্রান্ত, ২৩
চেতনশক্তি, ১১, ১৬, ১৭, ৩১, ৫০
চেতন স্তর, ১৭
চেতনা, ১০, ১৭, ১৮, ২২, ২৬, ২৯, ১২৪

ছ
'ছবি ও পটভূমি' এর বিভ্রান্তি, ১০৭

জ
জেমস্ লাভ্লক, ১২৩
জেলীফিশ, ১২
"জোলনার" বিভ্রান্তি, ১০৯
জ্ঞান ও কান্তি, ৯৮
জ্ঞানতত্ত্ব, ১০৪

ট
টুরিং, ১৩০
টেক্টরিয়েল পর্দা, ২৮
টেল্হার্ড, ১২৩
টেস্টোস্টেরন, ৯৬
ট্রানজিস্টার, ৭৯
ট্রেন্সডিউসার, ৩০

ড
ডাইনামিক পাল্স ইউনিট, ৮৩
ডাইপোল, ৬৯
ডায়েন্কেফালন, ৪২
ডিএনএ, ১১৩
ডিজিটাল কম্পিউটার, ৭৯
ডেনড্রাইট, ১৯, ২০, ৬৭, ৬৯
ডেভিড বহম, ১৩০
ডেল্টা (δ) তরঙ্গ, ৭০
ডোপা, ৬৫
ডোপামিন, ৬৫

ত
ত্বকের সংবেদী গ্রাহীযন্ত্র, ২৩

থ
থ্যালামাস, ৪০, ৪২

থ
থার্মোস্ট্যাট, ৭৩

দ
দৃষ্টি, ২৪
দৃষ্টির গ্রাহীকোষ, ২৪, ২৬
দৃষ্টির প্রধান এলাকা, ৪৯
দৃষ্টির মানসিক এলাকা, ৫০

ধ
ধনাত্মক পুনরপি বলীয়ান, ১০৩
ধূসরাংশ, ৩৯

ন
নটোকর্ড, ১৬
নর-এড্রিনেলীন, ৬৩, ৬৪, ৬৫
নিউক্লিয়াস, ৪৩
নিউরন, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ৩৩
নিউরেল টিউব, ১৬
নিউরেল প্লেট, ১৬

নিউরোব্লাস্ট, ১৬
নিউরো-হরমোন, ৬২
নিয়ন্ত্রণের স্তর বিভাগ, ৮১
নিয়োকর্টেক্স, ৪৬
নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ছকগুলি, ৯৫
নির্বাচনমূলক বাধার প্রাচীর, ৮৮
নির্ধারক, ৭৫
নির্ধারক যন্ত্র, ৭২
নীচের কলিকিউলাস, ৪০, ৪১
নেকার কিউব, ১০৮, ১০৯

প
পগেনডর্ফ (Poggendorff) বিভ্রান্তি, ১০৮
পন্‌স্, ৪০, ৪১, ৪৫, ৬৪
পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান, ৪
পশ্চাৎ খণ্ড, ৪৬
পশ্চাৎমূল, ৩২
পশ্চাদগমন বা 'প্রত্যাবৃত্তি', ১২২
পাভলভ, ১০০
পারস্পরিক সুযোগ, ৬৮, ১১৪
পার্কিনসনের অসুখ, ৪৩
পার্শ্বস্থ খণ্ড, ৪৬
পার্শ্বস্থ প্রধান ভাঁজ, ৪৭
পার্শ্বস্থানীয় জেনিকুলেট, ৪২
পিটুইটারী গ্রন্থি, ৪৩
পিরামিডাকৃতির স্নায়ুকোষ, ৪৭
পিরিয়ডিক টেবল, ১২৭
পুটামেন, ৪৩
পুনরপি বলীয়ান, ৯৮
পুরো খণ্ড, ৪৬
পৃথকীকরণ, ৮, ১২
পেডাঙ্গল, ৪১
পেশীগুলির স্বাভাবিক টোন, ৩৫
প্যারাসিমপেথেটিক, ৩৭, ৩৮
প্যালিডাম্, ৪৩
প্যাসীনিয়ান কণিকা ২৩
প্রজেক্টেরন, ৯৬
প্রতীক নির্মাণ, ১১৬
প্রতীকভিত্তিক সিমুলেটর, ৭৯
'প্রত্যাবৃত্তি', ১২৬
প্রধান মোটর এলাকা, ৪৭
প্রধান সংবেদী এলাকা, ৪৮
"প্রনজো" বিভ্রান্তি, ১০৯
প্রপঞ্চবাদ, ১২৭
প্রবৃত্তি, ৯৪
প্রবৃত্তিমূলক আচরণের বিশেষত্ব, ৯৪
প্রয়াস ও ভুল, ১১১
প্রাণবন্ত বসুন্ধরা, ১২৩
প্রাণীদেহে গতিময় সাম্যাবস্থা, ৭৩
প্রাণীদেহে সংকেত প্রণালি, ৮০
প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া, ১৭, ৩২
প্রারম্ভিক অনুকল্প, ৩
প্রেষণা, ১৭, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৬, ১১৫
প্রেষণার স্তর বিভাগ, ৯৮

ফ
ফর্নিক্স, ৪৬
ফ্যাসিলিটেশান, ৬৮, ১১৪
ফ্লেক্সর রিফ্লেক্স, ৬৫

ব
বস্তু অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, ১২২
বহির্বাহী (efferent), ২১
বাইনারী কোডিং, ৭৭
বাক্‌শক্তি, ৪৯
বাক্‌শক্তির মোটর এলাকা, ৪৯
বাক্‌শক্তির সংবেদী ও মানসিক এলাকা, ৪৯

বার্তা-বিশ্লেষণ, ১০৫
বিটা (β) তরঙ্গ, ৭০
বিপরীতমুখী স্নায়বিক যোগপথ, ৩৬
বিমেরুকরণ, ৫৬, ৫৮
বিষয়, ১০৬
বিষয়মুখতা, ১০৪
বীটের (Bits) সংখ্যা, ৭৮
বুদ্ধিমত্তা, ১০৫, ১০৬
বৈজ্ঞানিক অনুকল্প, ৫
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, ১-৭, ১০, ১৬, ১২৫
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান, ৪
বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, ২
ব্যাসাল গ্যাংলিয়া, ৪৩
ব্রেইন-স্টেম, ৪৩
ব্রোকার এলাকা, ৪৯

ভ
ভাষাভিত্তিক যোগাযোগ, ১১৯
ভেগাস স্নায়ু, ৩৮
ভেজোপ্রেসীন, ৮৯

ম
মডুলেটর, ৭৫
মধ্যপশ্চাৎ খণ্ড, ৪৬
মধ্যবর্তী নিউরন, ৩৪
মধ্যমস্তিষ্ক, ৩৫, ৪০, ৪১, ৬৪
মধ্যস্থ প্রধান ভাঁজ, ৪০, ৪৬
মধ্যস্থানীয় জেনিকুলেট, ৪২
মনঃসামাজিক বিবর্তন, ১২৪
মনঃসমীক্ষণবিদগণ, ৯৭
মনোবিকার-প্রতিরোধী ওষুধ, ৫১
মস্তিষ্ক কাণ্ড, ৪০
মস্তিষ্কের আনুপাতিক ওজন, ১৪
মস্তিষ্কের কম্পিউটার মডেল, ১২৯
মস্তিষ্কের দুর্বলতা, ৮৮
মস্তিষ্কের 'নীরব এলাকা', ৫১
মস্তিষ্কের বিবর্তন, ১১
মস্তিষ্কের বিশ্বস্ততা, ৮৬
মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক বিভব, ৬৯
মস্তিষ্কের সিনাপ্‌স্, ৬৬
মস্তিষ্কের হলোগ্রাম মডেল, ১২৮
মাতৃসুলভ প্রবৃত্তি, ৯৬
মাদকদ্রব্য, ৫২, ৮৮
মাদকাসক্তির সমস্যা, ৮৯
মানবঅস্তিত্বের বিশেষত্ব, ১২৩
মানবচেতনা, ১২৪
মানবমস্তিষ্কের ওজন, ১৪
মানুষের সৃজনশীলতা, ১১৮
মায়েলীন, ১৯
মারিজুয়ানা, ৯০
মাসলোর স্তরবিন্যাস, ৯৯
মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত, ২৩
'মুলার-লাইয়র" বিভ্রান্তি, ১০৮
মেইস্‌নারস কণিকা, ২৩
মেটাজোয়া, ১১
মেডুলা, ৪০-৪৩, ৪৫, ৬৪
মেডুলা অবলঙ্গাটা, ৪০
মেরুরজ্জু, ৩২
মেরুজাত স্নায়ু, ৩২
মোটর, ৯
মৌলিক রঙ, ২৬
ম্যানডেলিফ, ১২৭

য
যুক্তি ও স্বজ্ঞা, ১১৭
যোগক্রিয়া বা সামেশান, ৬৮
যৌন আচরণ, ৯৬
যৌন-প্রবৃত্তি, ৯৫
যৌন হরমোন, ৯৬

র
রজার পেনরোজ, ১৩০
রড, ২৬
'রড' ও 'কোন', ২৬
রাইনেনকেফ্যালন, ৪৫
রাদারফোর্ড, ১২৭
রাফিনিক গ্রাহীযন্ত্র, ২৩
রাসায়নিক পরিচিতি, ১২৮
রাসায়নিক প্রজনন-সংকেত প্রণালি, ৮৫
রাসায়নিক সংকেত প্রণালি, ৮০
রেটিকুলার ফর্মেশান, ৪৫
রেটিনার গ্রাহীকোষ, ২৬
রেটিনাস্তর, ২৪
রেন্‌শ স্নায়ুকোষ, ২২
রেসারপিন্, ৫২, ৬৫
রেসিস্টার, ৭৯
র‍্যানভীয়ারের নোড, ১৯

ল
লঘুমস্তিষ্ক, ৪১
লিম্‌বিক্ তন্ত্র, ৪২, ৪৫, ৪৬, ১১২

শ
শক্তি হস্তান্তরকারী যন্ত্র, ৩০
শব্দবিভ্রম (বা 'নয়েজ'), ৮১
শব্দভিত্তিক প্রতীক, ১১৭
শব্দভিত্তিক প্রতীক ও যুক্তি, ১১৭
শাস্তি, ১০৩
শিক্ষা, ৯৮, ১১১
শিক্ষা ও আচরণ, ১১৪
শিক্ষালব্ধ ছক, ৯৫
শুভ্রাংশ, ৩৯
শ্রবণ, ২৮
শ্রবণ-সংক্রান্ত মানসিক এলাকা, ৪৯
শ্রবণের গ্রাহীকোষ, ২৮
শ্রবণের প্রধান এলাকা, ৪৯
শ্রবণের প্রধান সংবেদী এলাকা, ৪৯

স
সংকেত প্রণালি, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০
সংখ্যাভিত্তিক সংকেত প্রণালি, ৭৮
সংবাদ প্রবাহের ধারা, ৭৫, ৭৬
সংবেদন, ১০৫
সংবেদী, ৮, ৯, ১১, ১২
সংবেদী গ্রাহীযন্ত্র, ২২
সংবেদী স্নায়ুকোষ, ৩২
সংশ্লেষণ, ৫২, ১০৫
সক্রিয় বিভব, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৮, ৬৯, ৮১
সক্রিয় বিভবের বিশেষত্ব, ৫৯
সমকালীন স্পন্দন, ১২৮
সময়ের উপলব্ধি, ১১৬, ১১৭
সমস্যা নির্ধারণ, ২
সমাজব্যবস্থা, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪
সমান্তরাল পরিগণনা, ১২৯
সহজাত প্রবৃত্তি, ১৭
সহযোগ, ৯
সাইবারনেটিক্স, ৭
সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া, ১৩, ১৭, ১০০
সাব-ইসোফেজিয়েল গ্যাংলিয়া, ১৩
সামান্যীকরণ, ১১৬
সামাজিক বিভক্তিকরণ, ১২১
সামাজিক প্রেষণা, ১১৫
সার্বিক ও আচরণিক পদ্ধতি, ৬
সিনাপ্‌স্, ২০, ২২, ৬৭, ৬৮
সিনাপ্‌স্ স্থান, ৬২, ৬৬, ১১৪
সিমপেথেটিক, ৩৭, ৩৮
সুপ্রারিনেল নালীহীন গ্রন্থির মেডুলা, ৬৩

সেরিব্রাম (Cerebrum), ৪৬
সেরিবেলাম, ৪০, ৪১
সেরিব্রেল কর্টেক্স, ১৪, ৩৯, ৪৬, ৬৫
সেরিব্রেল গ্যাংলিয়া, ১৩
স্যাপ্টাল নিউক্লিয়াসসমূহ, ৪৬
স্কিনার বাক্স, ৪২
স্কুইড্, ১৩
স্ট্রাইয়া, ৪৬
স্টেরিওটেক্সীক যন্ত্র, ৩৯
স্থায়ী ও অস্থায়ী স্মৃতি, ১১২
স্থির বিভব, ৫৫
স্নায়বিক উত্তেজনা, ৫৫
স্নায়বিক সংকেত প্রণালি, ৮০
স্নায়বিক সংকেতমালা, ৬১
স্নায়ুকেন্দ্র, ৪৩
স্নায়ুকোষ, ১৯-২২, ২৬, ৩২
স্নায়ুতন্তুর গাত্রাবরণী, ৫৬
স্নায়ুর স্বাভাবিক মেরুকরণ, ৫৫, ৫৭
স্নায়ুরজ্জু, ২০
স্নায়ু-হরমোন, ৬২
স্বজ্ঞা, ১১৭
স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ৭২
স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মেরামতের সমস্যা, ৮৪
স্বাদ-অনুভূতি, ২৪
স্বাদ ও গন্ধ, ২৪
স্বায়ত্তশাসিত স্নায়ুতন্ত্র, ৩২, ৩৬, ৩৭
স্মৃতিধারণ প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ, ১১২
স্মৃতিধারণের সম্ভাব্য প্রণালি, ১১৩
স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, ৯০
স্রোডিঞ্জার, ১২৩

হ
হজকীন, ১২৮
হলিস্টিক, ১৩০
হলোকম্পন (Holomovement), ১৩০
হলোগ্রাম মডেল, ১২৯
হাঁটুর ঝাঁকুনি', ৩৪
হাইড্রার স্নায়ুতন্ত্র, ১১
হাইপোথ্যালামাস, ৪০, ৪২, ৪৬, ৬৪
হাইয়ারার্কি, ৮৭
হিপোক্যাম্পাস, ৪৬
হোমো ইরেকটাস্, ১৪
হোমো সেপিয়েনস্, ১৪